সমাজদর্শনের ভূমিকা

শ্রীশান্তিভূষণ বসু এম. এ. (দর্শন ও রাজনীতি বিজ্ঞান)
অধ্যাপক, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটি ;
পরীক্ষক, স্নাতক শ্রেণী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

প্রকাশক :
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫।১এ, কলেজ রো
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ—জুলাই, ১৯৬৩

মুদ্রাকর :
শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৫৬, তারক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা—৬

ভবানী চৌধুরী

ও

রজত মৈত্র-কে

SYLLABUS

SOCIAL PHILOSOPHY

Group B : Full marks—50

Social Philosophy : Its meaning & scope. Relation to Sociology, Psychology, Politics and Ethics,

The Social nature of man. Society and the Individual. Individualism and Socialism. Society as an organism. The Idea of Common good.

Social groups and Institutions : Family, Community, State, Church, Educational Institutions and Cultural Associations. Their Psychological and Philosophical bases.

Conditions of Social development. Social Ideals. Herd Sentiments. Common interests. Religion as a Cohesive force The Marxist interpretation. Naturalistic theories.

Social Pathology : Crime and Punishment. Social evolution and Progress. The Social Salf. The Ethos of a People.

সূচী

সমাজদর্শন

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়—সমাজদর্শনের ভূমিকা		
১। সমাজদর্শনের ভূমিকা	...	১—৫
২। সমাজ কি মানুষের স্বাভাবিক	...	৫—১০
৩। সমাজ বিষয়ে কয়েকটি সংজ্ঞা	...	১১—১৩
৪। সমাজ ও সমাজের বিভিন্ন পর্যায়	...	১৩—১৫
৫। সমাজবিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্ব	...	১৫—২০
৬। সমাজ বিবর্তনে স্তরের প্রত্যয়	...	২০—২৩
৭। পুরাতত্ত্ববিদের পরিবর্তন ব্যাখ্যা	...	২৩—২৫
৮। সমাজদর্শনের সূত্রপাত	...	২৫—২৯
দ্বিতীয় অধ্যায়—সমাজদর্শনের সংজ্ঞা ও পরিধি		
১। সমাজদর্শনের অর্থ	...	৩০—৩৬
২। সমাজদর্শনের পরিধি	...	৩৬—৩৮
তৃতীয় অধ্যায়—সমাজদর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রের সম্পর্ক		
১। সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞান	...	৩৯—৪৫
২। সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞান	...	৪৫—৫২
৩। সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান	...	৫২—৫৪
৪। সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান	...	৫৪—৫৮
চতুর্থ অধ্যায়—ব্যক্তি ও সমাজ		
১। সমাজের সংজ্ঞা	...	৫৯—৬৩
২। সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক	...	৬৩—৬৪
৩। সমষ্টিবাদ	...	৬৪—৬৮
৪। ভাববাদ	...	৬৮—৭০
৫। রাষ্ট্র বা সমাজের সত্তা	...	৭১—৭২
৬। সমাজতন্ত্রবাদ	...	৭২—৭৫
৭। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ	...	৭৫—৭৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
৮। ভাববাদ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের তুলনা	...	৭৯—৮৩
৯। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ	...	৮৪—৯০

পঞ্চম অধ্যায়—সমাজের উৎপত্তি ও প্রকৃতি

১। সমাজের চরিত্র	...	৯১—৯২
২। সামাজিক চুক্তি	...	৯২—১০১
৩। জৈব মতবাদ	...	১০১—১০৪
৪। সাধারণ সঙ্কল্প	...	১০৫—১১০

ষষ্ঠ অধ্যায়—সমাজ সংগঠন

১। সমাজ ও সমাজসমূহ	...	১১১—১১২
২। সামাজিক সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর পরিচয়	...	১১২—১১৪
৩। সামাজিক সংগঠন	...	১১৪—১১৭
৪। সংগঠনের বিভিন্ন রূপ	...	১১৭—১২০
৫। সংগঠনের সম্পর্ক	...	১২০—১২১

সপ্তম অধ্যায়—পরিবার

১। পরিবার কি	...	১২১—১২৪
২। পরিবার কেন মৌলিক	...	১২৪—১২৮
৩। পরিবারের ভিত্তি	...	১২৮—১৩১
৪। পরিবারের রূপ	...	১৩১
৫। পরিবারের কর্তব্য	...	১৩২—১৩৫
৬। পরিবারের দুর্বলতা	...	১৩৬—১৩৮
৭। পরিবার ভাঙবার কারণ	...	১৩৮—১৪০
৮। বিবাহ	...	১৪০—১৪২
৯। বিবাহ বিচ্ছেদ	...	১৪২—১৪৬
১০। সুপ্রজনন বিদ্যা	...	১৪৬—১৪৮

অষ্টম অধ্যায়—রাষ্ট্র

১। রাষ্ট্রের রূপ ও চরিত্র	...	১৪৯—১৫৫
২। রাষ্ট্র ও সমাজ	...	১৫৫—১৫৯
৩। রাষ্ট্রই শক্তি	...	১৫৯—১৬৩

বিষয় পৃষ্ঠা

৪। রাষ্ট্রের কাজ ... ১৬৫—১৬৯
৫। রাষ্ট্র ও নৈতিকতা ... ১৬৯—১৭৩
৬। রাষ্ট্র বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ ... ১৭৩
৭। মার্কসবাদী বক্তব্য ... ১৭৩—১৭৭
৮। ভাববাদী বক্তব্য ... ১৭৭—১৮৩

নবম অধ্যায়—শিক্ষা ও সংগঠন

১। শিক্ষা ও শিক্ষার তাৎপর্য ... ১৮৪—১৮৮
২। শিক্ষার উদ্দেশ্য ... ১৮৮—১৯৬
৩। বিদ্যালয়ের কাজ ... ১৯৬—১৯৯
৪। কারিগরী শিক্ষা ... ১৯৯—২০৪
৫। উচ্চশিক্ষা ... ২০৪—২০৮

দশম অধ্যায়—খ্রীষ্টীয় গীর্জা

১। খৃষ্টধর্ম ও গীর্জার সম্পর্ক ... ২০৮—২১২
২। গীর্জা কি ও কেন ? ... ২১২—২১৬
৩। জীবনে গীর্জার ভূমিকা ... ২১৬—২১৯
৪। গীর্জা কি সামাজিক অত্যাচারের মাধ্যম ... ২ ৯—২২১

একাদশ অধ্যায়—ধর্ম

১। ধর্মের তাৎপর্য কী ? ... ২২১—২২৫
২। ধর্ম বিষয়ে সংজ্ঞা ... ২২৫—২২৬
৩। ধর্মের সামাজিক ভূমিকা ... ২২৬—২৩৬
৪। ধর্ম ও সংগঠন ... ২৩৬—২৩৮
৫। ধর্মের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা ... ২৩৮—২৪৫
৬। শিক্ষা ও ধর্ম ... ২৪৫—২৪৯
৭। ধর্মের ত্রুটি ... ২৪৯—২৫২

দ্বাদশ অধ্যায়—সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির সংগঠন

১। সংস্কৃতির অর্থ ... ২৫৩—২৫৮
২। সংস্কৃতি ও সভ্যতায় পার্থক্য ... ২৫৮—২৬২
৩। সাংস্কৃতিক সংঘ ... ২৬২—২৬৩

বিষয় পৃষ্ঠা

ত্রয়োদশ অধ্যায়—কয়েকটি সামাজিক প্রত্যয় ও আদর্শ

১। সামাজিক প্রত্যয় ও আদর্শ ... ২২৬
২। যুথবৃত্তি ... ২৬৫
৩। সাধারণ স্বার্থ ... ২৬৮
৪। সামাজিক উদ্‌বর্তন ... ২৭০
৫। সামাজিক উদ্‌বর্তনের সর্ত ... ২৭৪
৬। সমাজ প্রগতি ... ২৮০
৭। সামাজিক প্রগতির মানদণ্ড ... ২৮৩

চতুর্দশ অধ্যায়—সমাজসত্তা ও লোকায়ত নীতি

১। সামাজিক সত্তা ... ২৮৮—২৯০
২। লোকায়ত নীতি ... ২৯০—২৯২

পঞ্চদশ অধ্যায়—সামাজিক ব্যাধি ও নিদান

১। সামাজিক অন্যায় ... ২৯২—২৯৪
২। অপরাধ ... ২৯৪
৩। সামাজিক অপরাধের কারণ ও নিদান ... ২৯৪—২৯৬
৪। শাস্তি সম্পর্কিত মতবাদ ... ২৯৭—২৯৯
৫। প্রতিবোধাত্মক মতবাদ ... ২৯৯—৩০২

সমাজ দর্শনের ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

সমাজদর্শনের ভূমিকা।

মহামতি এরিস্টটল মানুষের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন 'যুক্তিবান পশু'। এই সংজ্ঞায় একদিকে তিনি সমগ্র প্রাণ প্রবাহের সঙ্গে মানুষের জীবনকে ধারাবাহিক ও সম্পর্কিত ভেবেছেন, অন্যদিকে তার স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তার পরিচয়ও দিয়েছেন। জীবনপ্রবাহের ধারাবাহিকতার পরিচয় মানুষের 'পশুত্বে' কারণ প্রাক-মানবিক পর্যায়ে পশুদের ইতিবৃত্ত। শুধু ইতিহাসের পরম্পরাতেই মানুষ ও পশুর যোগ নয়, উন্নত জীব মানুষ উন্নতির পর্বেও পাশবিক বৃত্তির দাস। পশুর মতোই তারা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। বিভিন্ন কার্যক্রমে মনের নিহিত বৃত্তির (instinct) দ্বারা পরিচালিত। আবার তাই বলে কি মানুষ ও পশু সমার্থক? এরিস্টটল মানুষের স্বতন্ত্র সত্তার পরিমাপ পেয়েছেন তার স্বাধীন বুদ্ধিতে, নিজস্ব সংকল্পে যখন সে প্রাকৃতিক বন্ধনের দাসত্ব মুক্ত হয়ে কাজ করে। শুধুমাত্র প্রকৃতির নিয়মে অন্ধের মতো পরিচালিত না হয়ে মানুষ ধাপেধাপে, ইতিহাসের পর্বেপর্বে, প্রকৃতির নিয়ম বুঝতে চেষ্টা করে এবং যতোটুকু জানে ততোটুকুই ব্যবহার করে আরো বৃহত্তর পর্যায়ে উঠবার জন্যে। প্রকৃতির নিয়ম বুঝে ব্যবহার করাতেই তার স্বকীতার জন্ম, বুদ্ধি বিবেচনার সূত্রপাত ও উন্নত সামাজিক পর্যায়ে চলে যাবার প্রেরণা। চার্লস ডারয়ুইনের যুগান্তকারী আবিষ্কার 'অভিব্যক্তিবাদ' এরিস্টটলের জানা ছিলো না। তবু অভিজ্ঞতার নজীরে ও দার্শনিকতার অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি মানুষের মৌলিক চরিত্র বুঝতে বিন্দুমাত্র ভুল করেননি।

জন্মের শুরু থেকেই মানুষ বুদ্ধির ছাপ ফেলছে। প্রকৃতি যতোটুকু দিচ্ছে তার চেয়ে বেশি সে প্রকৃতি থেকে আদায় করছে। সেই কোন্ সুদূর অতীতে স্পেনের আল্টামিরার গুহায় আদিম মানুষ যে অসামান্য চিত্রাবলী গুহার দেয়ালে এঁকে রেখেছে তার তুলনা নেই। পশুজীবনের খুব নিকটবর্তী সেদিনকার মানুষেরা তাদের জীবনের চার পাশ থেকেই শিল্প ও চিন্তার উপকরণ গ্রহণ করেছিলো। একই উপকরণ

ছড়ানো ছিলো অন্য পশুদের চারপাশে। অথচ তারা এমন চিত্রবিদ্যার রহস্য আবিষ্কার করতে পারেনি। একমাত্র মানুষই পেরেছে এবং পেরেছে বলেই জানা যাচ্ছে মানুষ প্রকৃতিকে আত্মস্থ করতে পারে, প্রকৃতিকে নিজের মতো ব্যবহার করতে পারে। প্রকৃতি সহজে তাকে কিছু দেয় না, সহজে তাকে শেখায় না কি তার রহস্য, কি তার নিয়মের সূত্র। অথচ মানুষ দিনে দিনে প্রকৃতিকে চিরেচিরে দেখছে বিজ্ঞান ও শিল্পের আলোয়। আল্‌টামিরা গুহার আদি মানুষেরাও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাতেই চারপাশের জীবনকে দেখেছে, শিল্পের দৃষ্টিতে রঙ, রেখা ও গুহার দেয়ালের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে পূর্ণ ছবির নিকষে তাদের জ্ঞানকে বিচার করেছে এবং পরবর্তীদের কাছে প্রমাণ রেখে গেছে মানুষের সম্ভাবনার কথা।

এরিস্টটল যদিও অত্যাশ্চর্য সরল বিশ্লেষণে মানুষের তাৎপর্য ঘোষণা করেছেন, ব্যাপারটা আমাদের আরো একটু তলিয়ে দেখতে হয়। মানুষের 'বুদ্ধি' আছে এবং বুদ্ধির পরিচয় মেলে তার কর্মে ও সংগঠনে। অথচ মনুষ্যেতর বহু প্রাণীতেও কর্মকুশলতা ও সংগঠন দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষত, আমাদের অতি পরিচিত নগণ্য প্রাণী পিঁপড়ে ও মৌমাছিতে। আমরা সবাই জানি যেকোনো পশুরই বুদ্ধি আছে। বানর বিষয়ে প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতা আছে আর জর্মন পণ্ডিত কোহলার শিম্পাঞ্জীদের নিয়ে প্রচুর কাজ করে দেখিয়েছেন শিম্পাঞ্জীরা কেমন শিখতে পারে, অনেকটা মানুষেরই মতো। গৃহপালিত বেড়াল ও কুকুরের বুদ্ধি বিষয়ে তো অসংখ্য গল্প প্রচলিত আছে। তবু মৌমাছি ও পিঁপড়েদের উদাহরণ আরো গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা এমন একটি আশ্চর্য সংগঠন তৈরি করেছে যা আমাদের চমকে দেয়। তাদের জীবনে নির্দিষ্ট কর্ম বিভাগ রয়েছে, যে কর্মবিভাগের অর্থনৈতিক মূল্য এডাম স্মিথ সর্বপ্রথম অর্থশাস্ত্রে প্রচার করেন। এই কর্ম বিভাগটি মানুষের চাইতে অনেক বেশি সুষ্ঠুভাবে ও পরিশ্রমের সঙ্গে পিঁপড়েরা রক্ষা করে। নির্দিষ্ট কর্তব্য থেকে একজনও বিচ্যুত হয় না। সমস্ত সংগঠনটিতে কোনো বিশৃঙ্খলা নেই, মানবিক সংগঠনের মতো সর্বদাই অন্তর্নিহিত কারণে সঙ্কটের সম্মুখীন হয় না। মৌমাছি যে-মৌচাক বানায় তা অপূর্ব গঠন সৌন্দর্য ও শিল্পের নিয়মে রীতিবদ্ধ। এই দুটিক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে পিঁপড়ে ও মৌমাছির বুদ্ধিতে কোনো তফাৎ নেই। বরং সমাজবদ্ধতার নজীরে পিঁপড়ের সামাজিক

সংগঠন মানুষের সংগঠনের চাইতে অনেক বেশি উন্নত। অথচ সাধারণ ভাবেই মনে হয় মানুষ পিঁপড়ে বা মৌমাছির সঙ্গে তুলনায় বরং অনেক শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি? সংগঠন ও সৌন্দর্যের বাহ্য নজীরে তার প্রমাণ নেই। তফাৎ ইচ্ছায়, তফাৎ সঙ্কল্পের প্রকাশে। পিঁপড়ের সংগঠন প্রকৃতি-নির্দিষ্ট চিরকাল একই নিয়মে, একইভাবে তাদের সংগঠন গড়বে, কর্মবিভাগ হবে। প্রকৃতি অদৃশ্য কিন্তু লৌহ দৃঢ় হাতে এই নিয়মটি পিঁপড়েদের জীবনে ব্যবহার করে যাবে। কোনো দিন তাতে বৈচিত্র্য ও বিশৃঙ্খলা আসবে না। এ-কারণেই পিঁপড়ের সংগঠনে সঙ্কট নেই। অথচ মানুষের সংগঠন কোনকালেই কোনো একটি নির্দিষ্টতার রূপে গড়ে না, গড়বে না। যে-কোনো ভাবেই তাতে স্বাধীন, স্বতন্ত্র ইচ্ছা প্রকাশ পাবে। ইচ্ছার সূত্রে পরিকল্পনায় পরিবর্তন ঘটবে। নির্দিষ্ট কর্মে নিয়ম-বদ্ধতার শাসন লাঘব হবে, শ্লথ হবে কার্যক্রম। অর্থাৎ যে কোন মুহূর্তেই সঙ্কট দেখা দিতে পারে। তেমনি মৌমাছিও প্রকৃতির টানে একই রকমে চিরকাল মৌচাক বানিয়ে যাচ্ছে। কোনো দিন তার পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটবে না, এমন কি খারাপও হবে না মৌচাকটি। মানুষের ক্ষেত্রে তা নয়, মানুষের সৃষ্টি কোনো নিয়ম মানে না বলে কুশ্রী ও অসুন্দর হতে পারে, যেমন হতে পারে অপরূপ। আসলে সুন্দর সৃষ্টিতে যেমন নিজস্ব স্বাধীনতার প্রকাশ তেমনি, অসুন্দর সৃষ্টিতে স্বাধীনতারই খেলা। মানুষের বুদ্ধি স্বাধীনতাবোধের দ্বারা জারিত এবং জারিত হওয়াতেই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক হয়ে তার নিজস্ব সংগঠন বানায়, তার সমাজের রূপ নিম্নপ্রাণীদের থেকে স্বতন্ত্র রূপ নেয়।

সুতরাং আমরা শুরুতে যদিও বলবো মানুষ সমাজ-বদ্ধ জীব, মনুষ্যেতর প্রাণীর সমাজের কথাও মনে রাখতে হবে। শুধু দুটি সমাজের চরিত্র ভিন্ন। বরং মনুষ্যেতর প্রাণীর সমাজবদ্ধতার কারণেই বিবর্তনের উন্নত পর্যায়েও সমাজ-বদ্ধতা থাকছে। প্রকৃতির নিয়মে এ-কথাটি থাকছে যে প্রাণী হলেই তার সমাজ আছে। দুরকমে এ কথাটির প্রমাণ নেওয়া যায়। প্রথমত, অভিব্যক্তিবাদের তত্ত্বে; দ্বিতীয়ত, মানুষের মনুষ্যত্বের পরীক্ষায়। ইংরেজ মনীষী চার্লস ডারয়ুইন দেখান যে বিশ্বে দুটি ধারায় অভিব্যক্তি বা পরিবর্তনের লীলা চলছে। পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শুধু উদ্দেশ্য বা উন্নতির কথা স্মরণ রাখতে হয়। যে-কোনো পরিবর্তনকেই ডারয়ুইন অভিব্যক্তি বলেন না। প্রথম ধারায় বিশ্বসংসারে জড় থেকে প্রাণের উৎপত্তি ও

দ্বিতীয় ধারায় প্রাণের বিভিন্ন রূপ ও প্রকাশের বহুবিচিত্র ধারা। আমরা বর্তমানে দ্বিতীয় ধারাটি বিষয়ে চিন্তিত বেশি। মানুষের ইতিহাস জানাটাই আমাদের লক্ষ্য। এককোষ বিশিষ্ট এমিবা থেকে অভিব্যক্তির ধারায় আমরা আসি বহু কোষ বিশিষ্ট বাঁদর জাতীয় প্রাণীতে (anthropoid apes)। এই বাঁদর জাতীয় প্রাণী, যারা পেছনের পায়ে দাঁড়াতে শিখলো শিরদাঁড়া সোজা করে, তারাই মানুষ হয়ে যায়। কিন্তু কথাটার অর্থ এই নয় যে যে-কোনো বাঁদরই মানুষ হয়ে গেলো বা হয়। তা যদি হতো তবে রাস্তার বাজীওয়ালার শেকল বাঁধা বাঁদরটাও একদিন মানুষ হবে। আসলে বাঁদরজাতীয় প্রাণীর একটি শাখা, বিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন 'হোমো স্যাপিএনস' (Homo Sapiens) বা 'বুদ্ধিমান প্রাণী', অভিব্যক্তিতে মানুষ হবার দিকে ঝোঁকে এবং কালক্রমে মানুষ হয়ে তারা পৃথিবী থেকে মুছে যায়। অন্য বাঁদরেরা মানুষ হতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে আর কোনো বাঁদর পৃথিবীতে নেই যারা মানুষ হচ্ছে বা হবে। এক কোষ বিশিষ্ট প্রাণী থেকে বহু কোষ বিশিষ্ট প্রাণীর ইতিহাস যেমন বহু লক্ষ বছরের তেমনি বাঁদর জাতীয় প্রাণী থেকে বর্তমান মানুষ বহু লক্ষ বছরের ফল।

দ্বিতীয় প্রমাণটি বর্তমানে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি মানুষের সন্তানই মানুষ। যেমন অতীতে, তেমনি ভবিষ্যতেও এই ধারা চলবে। কিন্তু আমরা কখনো ভাবিনি এই বক্তব্যটির তাৎপর্য কি। মানুষের পরিবারে জন্মালেই কি নবজাতক মানুষ? সাধারণভাবে, বাহ্যদৃষ্টিতে নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু কার্যত ওই নবজাত শিশুটি দেখতে মানুষের মতো হলেও হয়তো সে মানুষ না-ও হতে পারে। ওই শিশুটিকে মনুষ্য-সমাজ থেকে তফাতে সরিয়ে রাখলে দেখা যাবে কোনো মানবিক বৃত্তিই তার গড়েনি। মানবিক বৃত্তি বলতে মোটামুটিভাবে আমরা বুঝি বাচ্চাটি পেছনের পায়ে দাঁড়াবে, কথা বলবে, হাতের ব্যবহার, দাঁত-মুখের ব্যবহার শিখবে। কিন্তু হাতে কলমে পরীক্ষা নিয়ে দেখা গেছে মানব-শিশু মানব-সম্পর্কহীন অবস্থায় বড়ো হলে এই কটি লক্ষণের কোনটিই পায় না। সে প্রথমত দাঁড়াতে শেখেনা, হাতকে পায়ের মতো ব্যবহার করে, কথা বলতে পারে না, মনের ভাব বোঝাতে অক্ষম হয়। এমন হবার কারণ কি? আমাদের বাড়িতে দেখছি শিশু তিন-চার দিনের মধ্যেই হাঁটতে শেখে, আট-নমাস বয়স হতে না হতেই কথা বলে, যা-কিছু

সামনে পায় তাকেই খপ করে চেপে ধরে হাত দিয়ে। অথচ ওই মানব-সম্পর্কহীন শিশুটির হয় না কেনো? হয় না যে তার কারণ বাড়ির শিশুটির চারপাশে জীবন্ত একটি পরিবেশ থাকছে। অন্য মানুষেরা তাকে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সব শেখাচ্ছে। দেখে দেখে, একটু একটু মাথার ব্যবহার করে সে শিখেছে। এতো সাধারণ ঘটনা এই পেছনের পায়ে দাঁড়ানো যে আমরা তার গুরুত্ব খেয়াল করিনা। অথচ পেছনের পায়ে দাঁড়াতে কমপক্ষে অন্তত পঞ্চাশ হাজার বছর লেগেছিলো। তাই পরিত্যক্ত শিশুটি তার চারপাশের সহযোগিতার পরিবেশ না পেয়ে জানেনা কেমন করে 'মানুষ' হয়ে উঠতে হয়। মানুষের সমাজ এ-কারণেই মানুষের জীবনের সঙ্গে নাড়ীতে নাড়ীতে জড়িয়ে আছে। তাই বলা চলে মানুষ ছাড়া যেমন সমাজ গড়েনা তেমনি সমাজ ছাড়া মানুষ মানুষ হয় না।

২। সমাজ কি মানুষের স্বাভাবিক? (Is Society natural to man?)

আমরা বললাম, সমাজ ছাড়া মানুষ কখনোই মানুষ নয়। কিন্তু নানা সময়ে পৃথিবীতে একদল পণ্ডিত এই সরল সহজ বক্তব্যটিকে প্রশ্নাকারে তুলে অনেক জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা অনেক সময়েই বলতে চেয়েছেন যে সমাজটা মানুষের জীবনে মোটেই মৌলিক কিছু বা স্বাভাবিক কিছু নয়। ইতিহাসের বিশেষ সময়ে নির্দিষ্ট কোনো প্রয়োজনে তার জন্ম দেওয়া হয়েছে। এখানে 'স্বাভাবিক' কথাটির অর্থ হলো 'যা না-হলে চলে না'। সমাজ যদি স্বাভাবিক হয় তবে তা মানুষের স্বভাবেই আছে, তাকে ছাড়া মানুষের চলবে না। এবং সমাজ বিশেষ ইতিহাস ও বিশেষ প্রয়োজনের সৃষ্টি নয়। সমাজ একটি এমন সংগঠন নয় যা মানুষের নিজেকেই বানাতে হয়েছে।

অথচ কেউ কেউ এমন কথা বলেন যে সমাজ মানুষের স্বভাবে নেই। উল্টোটাই সত্য যে, সমাজ জোর করে চাপানো হয়েছে; সমাজহীন মানুষ সম্ভব। উনিশ শতকের মনস্তাত্ত্বিক সিগমুণ্ড ফ্রয়ড অনেকটা এ-জাতীয় কথা বলেছেন। ওঁর মতে সমাজ মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিতে শেকল পরায়। বাধ্য হয়ে মানুষ তা মানে কিন্তু যখন আর মানতে পারে না তখন মানসিক বিপর্যয় ঘটে। মানুষের মনে একটা 'মৃত্যু-ইচ্ছা' কাজ করে, সমাজ সর্বদাই তার বাধা স্বরূপ। মানুষ তাই নাকি নিয়তই একটা ভয়ে আচ্ছন্ন থাকে, ফ্রয়ড যার নাম দিয়েছেন 'সমাজ-ভীতি'। ফ্রয়ডের

কথা মনস্তত্ত্বের প্রসঙ্গ বলে বাদ যেতে পারে কিন্তু আদি গ্রীক দর্শনের ইতিহাসে এই বক্তব্যটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। গ্লকন ও এডিম্যানটাস নামে দুই ব্যক্তি সক্রাটেসকে জানিয়েছিলেন যে, সমাজ ও সমাজ-বন্ধন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। তবু মানুষ যে সমাজ মানে তার কারণ তার সংস্কার ও ভয় অথবা কিছুটা লোভ। যদি ভয় থেকে তাকে রেহাই দেওয়া হয় তবে দেখা যাবে প্রতিটি লোক তার সমাজ-সত্তাকে ফেলে দিয়ে যা-খুশি আচরণে মেতেছে। লোভের ব্যাপারটাও একই রকম। সমাজের কথা মানলে নানাভাবে সমাজ ঘুষ দিয়ে থাকে। কাউকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে, কাউকে চাকরি দিয়ে, কাউকে খেতাব দিয়ে। এই লোভের টোপটা তুলে দিলেই যে যার সমাজ বন্ধন খসিয়ে ফেলে দূরে সরে যাবে। সমাজের কথা বিন্দুমাত্রও ভাবতে রাজী হবে না। গ্লকন ও এডিম্যানটাসের মতে সমাজ তাই একটা চুক্তির মতো।

শুধু গ্লকন এডিম্যানটাসই নয়, সতেরো শতকের ইংলণ্ডে দার্শনিক টমাস হব্‌স ও লক্ এই কথাই বলেন। যদিও হয়তো হবস ও লকের বক্তব্যে কিছু কিছু তফাৎ আছে। ওঁদেরও বক্তব্য ছিলো 'সিভিল সোসাইটি' বা সমাজের আগে মানুষ ছিলো এবং ওই মানুষেরা অনেক বেশি স্বাভাবিক অবস্থায় বাস করতো। সমাজ-পূর্ব অবস্থাকে ওঁরা নাম দিয়েছিলেন 'প্রাকৃতিক অবস্থা'। তখন মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকৃতির অনেক কাছে। প্রকৃতি তাদের অবাধ ক্ষমতা ও অধিকার দিয়েছিলেন। বাধা যতটুকু ছিলো তাহলো কেবলমাত্র প্রকৃতির নিয়ম কানুন। সমাজে বা 'সিভিল সোসাইটিতে' মানুষ চলে আসতে চায় ক্ষমতার অপব্যবহারে, শক্তির অবাধ লীলার ভয়ে সমাজে আসবার জন্যে তারা একটা চুক্তি করে। গ্লকন-এডিম্যানটাস বা হব্‌স-লকের চিন্তা থেকে বোঝা যাচ্ছে সমাজ জন্মাবার আগেই মানুষ মানুষ হয়ে গেছে। বরং সমাজে এসে তার স্বাভাবিক অধিকার ও ক্ষমতায় অনেক বিধিনিষেধ আরোপিত হলো। তাদের স্বাভাবিকত্ব খর্ব হলো। সুতরাং অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে সমাজ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয় শুধু বাধ্যবাধকতা মাত্র। যদিও হয়তো সমাজের প্রয়োজন আছে তবু সেই প্রয়োজনের পরিমাপে মানুষের সীমাবদ্ধ রূপেরই পরিচয় মিলছে, পূর্ণ স্বাভাবিকতার নয়।

এই বক্তব্য মেনে নিতে নানা ধরণের আপত্তি থাকে। প্রথমত আমরা অভিব্যক্তির নজীরে আগেই দেখেছি সমস্ত প্রাণীই যুথবদ্ধ অর্থাৎ সমাজবদ্ধ।

দ্বিতীয়ত, নিম্নতর প্রাণীর বিবর্তিত পরিণত রূপ বলেই মানুষ সমাজ ছাড়া কোনো কালেই ইতিহাসের পাত্র হিসেবে দেখা দেয়নি। তৃতীয়ত, প্রাকৃতিক অবস্থায় প্রাক্-সামাজিক স্তরে মানুষ যদি কাছাকাছি থাকে তবে মানুষ ও নিম্নতর প্রাণীতে তফাৎটা কোথায় এবং কেনোই বা পার্থক্যের শুরু। চতুর্থত, যা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয় তা এতোদিনের পরেও ছেড়ে দিচ্ছে না কেনো? পঞ্চমত, প্রাক্-সামাজিক মানুষের চেহারাটা যে কেমন ছিলো তা এই পণ্ডিতরা জানান না। তখনকার রূপটা না জানলে এমন অবস্থা মেনে নিতে যথেষ্ট বাধা থাকে।

কার্যত, মানুষ কোনকালেই সমাজ ছাড়া বাঁচেনি। সমাজই মানুষের স্বাভাবিকত্বের পট। সমাজেই মানুষ যেহেতু মানুষ সমাজ ছাড়া তার পরিচয় কুত্রাপি মেলেনা, মিলতে পারে না। তাছাড়া মানবশিশুর জন্মই সমাজে যেহেতু ন্যূনপক্ষে দুজন, মা ও বাবা, তার জন্যেই থাকতে বাধ্য। এবং এমনি করে পরম্পরায় আরো বাবা-মার হিসেব আসতে থাকে। সমাজ-বিজ্ঞানীদেরও জানাতে হয় আদিম এই সব স্বামী-স্ত্রী সন্তানদের সম্পর্কের রূপ বিষয়ে। খৃষ্ট পুরাণে যে-কারণে আদম-ইভ ও ঈশ্বরের কাহিনী বা যে-কোনো দেশের সৃষ্টিতত্ত্বে সম্পর্কের কথাই বারবার উচ্চারিত হচ্ছে। ভারতীয় শাস্ত্রে তাই পাচ্ছি ঈশ্বর একাকী ভীত হয়ে সৃষ্টির লীলায় নামেন। একক ব্যক্তির সমাজ নেই কিন্তু যে-মুহূর্তে একের পাশে আরো একজন এসে দাঁড়ায় অমনি সমাজের কথাটা এসে পড়ে। দানিএল দিফোর পৃথিবী বিখ্যাত রবিনসন ক্রুশোরও সঙ্গী জোটে এবং একাকিত্বের শূন্যতা দূর করে ক্রুশো ফ্রাইডের সঙ্গে সম্বন্ধ গড়েন। নতুন একটি সমাজ ও সামাজিক সূত্রের পত্তন হয়। সৃষ্টির কোনো পর্যায়েই আমরা একক একটি ব্যক্তির পরিচয় পাচ্ছিনা। ব্যক্তি সর্বদাই দুই, সেই দুইয়ের সম্পর্ক মিলেই জগত। ভারতবর্ষের প্রকৃতি ও পুরুষ, চীনের ইং ও ইয়াং যেমন। পেছনের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে বাঁদর জাতীয় এমন প্রাণীরাও প্রকৃতিতে বাঁচবার তাড়নাতেই সর্বদা একত্রিত। প্রকৃতি কোনো শূন্যতা পছন্দ করেন না। তাই একক মানুষের স্বপ্ন বা পরিকল্পনা সমাজ-বিজ্ঞানীর খামখেয়াল হতে পারে। কিন্তু কার্যত তার সহযোগী সঙ্গী বা সঙ্গিনী জুটে যায়। গোড়া থেকেই থাকে। আসলে তাই আমরা জানি যে সমাজ ছাড়া কোনদিনই মানুষ কখনো ছিলোনা, সমাজ নিতান্তই স্বাভাবিক মানুষের জীবনে। গ্লকন এডিম্যানটাসদের বক্তব্য নিছক

আত্মপ্রতিষ্ঠার যুক্তিমাত্র। সমাজ-পূর্ব প্রাকৃতিক অবস্থা যেমন নেই তেমনি সামাজিক যুক্তিরও প্রয়োজন নেই সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য।

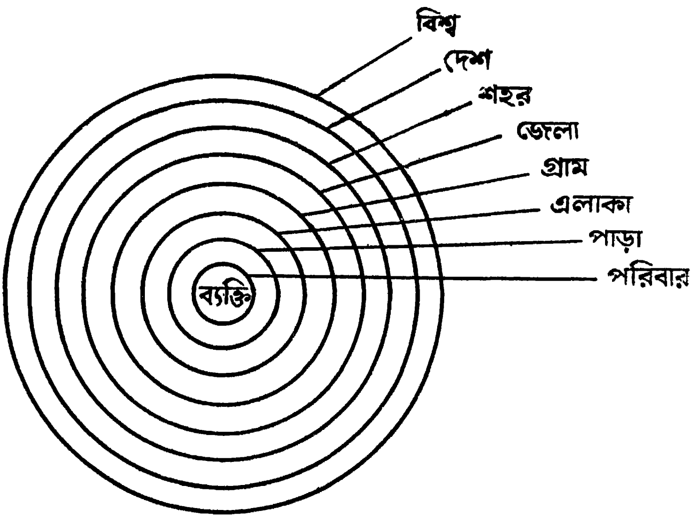
৩। **সমাজ কাকে বলে (What is Society):** সমাজ যদি মানুষের প্রকৃত মানুষ হবার জন্যে স্বাভাবিক হয় তবে প্রথমেই জানা দরকার সমাজ বলতে আমরা কি বুঝি বা সমাজ কাকে বলবো। সমাজের সংজ্ঞা-নির্ধারণে আমাদের প্রথম কথাই হলো, **সমাজের অর্থ সম্পর্ক**। আগেই বলেছি ইতিহাসে কোনোদিনই একক কোনো মানুষের খোঁজ নেই। প্রথম থেকেই মানুষ দলবদ্ধ। এমন কি ঈশ্বর বিষয়ক চিন্তাতেও দুজনের কথা: ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্ট জগৎ। ঈশ্বর যখন একা তখন তাঁর ঈশ্বরত্বের খোঁজ কেউ রাখতে যাচ্ছেনা। একাকিত্বের ভয়েই তিনি সৃষ্টিতে নামেন। কমপক্ষে তাই দুজনের কথা থাকছেই। জগতে যখন দুজন আছে তাদের মধ্যে সম্পর্কের সূত্র অনিবার্য। সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা যে-মুহূর্তে হচ্ছে সেই মুহূর্তেই সমাজ উপস্থিত কারণ সম্পর্কই সমাজ। দুজনের উদাহরণে অবশ্য প্রশ্ন করা চলে, সেই দুটি ব্যক্তি উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরুতে বসবাস করলে কি সমাজ পাই? নিশ্চয়ই পাইনা। যেহেতু দুই মেরুবাসী দুই ব্যক্তি আর দুই নন, তারা এক এক প্রান্তে এক একটি ব্যক্তি। আসলে সম্পর্ক তখনই আছে যখন তারা কাছাকাছি থাকছে, দুজনার কাজে দুজন লাগছে। এমন অবস্থায় সম্পর্ক দু-ধরনের হতে পারে। সহযোগিতা বা বিরোধিতা। কিন্তু সম্পর্কের চরিত্র যাই হোক, সম্পর্ক অস্বীকার করবার উপায় নেই। বিরোধিতাতেও সম্পর্ক থাকে যেহেতু বিরোধিতা ওই দুজনের। সহযোগিতা আছে বলেই সম্পর্ক ভাঙার কথা। সুতরাং সমাজ মূলতই সম্পর্ক। এই সম্পর্কের ধরণ বিভিন্ন, সুর বিভিন্ন, চরিত্র বিভিন্ন। যে-কটি ব্যক্তিকে ঘিরে সম্পর্ক গড়ে তাদের ওপর সম্পর্কের ধাঁচ ও চরিত্র নির্ভর করে। একটি ব্যক্তি প্রতি মুহূর্তে অন্যের সঙ্গে নানা সম্বন্ধ গড়ে। প্রত্যেকটিই তার সম্পর্কে কিন্তু তার মাত্রা ও পরিচয় ভিন্ন ভিন্ন। একটি বাড়ীতে যেমন একজন ব্যক্তি কারো পিতা কারো সন্তান, কারো ভাই, কারো দাদা, কাকা ইত্যাদি। প্রতিটিই সম্পর্ক অথচ অসংখ্য তার মাত্রাভেদ। এই সম্পর্কের সূত্র ধরেঃ তার ব্যবহার **আবার ব্যবহার সংগঠিত হয়েই সম্পর্কের গড়ন অনুযায়ী সমাজ**। সুতরাং এবার আমরা বলতে পারি সম্পর্কেই সমাজ এবং সম্পর্ক **অনন্ত** ও জটিল। মাকড়সার জালের নজীরে সম্পর্ক বোঝা যায়। এক

একটি তত্ত্ব যেমন প্রতিটি তত্ত্বর সঙ্গে জড়িত অথচ তারা নিজেরা সম্পূর্ণ পৃথক। বিজ্ঞানের উদাহরণে বলা যায় এই সম্পর্ক হলো এক-কেন্দ্রিক বৃত্তের মতো (concentric circle)। একটা কেন্দ্র থেকে অনন্ত পর্যন্ত বৃত্ত তৈরি করা যায়। প্রতিটি বৃত্ত স্বয়ং সম্পূর্ণ একক কিন্তু কেন্দ্রের কারণে আবার পরস্পর গ্রথিত। পুকুরে ঢিল ফেললে যেমন দেখা যায় একটা কেন্দ্র থেকে বৃত্তাকারে ঢেউ পাড় পর্যন্ত বয়ে যেতে থাকে। সম্পর্ক বা সমাজ তেমনি করে কোনো একজনকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

সম্পর্ক বা সমাজের সূত্রপাত তাই আলোচনার সুবিধের জন্য 'ব্যক্তি' নিয়ে। এই ব্যক্তি কিন্তু নিছক একা নয়। তাকে ঘিরেই সমস্ত সম্পর্ক বা সমাজ। ওপরে বলেছি সম্পর্কের সঙ্গে আচরণ বা ব্যবহার জড়িত। প্রত্যেক ব্যবহারের নিজস্ব রূপ আছে, এই রূপ সংগঠিত হলেই বলি সমাজ। অর্থাৎ দুভাবে সমাজের কথা পাচ্ছি। প্রথমত আদি এবং মৌলিকভাবে সম্পর্ক হলেই তাকে বলবো সমাজ। কিন্তু সমাজের নামকরণের সময় তাকে বুঝতে চাই ব্যবহারের সংগঠন দিয়ে। যেমন স্বামী-স্ত্রী-সন্তানদের প্রাথমিক সম্পর্কের সংগঠনকে বলবো **পরিবার**। পরিবার সমাজ এই জন্যে যে সম্পর্ক আছে বলেই পরিবার পাচ্ছি। কিন্তু তাকে পরিবার বলছি যেহেতু এই সম্পর্কের (স্বামী-স্ত্রী-সন্তান) একটি নির্দিষ্ট সংগঠিত রূপ আছে, যার পরিচয় আমরা সহজে পেতে পারি।

সমাজ বিমূর্ত সংজ্ঞা। তাকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যরূপে ধরা-ছোঁওয়া যায় না। সম্পর্কের পরিচয় পাই কেবল মাত্র বাহ্যিক আচরণে। তাই সমাজ খুঁজতে আমরা আচরণ দেখি। বিধিবদ্ধ নির্দিষ্ট আচরণ থেকে ধারণা করি, ভাবি এমনই বোধহয় সমাজের রূপটা। এই বোধ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয় সম্পর্ক দানা বেঁধে উঠলে। দানা বাঁধা অবস্থাকেই সংগঠন বলা হয়েছে, যেমন পরিবার। বিমূর্ত সমাজ কাজেকাজেই একবারে পূর্ণরূপে আমাদের গোচরে আসেনা। আমরা তাকে কেটে, টুকরো টুকরো করে দেখি। টুকরোগুলোকে পণ্ডিতরা নাম দিয়েছেন **'সম্প্রদায়'** (cmmunity), সম্প্রদায় হলো নির্দিষ্ট সম্পর্ক। সম্প্রদায়ের নির্দিষ্টতা থাকায় সহজে প্রত্যক্ষ হয়। পরিবার এই অর্থে একটি সম্প্রদায় কারণ তার আচরণের সীমাবদ্ধতা আছে, প্রত্যক্ষতা আছে। এ জন্যে আমরা সর্বদাই বলি 'ছাত্র-সম্প্রদায়' 'নারী-সম্প্রদায়,' হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায়, শিশু-সম্প্রদায়, কিশোর সম্প্রদায় ইত্যাদি। তাহলে স্পষ্ট করে সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় যে, সমাজ

নির্দিষ্ট চরিত্র পেলে সম্প্রদায় হয় এবং সম্প্রদায়ের সূত্রেই সমাজের পরিচয়। সম্প্রদায়কে চিনি সম্পর্কের বাহ্য আচরণে, তার নির্দিষ্ট ব্যবহারের রূপে। সুতরাং ব্যক্তির সম্পর্ক থেকে আমাদের শুরু এবং এক-কেন্দ্রিক বৃত্তের মতো আমরা পৌঁছে যাই সারা বিশ্বে সম্পর্কের জাল বুনতে বুনতে, সম্প্রদায় গড়তে গড়তে।



১নং চিত্র—সমাজ (এককেন্দ্রিক বৃত্তের সম্পর্ক)

[এক-কেন্দ্রিক বৃত্তের ছবিটিতে আরো অসংখ্যস্তরের সম্পর্ক আছে। শুধুমাত্র মোটা সম্পর্কটা দেওয়া হলো।]

সম্প্রদায়ের অর্থে মনুষ্য সমাজকে ভেঙে ভেঙে দেখা যেতে পারে। নিকটতম সম্পর্ক অর্থাৎ রক্তের সম্পর্কে গড়ে পরিবার। পরিবার থেকে পৌঁছোই গোত্র-সম্পর্কে (clan organisation), গোত্র-সম্পর্ক থেকে জন-গোষ্ঠীতে (tribe)। অনেক জন-গোষ্ঠী মিলে আবার পাই জাতি (nation), জাতির সমাহারে দেশ, মহাদেশ ও পৃথিবী। এক একটি গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে ভাগ করলে পাবো আমাদের প্রথম ছবি অনুযায়ী পরিবার থেকে বিশ্ব। সুতরাং সম্পর্কটা ছোটো থেকে বড়ো হচ্ছে, আবার বড়ো থেকে ছোটো। সম্পর্ক কিন্তু সর্বদাই থাকছে। সম্পর্কের বৃত্তটা এককেন্দ্রিক কারণ সম্পর্কের সূত্রপাত ব্যক্তিকে ধরে।

৪। সমাজ বিষয়ে কয়েকটি সংজ্ঞা (Some definitions of Society)

সমাজের সংজ্ঞা বিষয়ে আমাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠার পর কয়েকটি সংজ্ঞার আলোচনা করা যেতে পারে। এই আলোচনায় দেখতে পাবো পণ্ডিতেরা কেমন গোলোযোগের সৃষ্টি করেছেন। অপরিচ্ছন্নতার ধোঁয়া কাটিয়ে বিচারের কেন্দ্রে পৌঁছোতে পারেন নি। আমরা বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক ম্যাকাইভরকে দিয়ে শুরু করি।

অধ্যাপক ম্যাকাইভরের ভাষায় সমাজ হলো 'মানুষে মানুষে প্রতিটি সংকল্পস্থিত সম্পর্ক' ('every willed relationship of man to man')। ওঁর গ্রন্থ 'Community : A Sociological Study'তে এই সংজ্ঞাটি দিয়েছেন। ওঁর আলোচনা থেকে তিনটি বক্তব্য বের করা যায়। (১) আমাদের মতো উনিও মানছেন যে সমাজ আসলে পারস্পরিক সম্পর্ক। (২) এমন একটা সম্পর্ক যা আগ্রহান্বিত ব্যক্তিরা নিজেরাই গড়েছে। (৩) সদৃশ জীবনযাত্রা বা সাদৃশ্যমূলক জীবন যাত্রার একটা অংশ। কিছুটা বিশদ করে তিনি বলেন সমাজ হলো এমন একটা সহযোগিতা বা সংগঠন যা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে গঠিত সাদৃশ্য মূলক একটা জীবনযাত্রা ('an organization of common life definitely established for the pursuit of one or more common interests') আর সম্প্রদায় হলো সদৃশ জীবনযাত্রার একটা টুকরো ('an area of common life' or 'a focus of common life')।

অধ্যাপক ম্যাকাইভরের সংজ্ঞাটি প্রাথমিকভাবে মানা যায় যদিও তার মৌলিক ত্রুটি আছে। জানবার মতো কথা হলো, সমাজ নিঃসন্দেহে সম্পর্ক ও সম্পর্কে সদৃশ ব্যবস্থায় থাকছে। কিন্তু ভুলের সূত্রপাত তখন থেকেই যখন তিনি বলেন সম্পর্কটি 'সঙ্কল্পস্থিত'। সঙ্কল্পে স্বেচ্ছামূলক বাছাইয়ের কথা থাকছে। এই বক্তব্যের দুটো ত্রুটি : প্রথমত, মানুষের সমাজকে বেছে নেবার সুযোগ ঘটেনা কারণ সে জন্মেই সমাজ পায় বা সমাজেই সে জন্মায়। দ্বিতীয়ত, বাছাইয়ের কথা মানলে স্বীকার করতে হবে সমাজ স্পষ্টতই কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে চলে। উদ্দেশ্যটি আবার যেনো সভাসমিতি করে স্থির করা হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের আগেকার সমস্ত সিদ্ধান্তই ভুল আর হব্‌স-লকদের প্রতিপাদ্যটাই সত্যি।

সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে অধ্যাপক ম্যাকাইভর সদৃশ ব্যবহারের কথা সঠিক বলেছেন। আমরাও আগে দেখেছি যে সমাজ সংগঠন বাহ্য আচরণের সূত্রে বোঝা যায়। দুটি বাহ্য আচরণ মিললে তাদের মধ্যে ঐক্য আমরা

সহজে বুঝতে পারি ও তাদের একই শ্রেণীভুক্ত করতে পারি। কিন্তু সদৃশ আচরণের ক্ষেত্রে একটি দার্শনিক প্রশ্ন ওঠে। মানুষে মানুষে সদৃশ আচরণের মতো শ্রেণীতে শ্রেণীতেও সদৃশতা আছে। শ্রেণী আমরা তাকেই বলি যেখানে একত্র সংখ্যাগুলোতে মিল পাই। যেমন ধরা যাক 'আপেল'। আপেলের আপেলত্ব নিয়ে আমরা একটা আপেল শ্রেণী গড়তে পারি। এই আপেল শ্রেণীর মধ্যে নানাদেশের নানাজাতের আপেল থাকতে পারে। এক একটা আপেলের জাত আলাদা কিন্তু তারা আপেল শ্রেণীভুক্ত হয়েই আপেল হয়ে ওঠে। কেমনভাবে একটা আপেল শ্রেণীভুক্ত হয়? আপেল শ্রেণীর সঙ্গে আমরা নির্দিষ্ট আপেলটির সাদৃশ্য খুঁজে দেখি এবং মিল পেলে সেটাকে শ্রেণীভুক্ত করে নিই। শ্রেণীভুক্ত হলে প্রত্যেকটি আপেলের মধ্যে একটা সম্পর্ক থাকে, যে-সম্পর্কের জোরেই আপেলের শ্রেণী হচ্ছে। সাদৃশ্য তাদের গুণের (আপেলত্বর)। যে গুণের দ্বারা বা চরিত্রের দ্বারা তাদের অন্য শ্রেণী থেকে তফাৎ করা হচ্ছে তা দিয়েই আপেলের পরিচয়। এই সম্পর্কটিকে আমরা বলি শ্রেণী সম্পর্ক। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে আপেলের সাদৃশ্যে ও শ্রেণীরূপের সম্পর্ক নিছক বাহ্য, ব্যাপ্তি (extension)-র সম্পর্ক মাত্র। বাহ্য সম্পর্ক বলতে বুঝি যে পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারা আপেলগুলো একে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে না। মানুষের সমাজেও মানুষে মানুষে সাদৃশ্য থাকছে। কিন্তু সাদৃশ্য নামক গুণের পরিচয়ে যদিও মানুষদের শ্রেণীবদ্ধ করা যায় তবুও সমাজ এমন শ্রেণীবদ্ধ সাদৃশ্যই শুধু নয়। তার চেয়ে বেশি। কারণ মানুষের ক্ষেত্রে সম্পর্কটা ভেতরের, আমরা বলতে পারি, অন্তর্নিহিত। এই অন্তর্নিহিত সম্পর্ক কেবলমাত্র ব্যাপ্তির নয় কারণ এই সম্পর্কের ফলে মানুষেরা সমাজভুক্ত অবস্থায় একে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সম্পর্কের টানে নিজেরা বদলে যেতে থাকে। সুতরাং আপেলগুলোর প্রত্যেকটাকে সরিয়ে দিলে নিশ্চয়ই আপেলের 'সমাজ' বা শ্রেণীটি থাকে না কিন্তু তার দ্বারা একক আপেলগুলোর কোনো চারিত্রিক পরিবর্তন নেই। মানুষের সমাজ অন্তর্নিহিত সম্পর্কের চাপে এমন রূপ নিয়েছে যে মানুষদের তফাতে সরিয়ে দিলে যেমন সমাজ নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি একক ব্যক্তিটিও আর মানুষ থাকে না। তার চরিত্রের হানি ঘটে। আগেই যেমন বলেছি মানুষ নিম্নতর প্রাণী থেকে তফাৎ তার স্বাধীনতার কারণে, স্বাতন্ত্র্যের

কারণে, তেমনি তার সমস্ত স্বাতন্ত্র্যই এমন যে সমাজ নষ্ট হলে সমস্ত স্বাতন্ত্র্যই ভেঙে যায়। মনুষ্যসমাজের ক্ষেত্রে সে-জন্যেই মানুষের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও ইচ্ছার কথা মনে রাখতে হয়। অবশ্য ইচ্ছার অর্থ এই নয় যে অধ্যাপক ম্যাকাইভরের মতো আমরা বলবো মানুষ জেনেশুনে পরিকল্পনা করে উদ্দেশ্য নিয়ে সমাজ গড়েছে।

অধ্যাপক র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন 'Structure and Function in Primitive Society' গ্রন্থে লিখেছেন সামাজিক ব্যবস্থা (Social system) হলো সামাজিক জীবনযাত্রায় বিভিন্ন চরিত্রের নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ সম্পর্ক। এই সম্পর্কগুলোর মধ্যে তিনি সামাজিক সংগঠন (Social structure) নামে একটি প্রত্যয় ব্যবহার করেন। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে যা নির্দিষ্ট ও সদৃশমূলক তাকেই তিনি সংগঠন বলছেন, ইতিপূর্বেই যেমন আমরা ব্যাখ্যা করেছি। ওঁর ভাষায় পাচ্ছি 'সাংগঠনিকভাবে নিয়ন্ত্রিত বা সংজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ব্যবস্থা' ('an arrangement of persons in institutionally controlled or defined relationships'—পৃঃ ১১)। যেমন ধরা যাক, স্বামী-স্ত্রী, রাজা-প্রজার সম্পর্ক। এক্ষেত্রে অধ্যাপক ব্রাউনের মতে সেই সম্পর্কটাই আলোচনায় আসছে যা ঐতিহাসিকভাবে স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট রূপ পেয়েছে। শুধু তাই নয়, কারণ আমরা ইতিপূর্বে যে-কোনো সম্পর্ককে হিসেবে ধরছিলাম। যেমন ভাই-বোন, মা-ছেলের সম্পর্ক। কিন্তু অধ্যাপক ব্রাউন জোর দিচ্ছেন নিয়মতান্ত্রিক দিকটার ওপর, যে-কারণে ও যে-ভাবে প্রায় আইনানুগভাবে একটি সংগঠন স্বীকৃত হয়। ওঁর উদাহরণের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক তাই শুধু নির্দিষ্টই নয়, আইনে স্বীকৃত।

অধ্যাপক ম্যাকাইভর ও অধ্যাপক ব্রাউনের সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় সমাজতাত্ত্বিকরা দুটো প্রান্তের মধ্যে ঘুরছেন। একদলের কাছে সমাজ সম্পর্কের সমষ্টিমাত্র, আবার আর একদলের কাছে বিধিবদ্ধ সংগঠন। অথচ এই দুটোই সত্যি। সমাজ যেমন সামূহিক একটি সমাবেশ (Social aggregate) তেমনি নির্দিষ্ট সংগঠনও (Social structure)। আমাদের সংজ্ঞাতে দুটো বক্তব্যই সঠিকভাবে স্বীকৃত।

৫। সমাজ ও সমাজের বিভিন্ন পর্যায় (Different Phases of Society):

ইতিহাসের শুরুতেই সমাজ যদি থাকে তবে প্রশ্ন উঠবে সমাজ কি চিরকালই নির্দিষ্ট চেহারায় থাকছে? অভিব্যক্তির ধারায় মানুষ তো

বদলে যাচ্ছে, তার সম্পর্কের সংগঠন বদলাবে না? নিশ্চয়ই বদলাবে, কিন্তু মৌল সম্পর্কটা চিরকালই থাকবে। মানুষের যেমন অবস্থান, যেমন পারস্পরিক আদান-প্রদান (Social transaction) তেমনি তাদের সম্পর্কের রূপ। এই রূপের সঙ্গে জড়িত তাদের সংগঠন।

বিভিন্নদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজ-সংগঠনের ধারা ও বিবর্তন অবশ্য বিভিন্ন। আগেই বলেছি যে সমাজতাত্ত্বিকরা একভাবে আলোচনা করে বলেন, প্রথমে বড়ো জনগোষ্ঠী দিয়ে আমাদের আলোচনার সূত্রপাত তারপর সেই জনগোষ্ঠীতেই নিকট রক্তের সম্পর্কে একধরণের পরিচয়, দূরবর্তী সম্পর্কে আর একধরণের পরিচয়। নিকট রক্ত সম্পর্কের পরিচয় থেকে গড়ছে পরিবাব ও দূরবর্তী সম্পর্কে গোত্র (clan)। পণ্ডিতরা অনেকে বলেন, আগে জনগোষ্ঠী (tribe), তারপর জনগোষ্ঠীর ভেতরে গোত্র-সংগঠন, তারপর পরিবার। সময়ের ছকে ঘটনাটা দেখলে অবশ্য সমস্যা থাকে কারণ এমন হিসেব মতো সত্যিই বড়ো থেকে ছোটো সংগঠন হয়েছে কিনা বলা শক্ত। দ্বিতীয়ত, এই বক্তব্যে মানুষের প্রাথমিক মৌল সম্পর্ক অর্থাৎ পিতা-মাতা ও সন্তান সম্পর্কটিকে গোড়ায় অস্বীকার করা হচ্ছে। তাই জনগোষ্ঠীতে শুরু হয়ে, গোত্র-সংগঠনের মধ্য দিয়ে পরিবারে আসছেন ওঁরা। গোত্র-সংগঠনের নানা রূপ থাকতে পারে। তার পরিচয় আছে বিবাহ-ব্যবস্থায়। গোত্রস্থিত বিয়ে বা গোত্র-বহির্ভূত বিয়ে (Endogamy, Exogamy)। পরিবারে এলেও নানাজাতের সংগঠন পাচ্ছি। যেমন মাতৃ-ধারা ও পিতৃ-ধারা (matriarchy-patriarchy) মাকে পরিবারের কেন্দ্র ও উৎস ভেবে তাঁরই প্রাধান্য যে-পরিবারে, আবার একই রকমে বাবাকে উৎস ও কেন্দ্র ধরে যে-পারিবারিক ক্রম। কেন্দ্রের কারণে পরিবারের নানাধরণের সম্পর্ক।

জনগোষ্ঠীর সংগঠনে আবার নানা ধারা আছে। ইতিহাসে তার বিভিন্ন পর্যায় সমাজতাত্ত্বিক-নৃতাত্ত্বিকরা (Sociologist-anthropologist) আলোচনা করেন। যেমন, আদিম গোষ্ঠীসমাজ (primitive tribal society), যার রূপ ও গড়ন আমাদের সমাজের মতো নয়। এই গোষ্ঠী আবার প্রাকৃতিক কারণে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় হঠে যেতে বাধ্য হয়। কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থির থাকতে পারে না। তাদের ভ্রাম্যমান অবস্থাটাকে নাম দেওয়া হয়েছে যাযাবরী সমাজ (Nomadic Society)। এই অবস্থার কিছু পরে মানুষ বেশ কিছুদিন

একটা জায়গায় থাকবার চেষ্টা করেছে পশুপালন করতে শিখে। পশুপালনের পরবর্তী ধাপে তারা চাষ আবিষ্কার করে। কৃষিকাজের সঙ্গে সঙ্গেই মোটামুটি স্থায়ীভাবে তারা বসবাস করতে শুরু করে। এই পর্বের নাম কৃষিস্তর (agricultural stage)। কৃষিস্তর থেকে মানুষ এসে পৌছায় যন্ত্রের মাধ্যমে শিল্পস্তরে (industrial stage)। যন্ত্রেরও নানা রকমফের। পুরাতত্ত্ববিদরা যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে সামাজিক পর্বের নামকরণ করেছেন। যেমন, পাথুরে পর্ব (Stone age), তাম্র-ব্রোনজ পর্ব (Copper-Bronze), সবশেষে ইস্পাত পর্ব। যন্ত্রের বিবর্তনের নামে শুধু যে বাহ্য-প্রসঙ্গের কথা বলছেন পুরাতত্ত্ববিদরা তা-নয়, ওঁরা আভ্যন্তরীণ পরিবারের রূপ ও সংগঠনের পরিচয়ভেদের কথাও বলেছেন। আদিম গোষ্ঠীপর্বের পরিবার ও কৃষিস্তরের পরিবার, পরিবারের রীতিনীতি ধ্যানধারণায় আকাশ-পাতাল তফাৎ। শুধু 'পরিবার' নামটির সাদৃশ্যেই যদিও তাদের মূল রূপটি চিনি তবু প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটে গেছে। শুধু নামেই আর তাদের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আদিম গোষ্ঠী জীবনের পরিবার দিয়ে কেউ বর্তমান পরিবারের স্বরূপ বোঝাতে চাইলে এদের দুটির প্রকৃতিই আমাদের জ্ঞানের অগোচরে থাকবে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা শুধু বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, সমাজ-রূপের ঐক্য যেমন আছে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংগঠনে তেমনি গরমিলও প্রচুর। সমাজ-বিবর্তনের ধারা কোনো একটিমাত্র খাতে কখনোই বয় নি (Unilinear নয়), বহু খাতে বয়েছে (multi-linear)। সমাজ-সংগঠনের বড়ো পর্বগুলোর ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য উপ-সংগঠন ও উপধারা বর্তমান।

৬। সমাজ-বিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্ব (Social Science or Sociology)

তাহলে মানুষই আমাদের সমস্ত আলোচনার কেন্দ্র। যে-আলোচনায় প্রত্যক্ষত মানুষকে ঘিরে ভাবা হচ্ছে না এমনকি সেই আলোচনাটিও মানুষের। কারণ, মানুষই আলোচনা করছে, তার চোখে, তার ভাবনায় বিশ্ব-প্রকৃতির সংবাদ আদান-প্রদান করা হচ্ছে। নিজ বুদ্ধির সাহায্যে নিম্নতর প্রাণী থেকে তফাতে সরে এসে মানুষ একদিকে যেমন প্রকৃতিকে জানবার সুযোগ পেলো, তেমনি প্রকৃতির অন্ধ বন্ধন থেকেও মুক্তি পেলো। প্রকৃতির 'অন্ধ বন্ধন' কথাটির অর্থ এই যে, প্রকৃতি যেমন চালাবে তেমনি

চলতে হবে। ক্ষুধাদ্রেক প্রকৃতির নিয়ম সুতরাং ক্ষিধে পাবেই। প্রকৃতির নিয়মের দাস হলে মানুষ ক্ষিধের সময় যা পাবে তাই খাবে। মানুষ কিন্তু দাসত্ব ত্যাগ করতে চায় এইভাবে যে, সে বাছাই করবে, দেখেশুনে নেবে। ফলে প্রকৃতি টানলেই সে নাচে না, যেমন বলে তেমনি করে না। এ কথার অর্থ আবার এই নয় যে, প্রকৃতির নিয়মকে অস্বীকার করা যায়। নিয়মকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না, শুধু নিয়মটি জেনে তার সঙ্গে নিজের ব্যবহারের মাত্রা মানুষ স্থির করে নেয় মাত্র। যতোটুকু স্থির করতে পারে, ততোটুকুই তার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য।

মানুষ তার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যেই জীবনযাত্রার স্থিতি ও লক্ষ্য পায়। শুধুমাত্র অন্ধের মতো নিয়মের দাস হলে সে জীবন-মৃত্যুর দোলায় পুতুলের মতো দুলতে পারে বড়োজোর, তার কর্মের কোনো লক্ষ্য, নির্দিষ্টতা ও চারিত্র্য থাকে না। যেহেতু তখন শুধু তার বেঁচে থাকাটাই কাজ। মানুষ নিয়মের নিগড়ের মধ্যেই যতোটুকু স্বাধীনতা পেয়েছে বা সৃষ্টি করেছে ততোটুকুই তার কল্পনা, ইচ্ছার ক্রিয়া ও স্বাধীন কর্মকাণ্ড। শুধু বাঁচার জন্যেই সে বাঁচে না, তার আরো কিছু প্রয়োজন করে। খাওয়া দরকার আদিম প্রকৃতির কারণে। কিন্তু মানুষ যেমন তেমন করে খায় না. খাওয়াটাকেও শিল্প করে তোলে। শুধু বাঁচেই না, আল্‌টামিরার গুহায় রঙিন ছবি আঁকে। এজন্যেই এরিস্টটল বলেছেন শুধু বাঁচা নয়, ভালোভাবে বাঁচা। এমনি জীবন নয়, শুভজীবন ('good life')। মানুষ শুভজীবনের লক্ষ্যে সম্পর্কের অসংখ্য জাল বোনে ও তার সঙ্গে মিলিয়েই সংগঠনগুলো তৈরি হয়।

এই সংগঠন ও সম্পর্কগুলো আলোচনার বিভিন্ন শাস্ত্র আছে। মানুষের সামাজিক জীবনের রীতিনীতি, চিন্তাভাবনা, সম্পর্ক ও সংগঠনের পরিচয় যে-শাস্ত্রে মেলে তাকেই সমাজ-বিজ্ঞান (Social Science) বলা হয়। সমাজ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা। এক-একটি শাখা এক-এক বিশেষ পরিচয় বহন করে। যেমন রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি। সমাজ বিজ্ঞানের একটি শাখার নাম **সমাজতত্ত্ব** (Sociology)। সমাজতত্ত্ব সাধারণভাবে সমাজের তত্ত্ব অর্থাৎ সমাজের যাবতীয় আলোচনা সমাজতত্ত্ব করে। সমাজই তার প্রধান আলোচ্য বিষয়। সমাজ বলতে যেহেতু আমরা সম্পর্ক ও সম্পর্ক অনুযায়ী সংগঠনের কথা বলেছি সুতরাং **সমাজতত্ত্বের মূল ও প্রধান আলোচনার বিষয় এই সম্পর্ক ও**

সংগঠনের উৎস, রূপ ও চরিত্র। যা-কিছু এই তিনটির সঙ্গে জড়িত তা-ই সমাজতত্ত্বের এলাকায় পড়ে। সমাজ-বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজতত্ত্বের আলোচনার তফাৎ এইটুকু যে, সমাজতত্ত্ব সমস্ত তত্ত্বেরই সামাজিক উৎস ও অসামাজিক সম্পর্কের রূপটি খোঁজে, জানতে চায় কেনো কোন্ সম্পর্কের টানাপোড়েনে সংগঠনের এই বিশেষ রূপটি তৈরি হচ্ছে। সমাজ-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলো আলোচনা করে সংগঠনের চরিত্র নয়, এমনকি কারণও নয়, সংগঠনের প্রকাশের ফলটুকু। ধরা যাক্, যেমন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সংগঠনের কথা আছে, সংগঠনে ধৃত সম্পর্কের আইনানুগ প্রকাশের কথাও আছে কিন্তু রাষ্ট্র-বিজ্ঞান আলোচনা করেনা কেনো ওই বিশেষ সংগঠনটি গড়েছে। গ্রীক্ সমাজে এথেন্স নগরে 'পলিটি' নামে কেনো একটি প্রত্যয় তৈরি হয়েছেলো। এই প্রত্যয়টিকে সাধারণভাবে 'নগর-রাষ্ট্র' বলে। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে নগর-রাষ্ট্রের পরিচয় আমরা নিই কিন্তু কেনো একমাত্র গ্রীসেই নগর-রাষ্ট্র জন্মালো অন্যত্র জন্মালো না—এ প্রশ্ন সমাজতত্ত্বের, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নয়। অর্থাৎ যা-কিছুর সামাজিক উৎস আছে তা-ই সমাজতত্ত্বের বিষয়। এক অর্থে তাই সমাজতত্ত্ব সমাজ-বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট একটি অংশ নিয়ে ব্যাপৃত থাকে। সমাজ-বিজ্ঞান ব্যাপক শাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব তার অংশ। সমাজ-বিজ্ঞান জাতি (genus) আর সমাজতত্ত্ব উপজাতি (species)। আবার আর একভাবে দেখলে বোঝা যাবে সমাজতত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি। কারণ সমাজতত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয় মানুষের সম্পর্ক ও সম্পর্ক-জাত সংগঠন। বাকি সব কটি শাস্ত্র এই সম্পক ও সংগঠন-নির্ভর। বর্তমান কালে পৃথিবীর সর্বত্র তাই সমস্ত শাস্ত্রকেই সামাজিক কার্যকারণের সূত্রে দেখার চেষ্টা করা হচ্ছে অর্থাৎ সমাজতত্ত্বের নিরিখে (standard) দেখবার চেষ্টা চলছে।

সমাজতত্ত্ব বিষয়ক আমাদের সংজ্ঞাটিই মূল। আমাদের কথার প্রতিধ্বনি আছে অধ্যাপক মরিস গিন্সবের্গের বক্তব্যে। তিনি 'A note on the conception of stages' প্রবন্ধে লিখেছেন 'Sociology I take to be the study of the relations and interactions between men living in societies, including the conditions and the consequence of such interactions.' গিন্সবের্গের বক্তব্যে, সম্পর্ক ও ঘাত-প্রতিঘাতের (interaction) এর কথা বলা হচ্ছে সামাজিক মানুষের বিষয়ে। আমরা

আরো মৌলিকভাবে দেখিয়েছি যে সম্পর্কটাই সমাজ। সম্পর্ক থাকে বলেই ঘাত-প্রতিঘাত বা টানা-পোড়েন সত্য হয়। সুতরাং গিন্সবের্গের মতো 'সমাজবাসী মানুষ' ধরে না-নিয়ে গোড়াতেই সমাজের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য বুঝে নেওয়া দরকার। আর এক জায়গায়, 'Reason and unreason in society' গ্রন্থে লিখেছেন 'It is concerned with all that happens to human beings in virtue of the relations to each other.' (পৃঃ ১) একথা নিশ্চয়ই ঠিক যে মানুষের সম্পর্কের সূত্রে যা-কিছু থাকে তাকেই সমাজতত্ত্ব আলোচনা করে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা দ্বারা সমাজ-বিজ্ঞানের অন্য শাখার সঙ্গে তফাতটা বোঝা যায় না। সঠিকভাবে বলা দরকার যে সেই সম্পর্ক ও সংগঠনই সমাজতত্ত্বের আলোচ্য যার **উৎস, রূপ ও চরিত্র সামাজিক কার্যকারণের সূত্রে খোঁজ হচ্ছে।**

সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় পণ্ডিতদের কিছু কিছু মতবিরোধ আছে। মতবিরোধের ক্ষেত্র সমাজ সংগঠনের উদ্দেশ্য বিষয়ে, একদল পণ্ডিতের মতে সমাজতত্ত্ব যেহেতু বিজ্ঞান সে-হেতু শুধুমাত্র বাইরে প্রকাশিত আচরণ ও আচরণ অনুযায়ী সংগঠনের আলোচনা করবে। সুতরাং এই আলোচনায় উদ্দেশ্য বা নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য নেই। একমাত্র তথ্যেই অর্থাৎ যা আছে তাতেই এই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে। আর একদল পণ্ডিতের মতে সমাজতত্ত্ব উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও মূল্য বিষয়েও আলোচনা করে। ওঁদের মতে সমাজতত্ত্ব মানুষের সামাজিক জীবনের আলোচনা, এবং মানুষ যেহেতু শুধুমাত্র যন্ত্রের নিয়মে চলে না, তার প্রতিটি কাজে কোনো-না-কোনো উদ্দেশ্য লুকোনো থাকে, সমাজতত্ত্বকে এই গোপন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের খোঁজ রাখতে হয়। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সূত্রেই সংগঠনকে বোঝা যায়। কারণ মানুষের সংগঠন শুধুমাত্র বাহ্য আচরণই নয়, প্রতিটি আচরণেই কিছু-না-কিছু প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। প্রয়োজন থাকলেই উদ্দেশ্যও থাকে। সবক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য হয়তো স্পষ্ট নয় বা সচেতনভাবে মানুষ উদ্দেশ্য গড়ে না। কিন্তু মানুষ সচেতনে বা অচেতনে তার অন্তর্নিহিত চরিত্রকেই প্রকাশ করে। এই অন্তর্নিহিত চরিত্রের খোঁজ সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হওয়া দরকার। শুধুমাত্র বিজ্ঞান বললে তাই সমাজতত্ত্বের পুরো পরিচয় পাওয়া যায় না। সমাজতত্ত্বকে উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও তাৎপর্যের খোঁজে দর্শনের এলাকায় আসতে হয়। বিজ্ঞান গড়পরতা নিয়মটা খোঁজে এবং নিয়মের সূত্রে বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে বুঝতে চায়।

সমাজতত্ত্বও সম্পর্ক ও সংগঠনের বিশ্বব্যাপী গড়পরতা নিয়মটি আবিষ্কার করার চেষ্টা করে। বিজ্ঞান প্রকৃতির নিয়মকে খোঁজে এবং সেই নিয়মের নির্দিষ্টতা থাকায় গড়পড়তা সূত্র তৈরি করতে তার অসুবিধে হয় না। মানুষের ক্ষেত্রে আমরা আগেই দেখিয়েছি নিয়মের রাজত্ব যদিও আছে তবু মানুষের জীবনে তার প্রভাব সর্বত্রগামী নয়। মানুষ তার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধে একটিমাত্র সর্বব্যাপী নিয়মের দ্বারা পরিচালিত নয়। মানুষ, সমস্ত অবস্থাতেই নিয়মের ওপরে উঠতে চায় তাই তার সংগঠনের এতো রূপ বৈচিত্র্য। কোনো একটি দেশের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার ধরণ অন্যত্র হুবহু খাটে না। সমাজতত্ত্ব তাই যদি বিজ্ঞানের নিয়মের রাজত্বকে মানুষের সমাজে খুঁজতে চায় তবে তা কখনোই মেলে না। সমাজতত্ত্ব এজন্যেই যথার্থ বিজ্ঞান হতে পারে না। দর্শন কোনো গড়পরতা নিয়ম খোঁজে না। দর্শনের সমস্ত আলোচনাই নির্দিষ্টতা ও প্রত্যক্ষতা বিষয়ে। যদিও বিশিষ্ট দ্রব্য বস্তু ও গুণের মধ্যে ঐক্যসূত্র দর্শন আরোপ করে। কিন্তু এই আরোপিত ঐক্যসূত্রটি প্রাকৃতিক নিয়মের মতো নির্দিষ্ট ও স্থির নয়। অভিজ্ঞতার সূত্রে সভ্যতার নানা পর্বে নিয়মের ভাঙাগড়া চলে। ভাঙাগড়ার কারণ আছে মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতায়। সুতরাং শুধুমাত্র যা আছে তার আলোচনাতেই তার পূর্ণ পরিচয় মেলে না। সমাজতত্ত্বকে প্রতিবারই তাই দর্শনের সাহায্য নিতে হয়।

দর্শনের সাহায্যে সমাজতত্ত্ব মানব জীবনের আদর্শাদির খোঁজ করে। আদর্শগুলোকে উদ্দেশ্য লক্ষ্যও দিয়ে বুঝতে হয়। কারণ আদর্শ চিরকাল স্থির নাও থাকতে পারে। উদাহরণত যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে নানা উদ্দেশ্য আরোপ করলেও সমাজকে তা থেকে আমরা অনেক সময়ই বাদ দিতে চাই। ব্যক্তির জীবনে শ্রেয় ও প্রেয়র কথা তুলি এবং সেই অনুযায়ী কর্মবিভাগের কথা বলি। ব্যক্তির জীবনে মঙ্গল আনবার জন্যে এই শ্রেয় ও প্রেয়র কথা। যা সে আশু ফল লাভের জন্যে করবে এবং যা সে মনুষ্যত্বের জন্যে করবে অথচ ব্যক্তির মঙ্গলের পাশাপাশি সমাজমঙ্গলের কথাও থাকে। কারণ কথাটা রাখতেই হয়। সমাজ তো ব্যক্তির সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু নয়। ব্যক্তির মঙ্গলের কথাতেই সমাজ মঙ্গলের লক্ষ্য জড়ানো থাকে। কিন্তু উপযোগিতাবাদীদের মতো বা অর্থনীতির ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতো আমরা যেহেতু বিশ্বাস করি না আপনা থেকেই স্বয়ংক্রিয় ভাবে

ব্যক্তির মঙ্গল জুড়ে জুড়ে সমাজমঙ্গল গড়ে, আমরা কিছুটা সচেতন ভাবে সমাজ মঙ্গলের কথা তুলি। সমাজ মঙ্গলের কল্পনা উদ্দেশ্য হিসেবে মনের মধ্যে গুপ্ত থাকে। অবশ্য মনে রাখা দরকার এই উদ্দেশ্য তর্ক-বিতর্ক করে, সভাসমিতি করে তৈরি করা হয় না। একটা জাতির চৈতন্য সর্বদাই প্রবাহিত হয় সংস্কৃতির ধারায় ও স্মৃতিতে। জাতির মূল শাস্ত্র, পুরাণ, সংহিতা ও স্মৃতি গ্রন্থে তার পরিচয় থাকে।

৭। সমাজ-বিবর্তনে স্তরের প্রত্যয় (Conception of Stages in Social Evolution)

আগেকার অংশেই আমরা দেখেছি সমাজতত্ত্ব কেমন বিজ্ঞান থেকে দর্শনের কাছে চলে আসে। যতোটুকু তার তথ্যের আলোচনা, প্রগতি বা পরিবর্তনের সাধারণ সূত্র-নির্দেশের চেষ্টা ততোটুকুই বিজ্ঞানের প্রভাব সমাজতত্ত্বের ওপর। অথবা বলা চলে সমাজতত্ত্ব ততোটুকুই বিজ্ঞান। মানব-জীবনে উদ্দেশ্যের উপস্থিতি সমাজতত্ত্বের চরিত্র পাল্টায়। শুধুমাত্র সংগঠন ও সম্পর্কের চরিত্রই নয়, তাকে আরো বাড়তি কিছু অর্থাৎ পরিবর্তনের ধারা ও চরিত্রের লক্ষ্য বিষয়ে উৎসাহিত হতে হয়। পরিবর্তনের ধারা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনার অবকাশ থাকে। সমাজতাত্ত্বিকরা নানা তর্কবিতর্কে তা স্পষ্ট করবার চেষ্টা করেন।

আমরা আরো দেখেছি যে, মানুষের জীবনে উদ্দেশ্য থাকায় তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা কোনো একটিমাত্র নির্দিষ্ট খাতেই বইতে চায় না। বরং বৈচিত্র্য থেকে আরো বৈচিত্র্যে রূপ নেয়। এ-কারণেই সমাজ-তাত্ত্বিকরা যদিও বলেন যে সমাজ বিবর্তনের ধারা একমুখী বা একরৈখিক বা একমাত্রিক (unilinear) নয়, বহুমুখী বা বহুমাত্রিক বা বহুরৈখিক। এই বক্তব্যে জীববিদ্যার একটা তত্ত্ব কাজ করে। জীববিদ্যায় বলা হচ্ছে প্রাণ উদ্‌বর্তনের ধারা বা অভিব্যক্তির চলার ছকটা হলো সরল থেকে জটিলতার দিকে। কিন্তু এই স্বীকৃতিতেও সমস্যা দূর হয় না। সমাজতাত্ত্বিকরা সাধারণতই ঝোঁকেন নির্দিষ্ট কয়েকটি মূলসূত্রের দিকে। ভাবেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো বুঝি সারা বিশ্বের জন্য কয়েকটি মূল সূত্র আবিষ্কার করা যাবে এবং তাদের দ্বারা বিজ্ঞানের মতোই ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে সামান্য (universal) নিয়ম খুঁজতে সারাজীবন ব্যাপৃত ছিলেন বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক অগাস্তে কোঁৎ (Auguste Comte) ও জর্মন পণ্ডিত কার্ল মার্কস (Karl Marx)। এঁরা দুজনেই দুটি ছক উপস্থিত করেন।

কোঁৎ পান তিনটি স্তর-পরম্পরায় সমাজের ঝোঁক প্রত্যক্ষ বা 'পজিটিভ'-পর্যায়ের দিকে আর মার্কস অর্থনীতি শাস্ত্রের শ্রেণী সংগ্রামতত্ত্বে সমাজ পরিবর্তনের চাবি। স্তর বা মূলসূত্র খোঁজবার চেষ্টাকে আমরা পাঁচটি ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমত, একই সংগঠন সারা পৃথিবীব্যাপী একই ধারায় আসছে। যেমন, সমস্ত সমাজই পরিবর্তিত হবে পরিবারের ক্ষেত্রে মাতৃ-ধারা থেকে পিতৃ-ধারার মধ্য দিয়ে আধুনিক পরিবারে। এই বক্তব্যকে আমরা একমাত্রিক ঝোঁক বলতে পারি। দ্বিতীয়ত, সারা পৃথিবীতে নির্দিষ্ট কোনো সংগঠনের রূপ পরিবর্তন নয়, মূলতই সমগ্র বিশ্বে সমাজ যে-নিয়মে বদলায়। কোঁৎ ও মার্কস এই ধারার প্রতিভূ। তৃতীয়ত, কেউ কেউ কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিয়মটিই বলেন কিন্তু ধারণা রাখেন যে অন্য জনগোষ্ঠী একই ভাবে কাজ করবে। যেমন জর্মনীর অর্থনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস ছকেন স্মোলের (Schmoller)। এই ধারার বক্তব্যকে সমাজতাত্ত্বিকরা বলেন 'নোশন অব জেনেটিক কন্টিনুইটি' (Notion of Genetic Continuity) যার অর্থ পূর্ববর্তী স্তর থেকে সর্বদাই পরবর্তী স্তরটি আসছে। আমরা বলতে পারি 'জন্ম-সন্ততির মত'। চতুর্থত, মনে করা হয় 'জন্মসততির মত'টা ঠিক ঐতিহাসিক সত্য না-ও হতে পারে কিন্তু আলোচনার মডেল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। যাকে বলা চলে সত্য না-হলেও একটা 'আদর্শরূপ' বলে ধরা যেতে পারে। পারস্পরিক তুলনা, মাপ ও সাদৃশ্যের জন্য চিন্তার হাতিয়ার মাত্র। যেমন, বিখ্যাত জর্মন সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স হেবার (Max Weber) তাঁর 'আদর্শরূপ'টি ব্যবহার করেন। পঞ্চমত, সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ও সংস্কৃতির ঝোঁক। সমাজ বিবর্তনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারা-উপধারার পারস্পরিক সংযোগ-বিয়োগে নতুন অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন বলেন জর্মন পণ্ডিত গ্রীবনের ও শ্মিট (Graebner, Schmidt)।

এই পাঁচটি মতের কোনো একটিকেই চূড়ান্ত বলে স্বীকার করা যায় না। প্রথমটি বিষয়ে আমাদের আপত্তি খুব প্রত্যক্ষ যে পৃথিবীতে কোথাও কোন সরলরেখার মতো এক ধাপ থেকে আর এক ধাপ আসেনি। মাতৃধারা, পিতৃধারার উদাহরণে তো নয়ই। কোথাও মাতৃধারা আগে কোথাও পরে, তেমনি পিতৃধারা কোথাও আগে কোথাও পরে। রবার্ট ব্রিফল্টের মূল্যবান গ্রন্থ 'মাদার্স' এমন কোনো প্রমাণ রাখতে পারেনি যে আমরা সর্বত্রই একটিমাত্র ধারাকে মেনে নেবো। উল্টো নজীর

হেবস্টারমার্ক প্রচুর দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় মতের বিষয়ে প্রধান আপত্তিই হলো যদিও এঁরা মূলসূত্রটি বলছেন সমাজ বিবর্তনের, কিন্তু কখনোই জানান না যে সত্যিই সময়ের প্রবাহে একই নিয়মে, একই সূত্র কি সর্বত্র পুনরাবৃত্ত হচ্ছে? কোঁৎ-মার্কসের সামান্যনিয়ম বিষয়ে আর একজন জর্মন পণ্ডিত বেশ বলেছেন যে মানবতার একটি ইতিহাস বলে কিছু হয় না। মনুষ্যজাতিই যেহেতু বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী সেহেতু তাদের কোন একটি সূত্র থাকবার কথা নয়। তৃতীয় মত আমাদের প্রথমটিকে স্বীকার করে না বলে নির্দিষ্ট সভ্যতা বা পরিবর্তনের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নানা ইতিহাসের আলোচনা আজও শেষ হয়ে যায়নি যে তুলনামূলক আলোচনার কোন ঐক্যসূত্র পাওয়া যেতে পারে। এই পদ্ধতি বর্ণনামূলক কিন্তু বর্ণনা কোনো কালেই শেষ করা যাবে না যেহেতু একটা পর্ব শেষ হতে-না-হতেই নতুন পর্ব এসে যাবে। চতুর্থ মতের সমাজতাত্ত্বিকরা, যেমন হেবার, গোড়াতেই একটি আদর্শ ধারা ছকেন। ছকবার সময় ধরে নেন কেমনভাবে এবং কি পরিমাণ বা কতোটা পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকছে। তারপর ওই ছকটি ব্যবহার করছেন ঐতিহাসিক পর্বগুলোর ওপর। উদাহরণত যেমন, আমরা যদি হস্তচালিত শিল্পের 'আদর্শরূপটি' নিয়ে এগোই তবে ওই সমাজে মূলধনের উৎস একমাত্র জমি থেকে অর্জিত করই হবে। তখন পরিবর্তনের কারণ আমরা বলবো জমির সীমাবদ্ধ সরবরাহ, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, মূল্যবান ধাতুর বাজারে প্রচলন ও আরো বেশি কর্মদক্ষতার বিন্যাস। এবার আমাদের ব্যাখ্যা বাস্তবের সঙ্গে মেলাবো। না মিললে ধরে নেবো যে ওই সমাজটি আসলে পুরোপুরিই হস্তচালিত শিল্পের ওপর নির্ভরশীল নয়। এই পদ্ধতিটি কার্যকরী হতে পারে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'আদর্শ-রূপটি' সত্য বলে স্বীকৃত হয়ে যায়। পঞ্চম প্রস্তাবটি আসলে সমাজ-পরিবর্তনের নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম ঘোষণা করে না।

এবারে প্রশ্ন হবে, তবে সমাজ পরিবর্তনের নিয়ম বিষয়ে আলোচনাটাই বৃথা? সামান্য (universal) সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা নিশ্চয়ই বৃথা। কিন্তু ওই চেষ্টা ছেড়ে দিলে আমরা নিশ্চয়ই আলোচনা করতে পারি সামাজিক জীবনের কোন্ কোন্ অংশ বৃত্তির নির্দেশে (functionally) সম্পর্কিত। আমরা খোঁজ করতে পারি সংগঠনগুলো পরিবর্তনের কোনো নির্দিষ্টতা আছে কিনা, একটি পরিবর্তনের সঙ্গে অন্যগুলোর কোনো যোগ আছে

কিনা, ইত্যাদি। তারপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন আমরা অনেকগুলো পরিবর্তনের পরম্পরা (serial orders of change) পাবো তখন তাদের পারস্পরিক আলোচনায় একটা 'সাধারণ স্তর' বিষয়ে ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

৮। পুরাতত্ত্ববিদের পরিবর্তন ব্যাখ্যা (Archæology's Explanation) ঃ

পুরাতত্ত্ববিদরাও পরিবর্তনের নিয়ম বলতে চান। পুরাতত্ত্বের ক্ষেত্র অবশ্য অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। মাটি খুঁড়ে দ্রব্যাদি পাওয়া গেলেই পুরাতাত্ত্বিকরা কাজ করতে পারেন। নানা সভ্যতার নানা চিহ্ন মিলিয়ে ওঁরা কয়েকটি সাধারণ সূত্র স্থির করেছেন এবং তার সঙ্গে মিলিয়েই অন্য সভ্যতার স্তর, সময় ও উন্নতি-অবনতির হিসেব করেন। হয়তো এমন সভ্যতা আছে যার কোনো চিহ্নই নেই অথবা আজ পর্যন্ত কেউ খুঁড়ে বের করতে পারেনি তবে পুরাতাত্ত্বিকরা সেই সভ্যতা বিষয়ে কোনো সাক্ষ্য দেবেন না। এজন্যেই শ্রেষ্ঠ পুরাতত্ত্ববিদ অস্ট্রেলীয় অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড লিখেছেন যে ওঁদের জালে যা ধরা পড়ে না সে বিষয়ে ওঁরা সম্পূর্ণই অজ্ঞ। আবার এমন হতে পারে যে একটি স্তরে এঁরা বেশ কিছু প্রমাণ পেলেন অথচ অন্য স্তর থেকে কিছুই মিললো না তাই পুরাতত্ত্ববিদের ঘোষণায় নানা ফাঁক থেকে যাবে।

পুরাতত্ত্ববিদরা পরিবর্তন ব্যাখ্যা করেন উপকরণ বা হাতিয়ার দিয়ে। করবার যেমন ব্যবহারিক কারণ আছে তেমনি একটা দার্শনিক কারণও আছে। ব্যবহারিক কারণ হলো পুরাতত্ত্ববিদের জালে যে দ্রব্যাদি ধরা পড়ে তাদের গড়ন-কৌশল ও গড়ন-পদ্ধতি দেখেই ওঁদের সেই সভ্যতার সামাজিক চরিত্রটি বুঝতে হয়। কারণ উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে তাদের সামাজিক উন্নতি-অবনতির গভীর যোগসূত্র থাকে। দার্শনিকভাবে প্রস্তাবনাটা এই দাঁড়ায় যে, মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রকৃতি নিজ হাতে উপকরণ জোগায়। যেমন বাঘের দাঁতের ধার, মাংসপেশীর শক্তি ও থাবার বীর্য বাইরে থেকে জুটিয়ে দেয় না। তার জন্যে বাঘকে নিজে নিজে পরিশ্রমও করতে হয় না। দায়িত্ব ও পরিশ্রম প্রকৃতির। মানুষকে এসব জোগান দিতে প্রকৃতি নারাজ। অথচ প্রতিকূল পরিবেশে এই সব শক্তিশালী জন্তুদের মধ্যেই তাকে বাঁচতে হয়েছে। বাঁচার উপকরণ তাকে মাথা খাটিয়েই বের করতে হয়েছে। মানুষ-বিবর্তনে প্রথম মূল্যবান উপকরণ তৈরি হয়েছে তার হাত। সামনের থাবা দুটো যেদিন হাত হলো

মানুষের ইতিহাসে সেদিন যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ প্রথমত সে পেছনের পায়ে দাঁড়াতে পারছে। দ্বিতীয়ত ধীরে ধীরে হাতের ব্যবহারে সে প্রকৃতি থেকে বিশেষ আহরণের সুযোগ পেয়ে গেছে। হাতের বিবর্তনের সঙ্গে মস্তিষ্কের বিবর্তনের গভীর যোগ। হাত যতোই খুলেছে ততোই মাথাও খুলেছে যেহেতু হাত উপকরণ যোগাড় করলে উপকরণ ব্যবহারের কৌশল বের করতে হয়। মানুষ হিসেবে হাতের ব্যবহারের পর্যায়ে মানুষের প্রথম হাতিয়ার পাথর ও লাঠি (stones and sticks)। এই হাতিয়ারের গুরুত্ব এতো বেশি যে পুরাতাত্ত্বিকরা উপকরণের নামে সমাজ পর্যায়ের নামকরণ করেছেন। প্রথমটা তাই পাথুরে যুগ। পাথর ব্যবহারের ফলে তখনকার সমাজে উপকরণাদির চরিত্র পাথর কতোটুকু জোগাড় করতে পারে তার উপর নির্ভর করেছে। তারপর বিরাট পদক্ষেপ মানুষের ধাতু আবিষ্কারে। ধাতুর সঙ্গে প্রাচ্যদেশের নতুন বিবর্তন। গর্ডন চাইল্ড তার নামকরণ করেছেন 'নাগরিক সভ্যতা' (urban civilization)। প্রাচীন পৃথিবীতে, অর্থাৎ মিশর, মেসোপটেমিয়া, ভারতবর্ষের, তাই ঐশ্বর্যের সীমা নেই। হাতিয়ার (tools) যখন ধাতু হয় তখন তার ক্ষমতা ও স্থিতিস্থাপকতা বাড়ে। প্রকৃতি থেকে আহরণের ক্ষেত্র ব্যাপ্ত হয়। ধাতুর পর্যায়ে সমাজের নাম হয় কখনো তাম্র ব্রোঞ্জ ও কখনো ইস্পাত। বর্তমানে ইস্পাত পর্ব চলেছে। আদিকালের পাথরও যেমন হাতিয়ার, বর্তমানের ইস্পাতও তাই। তফাৎ শুধু ক্ষমতায়। মানুষ ওই হাতিয়ারের পরিবর্তন করতে করতে বর্তমান সভ্যতা ও ঐশ্বর্যের স্তরে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গেই তারও মানসিক জগতে বিপ্লব ঘটে গেছে। হাতিয়ার এ-কারণেই পুরাতাত্ত্বিকদের পরিবর্তন-তত্ত্বের চাবি।

এই সমালোচনার সূত্রে আমরা সিদ্ধান্ত করছি যে (১) নিম্নস্তর পশু ও প্রকৃতির যোগ সরাসরি প্রত্যক্ষ।

নিম্নতর প্রাণী—প্রকৃতি

আর মানুষের ক্ষেত্রে পরোক্ষ। হাতিয়ারের মধ্য দিয়ে।

মানুষ—হাতিয়ার—প্রকৃতি

কিন্তু এই পরোক্ষ যোগের কারণেই মানুষ প্রকৃতি থেকে আদায় করতে করতে উদ্বর্তিত হয়েছে অথচ নিম্নতর প্রাণী প্রকৃতি থেকে সব পেয়েও পর-নির্ভরতায় অভিব্যক্তির নিচু ধাপে আটকে থেকে গেছে। (২) পুরাতত্ত্বের আলোচনা মূল্যবান কিন্তু সমাজতত্ত্বের নিয়মের মতোই এই

সূত্রগুলি আংশিক। যেমন পুরাতত্ত্বের পরিবর্তনের ছকে মানুষ-বিবর্তনের পরিচয় মেলে না, সংস্কৃতির বৈচিত্র্যই শুধু নয় সংস্কৃতির মূল পরিচয়টাই অস্পষ্ট থাকে। যেমন পাথুরে যুগে থেকেও সীমাবদ্ধ উপকরণের জগতেও প্রাচীন মানুষ আলটামিরার অপূর্ব গুহাচিত্র এঁকেছিলো যা বর্তমানকালের চূড়ান্ত ঐশ্বর্যের মধ্যেও শিল্পীদের চর্চার বিষয়।

৯। সমাজদর্শনের-সূত্রপাত (Why of Social Philosophy)

সমাজতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বের আলোচনায় দেখতে পেলাম মানব-সমাজের কোনো নির্দিষ্ট মূল নিয়ম নেই। কারণ হিসাবে বলেছি, মানুষের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য। আমরা আরো দেখেছি সমাজতত্ত্ব কেমন উদ্দেশ্য-চালিত মানব-সমাজকে বুঝবার জন্যে দর্শনের দিকে ঝুঁকেছে।

মানুষের জীবনে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য বুঝবার জন্যে আমরা জীবনের উদ্দেশ্যতত্ত্বে এসেছি। মানুষের জীবন শুধুমাত্র অজ্ঞাত অন্ধসূত্রে প্রকৃতি নির্দেশিত ছকে বিবর্তিত হয় না। এই বক্তব্যটি বুঝবার জন্যে অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির কয়েকটি নির্দেশ বিচার করা যাক। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি মানুষের জীবনকে তিনটি অংশে ভাগ করেছেন। ওঁর মতে এই তিনটি দিক থেকে বিচার করলেই মানুষকে বোঝা যাবে: (ক) উদ্ভিজ্জ প্রকৃতি (vegetative aspect), (খ) জৈবিক প্রকৃতি (animal aspect) ও (গ) প্রাতিস্বিকতা বা স্বকীয়তা ('an aspect that is more peculiarly his'—ম্যাকেঞ্জি, 'আউটলাইনস অব সোশ্যাল ফিলোজফি'—পৃঃ ৩১)। মানুষের জীবন নিতান্তই জটিল, এই জটিলতার ভিত্তি উপরোক্ত তিনটি গুণের মিশ্রণে গড়েছে। মানুষ যে অভিব্যক্তির চূড়ায় তার প্রমাণ হিসেবেও এই তিনটি দিককে দেখানো যায়। মানুষের মধ্যেই নিম্নতর বিবর্তনের গুণগুলো আছে, যেমন আছে তার স্বকীয় গুণাবলী। অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে এক একটি গুণই তাদের স্বকীয়তাকে প্রকাশ করে। যেমন উদ্ভিদের উদ্ভিজ্জ প্রকৃতি, জীবের জৈবিক প্রকৃতি। মানুষের নিশ্চয়ই মানবিক প্রকৃতি কিন্তু মানবিক প্রকৃতিতে প্রথম স্তর দুটির উপস্থিতি থাকছে।

মানুষের চরিত্রে উদ্ভিজ্জ প্রকৃতির পরিচয় হলো যে সে উদ্ভিদের মতোই কিছুটা স্থাণু। জায়গার সঙ্গে আবদ্ধ, আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে উদ্ভিদ যেমন শিকড়ের বন্ধনে মাটির সঙ্গে বাঁধা, মানুষ তো তেমন নয়। কিন্তু একটু নজর করলেই দেখা যাবে মানুষও জমির বন্ধন এড়াতে পারে না। মানুষও প্রকৃতির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। মানুষ যদিও উদ্ভিদের মতো

এক জায়গায় আটকে নেই, তবু সত্যিই আটকে আছে। উদ্ভিদ আটকে আছে প্রকৃতির কাছে একই আকাশ, জলবায়ুর মধ্যে। মানুষ ঠিক একটি কেন্দ্রে আবদ্ধ না হলেও একই রকমে একই আকাশ ও জলবায়ুর তলায় বাঁচছে, ওই জলবায়ু ও আকাশের প্রভাব একই রকমে তার ওপরেও প্রযোজ্য, একই রকমে সত্য। নিম্নতর প্রাণীর মতো ক্ষুধা তৃষ্ণায় মানুষ কাতর। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির চাপ তার ওপরেও সত্য। প্রকৃতির নিয়মে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা তার অসীম এবং বংশবিস্তারের প্রক্রিয়ায় সে বাঁচার অধিকার নিম্নতর প্রাণীর মতোই কায়েম রাখতে চায়। অথচ মানুষ প্রকৃতিকে মেনেই আত্ম-আবিষ্কার করে এবং নিজের স্বকীয়তার পথে পা বাড়ায়।

মানবচরিত্রের সূত্রে মানব-সমাজ ব্যাখ্যার প্রয়াস য়ুরোপীয় সভ্যতার শুরুতেই আরম্ভ করেন সক্রাটেস। সক্রাটেসের বক্তব্যকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বিশদরূপ দেন গুরু-শিষ্য, প্লেটো ও এরিস্টটল। প্লেটোর প্রধান বক্তব্যই ছিলো মানুষের সত্য-পরিচয় সত্য-সমাজ ব্যবস্থায়। মানুষ যা আছে তা-ই পূর্ণ নয়। তাকে আদর্শের আলোয় নিজেকে গড়ে নিতে হয় অর্থাৎ তাকে হয়ে উঠতে হয়। এই বক্তব্যটি বোঝাবার জন্যে, জীবন ও পরিবেশের সম্পর্ক বোঝাবার জন্যে প্লেটো মানুষের মনকে তিনটে অংশে ভাগ করেন এবং এই ভাগ অনুযায়ী সমাজে তিন শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে নির্দেশ করেন। এই তিন শ্রেণীর লোকেরা—(ক) প্রবৃত্তিমূলক, (খ) আবেগমূলক ও (গ) যুক্তিমূলক। এই তিনটি গুণের সঙ্গে প্লেটো তিনটি সামাজিক শ্রেণীকে মেলান: (ক) শ্রমসংক্রান্ত গোষ্ঠী, (খ) সামরিক ও (গ) শাসক (দার্শনিক)। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি, প্লেটো থেকেই তাঁর ভাগটি গ্রহণ করেছেন। প্লেটোর বিভাগে বাহ্য গুণাবলীর চাইতে অন্তর্লোকের পরিচয় বেশি আর অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি জোর দিচ্ছেন বাইরের ওপর। প্লেটোর বিভাগের গুরুত্ব অনেক বেশি।

প্লেটো তাঁর বিভাগ তিনটিকে তিনটি ধাতুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই বিভাগে মানুষের চরিত্রকে বুঝবার চেষ্টা যেমন আছে তেমনি অসংখ্য ত্রুটিও আছে। অধ্যাপক কার্ল পপার (Karl Popper) তাঁর 'ওপন সোসাইটি এণ্ড ইট্‌স এনিমিজ' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে প্লেটো এই বিভাগে মানুষের চরিত্রের অখণ্ডতাকে নষ্ট করেছেন। স্বভাবতই বোঝা যাচ্ছে, যে তিন শ্রেণীর মানুষের জন্য আলাদাভাবে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে

না। মনস্তত্ত্বে জানি প্রতিটি মানুষেই তিনটি চরিত্র কমবেশি আছে। যেমন ভারতীয় সাংখ্যতত্ত্বের সত্ত্ব, রজ ও তমো গুণ। এই বিভাগে ভারতীয় সাংখ্যদর্শন এ কথাটাই বলতে চেয়েছে যে প্রতিটি মানুষেই তিনটি গুণ থাকে তবে কোনো কোনো চরিত্রে বিশিষ্ট গুণটা বেশি। তাঁকে ওই গুণের দ্বারাই চিহ্নিত করা যায়। প্লেটোর বিরুদ্ধে আরো অনেকগুলো আপত্তি ওঠে: (ক) প্রত্যেক মানুষেই তিনটি গুণ থাকায় সামাজিক বিভাগের সূত্র হিসাবে তাদের ব্যবহার করা যায় না; (খ) প্রবৃত্তিমূলক গুণটির সঙ্গে অন্যটির বিশেষত তৃতীয়টির মৌলিক কোনো বিরোধ নেই কারণ মানুষ প্রবৃত্তিরও নিয়মে চালিত হয়; (গ) আবেগমূলক বৃত্তির সঙ্গে সামরিকশ্রেণীর কোনো মৌলিক যোগসূত্র নেই; (গ) যুক্তিমূলক গুণের সঙ্গে শাসকশ্রেণীরও কোনো গভীর এবং মৌলিক সম্পর্ক নেই। কারণ, শাসকরা প্রবৃত্তির দাসও হতে পারেন। আদর্শ রাষ্ট্রের বাইরে স্বয়ং প্লেটো সাইরাকিউজে পরীক্ষামূলকভাবে আদর্শরাষ্ট্র গড়তে গিয়ে তার প্রমাণ পেয়েছিলেন।

(১) প্রত্যেক মানুষ বা প্রত্যেকশ্রেণীর মানুষই জৈবিক প্রেরণার সঙ্গে জড়িত। কারণ তাদের বাঁচতে হয়, বাঁচার জন্য বংশবৃদ্ধি করতে হয়, তাদের জৈবিক বৃদ্ধিও থাকছে। এজন্যে প্রাথমিকভাবে নিশ্চয়ই প্রবৃত্তির শাসন আছে কিন্তু সবটাই প্রবৃত্তির নয়। প্রবৃত্তির সঙ্গে অভিজ্ঞতায় অন্যান্য বোধও থাকে যেমন আনন্দ বেদনা বোধ, শীতাতপবোধ, বেদনা-বোধ ও নানা শারীরিকসম্পর্কের চেতনা। প্রত্যেক মানুষও তেমনি কিছু কিছু আবেগের পরিচয় দেয়। চাঁদ দেখে মুগ্ধ না হোক অন্তত খাবার দেখে মুগ্ধ হয়। খাবার মোহিত না করলেও জীবনে কিছু থাকেই যা তাকে আকর্ষণ করে। তেমনি সম্পূর্ণ বুদ্ধিরহিত মানুষ বলে দুনিয়াতে কিছু নেই। স্বয়ং প্লেটো জানতে পেরেছিলেন যে তিন শ্রেণীর বৃত্তি ও তিন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কোনো চীনের প্রাচীর তোলা যায় না। তুললে তাঁর আদর্শরাষ্ট্রই বিরোধে জর্জরিত হবে। আদর্শরাষ্ট্রের ভিত্তি তিনি পেয়েছিলেন সামগ্রিক ঐক্যবোধে। কিন্তু শ্রেণীতে শ্রেণীতে বৃত্তির কারণে বিরোধ দুরপনেয় হলে ওই ঐক্যটি খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন রাষ্ট্রটি তিনটি বিভাগে বিভক্ত শ্রেণীদের বিরোধী অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছু হয় না। যাদের শুধুই প্রবৃত্তি সেই নিচু শ্রেণীর লোকেরা উঁচু শ্রেণীর (আবেগ ও বুদ্ধির) সঙ্গে কোনো যোগসূত্রই খুঁজে পাবে না, এমন কি তাদের

কোনো বক্তব্যও নির্দেশ বুঝতে পারবে না। এরিস্টটল এই তত্ত্বের বিপদটি বুঝতে পেরেছিলেন এবং স্পষ্টই জানিয়ে ছিলেন তাঁর 'পলিটিক্স' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ২-৫ অধ্যায়ে।

(২) আরো বোঝা যায় না কি করে সামরিক শ্রেণী শুধুমাত্র আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়। স্বয়ং প্লেটো জানিয়েছিলেন যে যুদ্ধের কারণ অসুস্থ রুগ্ন সামাজিক অবস্থা। অথচ যারা যুদ্ধ করবে তাঁদের তিনি অসুস্থতার বদলে সুস্থ আবেগ দান করছেন। আবেগে প্রতিটি অবস্থাই আছে। ভালবাসাও যেমন তেমনি হিংসাও। যেমন যুদ্ধে আবেগের প্রকাশ তেমনি কবিতাতেও। এই আবেগের ভয়েই প্লেটো তাঁর আদর্শ-রাষ্ট্রে কবি নাট্যকারদের বাদ দিয়েছেন।

(৩) শাসক-দার্শনিকের জন্যে নিশ্চয়ই যুক্তির দরকার। একথাও মানতে আপত্তি নেই যে শাসকদের বিবেচনার সঙ্গে ক্ষমতা ব্যবহার করতে হয়। প্লেটো চেয়েছিলেন দার্শনিকরা হবেন প্রকৃত শাসক কারণ তাঁরাই একমাত্র জ্ঞানী ও বিবেচক। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা কথা খেয়াল রাখতে হয়, কার্যত সবাই একইভাবে যুক্তি বিচার প্রয়োগ করে না। কেউ যুক্তির চর্চা করে, কেউ চর্চা ছাড়াই কার্যকরী ক্ষেত্রে যুক্তির সাহায্যে কাজ করে। কেউ জ্ঞানে যুক্তি বিচারের প্রমাণ দেন, কেউ কাজে প্রমাণ দেন। এরিস্টটল প্লেটোর বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদটা তুলেছিলেন।

এরিস্টটলের মতেও তিনটি ভাগ। উদ্ভিজ্জ প্রকৃতিকে তিনি নাম দেন যুক্তিহীনতা। প্রাণী যুক্তির চাপেই চলে। তফাৎ শুধু কোনো প্রাণী প্রবৃত্তিকে চালায় যুক্তির পথে আবার কেউ যুক্তির তত্ত্বই জানতে চায় যুক্তির ব্যবহার করে।

এই আলোচনায় বোঝা যাচ্ছে, আমাদের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মানুষ ও নিম্নতর প্রাণীতে কোনো মৌলিক বিরোধ দাঁড় করান যায় না মানুষ তার স্বকীয়তার মূল্যেই প্রাণীজগতের মধ্যে স্বতন্ত্র আসন পায়। তার স্বকীয়তা, যাকে আমি বলেছি প্রাতিস্বিকতা, হলো সমাজের আদর্শের লক্ষ্যে জীবন গড়া। তারজন্যে তাকে জানতে হয় সমাজের উদ্দেশ্য এবং জেনে স্বেচ্ছায় সেই পথে চলতে হয়। উদ্দেশ্য নিয়ে নানা সংগঠন গড়া হয়, সংগঠনের বাহ্য পরিচয় আলোচনা করে সমাজতত্ত্ব। কিন্তু যখন উদ্দেশ্য আসে আলোচনায়, মানুষের জীবন শুধু

বাঁচামরাই থাকেনা তখন সমাজতত্ত্ব ক্রমশ সমাজ দর্শনের আলোচনায় রূপান্তরিত হয়। প্লেটো-এরিস্টটলে যে কারণে আলাদা কোনো সমাজতত্ত্ব নেই, ওঁরা শুধু মাত্র সম্পর্কের বাহ্য সূত্রটিকে জানতে চাননা বা হিসেব করেন না। ব্যক্তি ও সমাজকে একটা দার্শনিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে বাঁধেন। যেদিক থেকেই আলোচনা শুরু করা যাক তখন দার্শনিকতার সূত্রেই একমাত্র তাৎপর্য বুঝতে পারা যায়। ব্যক্তির লক্ষ্যে যেমন পৌছানো যায়না শুধু তার ব্যবহারিক আচরণ দিয়ে,—তার বিশ্বাস ও বোধের কথা শুনতে হয়, তেমনি সমাজকে পুরো জানা যায় না সংগঠনের বাহ্যরূপে, যেতে হয় সমাজের হৃদয়ে, মানুষের চিন্তা ও ধ্যান ধারণায়, এক কথায় যাকে আমরা বলি সংস্কৃতি। একটা উদাহরণ নিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। সমাজতত্ত্বের দিক থেকে আমরা বিবাহ-ব্যবস্থা আলোচনা করতে পারি। সামাজিক রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানগুলোর পরিচয় নিলেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের হিসেবটা স্পষ্ট হয়। আমরা বলতে পারি এই হলো পশ্চিমের বিবাহ ব্যবস্থা এবং এই হলো প্রাচ্যের বিবাহ ব্যবস্থা। সব জানা হলো কিন্তু পুরোটাই জানা হলো কি? এই বিবাহ ব্যবস্থার সূত্রেই একটি সমগ্র জাতির পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। কেনো প্রাচ্য ব্যবস্থা এমন ও প্রতীচ্য ব্যবস্থা অমন প্রশ্নটি করলেই আমরা চরিত্র বিচার বা দর্শনের সীমায় চলে আসি এবং কালক্রমে চর্চায় জানতে পারি দুটি সভ্যতার কথা।

সুতরাং স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের কারণেই মানুষ যেমন মানুষ তেমনি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার জন্যেই সমাজতত্ত্ব সমাজদর্শনে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

অনুশীলনী

1. Is society natural to man?
2. Define society and show how it has a purpose.
3. Sketch in brief the stages of social evolution.
4. What is the subject-matter of sociology? How it is necessarily developed into a social philosophy?
5. What is the importance of the concept of stages in social evolution?
6. What according to you should be the explanation of the cause of change of society?

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজদর্শনের সংজ্ঞা ও পরিধি

১। সমাজদর্শনের অর্থ (Meaning of Social Philosophy)—
(মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার সামাজিক উৎস খোঁজ করে সমাজতত্ত্ব। স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার নিজস্ব চরিত্র ও তাৎপর্যকে সমাজতত্ত্বে জানা যায় না। মানুষ সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনায় সে রহস্যের সন্ধান মেলে। সমাজ-দর্শন সামাজিক পটভূমিকায় ঐ স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার পরিচয় দেয়।)

বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক মরিস গিন্সবের্গ তাঁর রিজন এণ্ড আনরিজন ইন সোসাইটি গ্রন্থে লিখেছেন, 'একথা আরো সত্য যে সমাজবিজ্ঞান-গুলো কি পদ্ধতি নেবে তা নির্দেশ করা যেমন দর্শনের কাজ নয় তেমনি প্রকৃতি বিজ্ঞানগুলোও কোন পদ্ধতি নেবে দর্শন তা বাৎলাতে পারে না। কিন্তু দর্শন দিতে পারে, এই মুহূর্তে তা আরো বেশি অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সমাজবিজ্ঞান গুলোর ভিত্তিসূত্র ও পদ্ধতির সমালোচনা ও মূল্যায়নের জন্যে দর্শন বিচারশীল হাতিয়ারের নির্দেশ দেবে। আরো বিশেষ করে এমন মৌলিক প্রত্যয় জানাবে যা থেকে সমাজ বিজ্ঞান গুলোর সমন্বয় তৈরি হবে।' গিন্সবের্গ বোঝাতে চাচ্ছেন সমাজতত্ত্ব দর্শনের সাহায্য ছাড়া পূর্ণ হয় না। আমরা আগেই যেমন দেখিয়েছি সমাজতত্ত্ব স্বাভাবিকভাবে পরিণতি পায় সমাজ-দর্শনে। দর্শন নিশ্চয় সমাজতত্ত্বের পদ্ধতি বাৎলে দেয় না, যেমন সমাজতত্ত্ব থেকেও দর্শনের পদ্ধতি আসে না। গিন্সবের্গ সঠিক বুঝেছেন দর্শন আসলে যুক্তি বিচারের প্রক্রিয়া, মূল্য নির্ধারন তার মূল লক্ষ্য। দর্শন প্রতিটি শাস্ত্রকে নিজের নিজের পদ্ধতি ও লক্ষ্যকে বিচার করতে শেখায়। শেখায় কতটুকু প্রয়োজনে রাখতে হয় ও কতটুকু ফেলে দিতে হয়। বিচারেই একমাত্র প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিকের তফাৎটা স্পষ্ট হয়। বিচারের পথেই দর্শন প্রতিটি শাস্ত্রের সমন্বয় তৈরি করে। আপাত দৃষ্টিতেই সমাজবিজ্ঞানগুলো একটা কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের টানে চলে। লক্ষ্যটি হোলো সমাজ ও মানুষ বা মূলত মানুষেরই সমাজ। প্রতিটি শাস্ত্রের কেন্দ্রেই যেহেতু মানুষ, দর্শন শেখায় মানুষকে বুঝবার পদ্ধতি, মানুষ কি আছে কি হবে, কি তার হওয়া

উচিত এবং কেনো। প্রশ্নগুলোর জবাব মিললেই ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রগুলো তাদের পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পাবে। মানুষের চর্চায় সমাজ-বিজ্ঞান বিভিন্ন শাখায় কয়েকটি মূলতত্ত্ব নিয়ে এগোয়। তত্ত্বগুলো প্রায় স্বতঃসিদ্ধ কেননা ওগুলো ধরে নিলেই চর্চার শুরু। ওগুলো ভুলও হতে পারে সত্যও হতে পারে। সমাজবিজ্ঞানের শাখাগুলো নিজ নিজ স্বীকৃত তত্ত্ব বিষয়ে সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন তোলেনা। তাদের যাথার্থ্য বিচার করে দর্শন। বিচারে সত্য প্রমাণিত হলে মূল প্রত্যয়গুলো থাকে নয়তো দর্শনের নির্দেশ মতো নতুন প্রত্যয় তৈরি করতে হয়।

সাধারণভাবেই দর্শন বলতে বোঝা যায় কিছু দেখা। কিন্তু কি দেখা? যদি বলি দেখছি একটি মানুষ তবে তাকে জানতে আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই যথেষ্ট। বড়োজোর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মন, পঞ্চেন্দ্রিয়কে সাহায্য করে কিন্তু এই জানাটা নিতান্তই বাহ্য। দর্শনের শুরু তখনই হয় যখন আমরা প্রশ্ন তুলি যা জেনেছি তা কি যথার্থ? প্রশ্নটি মনে এলেই ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যগুলোকে বিচার করতে বসি। যদি ইন্দ্রিয়ের তথ্য সঠিক হয় তবুও মানুষটির পরিচয় মেলে না। যা জানি তা কেবল মাত্র বহিরঙ্গের। ফলে, প্রথম প্রশ্নটির সূত্র ধরে ঐ লোকটির পরিচয় নেবার কাজ সুরু হয়। দর্শন তাহলে শুধুই সাদামাটা দেখা নয়, আরো গভীরে দেখা, আরো স্পষ্ট করে দেখা। যা জানতাম বা জেনেছি তাকেই সত্য না ভেবে একটু একটু করে অজ্ঞানের পরদা সরানো। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক শঙ্করাচার্য যেমন সাতটি পর্দায় ঢাকা আলোর উদাহরণ দেন। আলো নিজেকেই নিজে প্রকাশ করে। কিন্তু ঐ সাতটি পর্দা তার প্রকাশে বাধা। পর্দার ওপর থেকে আলোর আভাস পেয়ে ভাবা যায় আলোর স্বরূপ জেনেছি। এই জানাকেই চূড়ান্ত না ভেবে একটি একটি করে পর্দা সরালে আলোর পরিচয় পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়। শেষে যখন শুধু আলোটিই থাকে তখন বুঝি যা আগে জেনেছিলুম, আলো শুধু তাই নয় আরো অন্য কিছু।

দর্শনের এই বিচার ক্রিয়া সমাজতত্ত্বের মূল প্রত্যয়গুলোকে যে বিভাগে আলোচনা করে তারই নাম সমাজদর্শন। প্রত্যেক জ্ঞানের তিনটি বিভাগ দার্শনিকেরা করেছেন। প্রথমটিকে বলি সত্তামূলক বা অস্তিত্ব-মূলক (Ontological); দ্বিতীয়টি বিচারমূলক বা তত্ত্বনির্ধারণমূলক (Criteriological); এবং তৃতীয়টি সমন্বয়মূলক বা ঐক্যমূলক (Synthetic)।

জর্মন দার্শনিক হ্বিলহেলম হেগেল দেখিয়েছিলেন চিন্তা এগোয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে। পদ্ধতির শুরু চিন্তার স্বীকৃতিতে, আছে ধরে নেওয়ায়। দ্বিতীয় ধাপের শুরু তার প্রতিবাদের পদ্ধতিতে। অর্থাৎ যা আছে তার অস্তিত্ব সত্য কিনা প্রশ্নে। দ্বিতীয় ধাপটা তাই প্রতিবাদের। সত্য জানতে হলে প্রতিবাদ করে, নেতি নেতিতে এগোতে হয়। তৃতীয় ধাপটা থাকা ও না থাকা, অস্তি ও নাস্তিকে মিলিয়ে। হেগেলের সংজ্ঞায় তিনটির নাম প্রস্তাবনা, বিরোধ ও সমন্বয় (থিসিস, এন্টিথিসিস, সিন্থেসিস্)।

(ক) **সত্তামূলক** সমাজদর্শনের প্রথম অস্তিবাচক প্রত্যয়টা হোলো মানুষ ও মানুষের সম্পর্ক। এই সূত্রেই আসে সামাজিক মানুষের মৌলিক তত্ত্বগুলো যেমন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে শ্রেয় ও প্রেয়র আদর্শ, কর্মবাদ ও সমাজে জীব ও শিবের সম্পর্ক। ভারতীয় জীবনের যে-কটি আদর্শকে প্রাচীন ঋষিরা সমস্ত কর্মের উৎস ও জীবনের লক্ষ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারই আলোচনা। জীবনে চতুর্বর্গ কেমন করে চতুরাশ্রমের মধ্যে পেতে হয়, কেমন করে ধর্মের অনুশাসনে সমস্ত কর্মকে পরিচালিত করে নিজেকে জীবনের মূল সত্যলাভের প্রেরণায় বাঁধতে হয় তারই পথ নির্দেশ ছিলো ভারতীয় মূল প্রত্যয়গুলিতে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সমাজ-দর্শনের কাজ হোলো এগুলোর তাৎপর্য আবিষ্কার করা। একই রকমে বর্তমান য়ুরোপের পেছনে তিনটি দার্শনিক ধারা কাজ করে, গ্রীকদর্শন, ষ্টোয়া মতবাদের বিশ্ব জাগতিক তত্ত্ব ও খৃষ্টতত্ত্বের বক্তব্য। য়ুরোপের সমাজদর্শনে তাই যে-মানুষ সমস্ত আলোচনায় কেন্দ্র সমাজদর্শনকে তা বুঝতে হয় ঐ তিনটি মূল ধারার আলোকে। অর্থাৎ সমস্ত সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র মানুষ ও মানবিক সম্পর্ককে সমাজদর্শন খোঁজে সমাজ ও বিশ্বজাগতিক তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে। এটাই সমাজদর্শনের তত্ত্বমূলক আলোচনার আদি ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

(খ) **বিচারমূলক**—সমাজদর্শনে বিচারমূলক কাজ হোলো সমাজ-বিজ্ঞানগুলোর প্রতিজ্ঞা সত্য ও পদ্ধতিকে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করা ও বিচার করা। প্রতিজ্ঞাগুলো সত্যই যথার্থ কিনা, বিভিন্ন শাখার পদ্ধতি মারফৎ সত্যে পৌছোনো যায় কিনা সেটাই আলোচ্য। যদি প্রতিজ্ঞা ও সত্যে, পদ্ধতি ও বাস্তবে বিরোধ থাকে সমাজদর্শন ভুল ত্রুটি সংশোধন করে আলোচনায় যাথার্থ্য দেয়।

(গ) **সমন্বয়াত্মক**—সমন্বয়াত্মক কাজের প্রয়োজন এ কারণেই যে সমাজবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার লক্ষ্য যদিও মানুষ ও তার নানাবিধ সম্পর্ক, পদ্ধতির পার্থক্যে আলোচনার ধারা ও ফলাফল সাধারণ দৃষ্টিতে পৃথক হতে বাধ্য। কিন্তু পার্থক্যের মধ্যেই মানুষকে কেন্দ্র করে ঐক্যসূত্রে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। বিজ্ঞানের পদ্ধতি যেহেতু সমগ্রকে টুকরো করে দেখা, অংশকে বিশ্লিষ্ট করে তার নিজস্ব স্বরূপ আবিষ্কার করা, সমাজ বিজ্ঞানও বিজ্ঞান হিসেবে যথারীতি আংশিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন শাখায় নিশ্চয়ই মানুষকে টুকরো টুকরো করে সমাজকে অংশে অংশে চিরে পরীক্ষা করা যায় এবং বাঞ্ছিত ফল লাভও ঘটে। কিন্তু তার দ্বারা সমগ্র মানুষটির তাৎপর্য ও ঐক্য জানা যায় না। যেমন একটি মানুষের দেহকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভাগ করে প্রতিটি অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গের পৃথক আলোচনা সম্ভব এবং তাতেই কিছুটা পরিমাণ জ্ঞানলাভ সম্ভব। কিন্তু কেউ যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জ্ঞানকেই পূর্ণ মানুষটির পরিচয় মনে করে তবে সত্য লাভ হয় না। সমগ্রের সত্য নিশ্চয় অংশে প্রতিফলিত কিন্তু অংশ জুড়ে জীবনের ক্ষেত্রে পূর্ণের পরিচয় পাওয়া যায় না। একমাত্র যন্ত্রের ক্ষেত্রেই তা সম্ভব। যেহেতু যন্ত্রের অংশ থেকে পৃথক কোনো সত্তা নেই। মানুষটির পরিচয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দান আছে। কিন্তু শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি জুড়ে দিলেই প্রাণবান মানুষটির পরিচয় মেলে না। প্রাণ অংশকে ছাপিয়েই বাড়তি আর এক তত্ত্ব, যার স্বকীয় উদ্দেশ্য আছে, নিয়ম শৃঙ্খলা আছে, লক্ষ্য আছে। অংশগুলো প্রাণের নিয়মেই সত্য হয়, নিজে পৃথক সত্তায় কখনোই প্রকৃত সত্য নয়। সমাজদর্শন তাই সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বক্তব্যকে তুলনামূলক বিচারে সংগতি দেয়, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে প্রকাশ করে, বিচ্ছিন্ন আলোচনার মধ্যে নিহিত সমগ্র মানুষটির জীবন ঐক্যকে অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত করে।

আমরা আগেই মানবজীবন ও সমাজের উদ্দেশ্যের কথা বলেছি। এই উদ্দেশ্য সমাজের ঐক্যেই মানুষের জীবনের শ্রেয়বোধের কথা। শ্রেয় হোলো মঙ্গল। আশু এবং সাময়িক কোন সার্থকতায় শ্রেয়কে জানা যায় না। শ্রেয় জীবনের মৌলিক লক্ষ্য ও নির্দেশ। আসলে শ্রেয় জানায় মানুষ যা হবে, যা তার হওয়া উচিত। সমাজে মানুষ নানা কর্মের সঙ্গে জড়িত। এই কর্মের সাধারণ লক্ষ্যটা হোলো শ্রেয়কে লাভ করা। কার্যত যদিও জীবনে শ্রেয় ও প্রেয়র মধ্যে অনেক তফাৎ ও

দ্বন্দ্ব তবু মূলত কোনো বিরোধ নেই। প্রেয় কর্মেই শ্রেয়কে খুঁজতে হয় বা শ্রেয়বোধের আলোকে ও নীতিতে দৈনন্দিনের প্রেয়কে পরিচালিত করতে হয়। বুঝতে হয়, যা আছে ও যা হওয়া উচিত তার মধ্যে কোনো চীনের প্রাচীর নেই। যা আমরা আছি তার তাৎপর্যই বোঝা যাবে না যদি-না যা হতে চাই তা জানা থাকে। সমাজে, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, সংস্কৃতির প্রবহমান ধারায় প্রতিটি লোকের মনেই কমবেশি এই দুটো ধারণা কাজ করে। কোনো লোকটিই শুরু থেকে সচেতনভাবে শুধু শ্রেয়কেই খোঁজে না, কোন লোকটিই শুধু শ্রেয়র দ্বারা চালিত হয় না। এই দুটোর টানাপোড়েনে তাদের জীবনযাত্রার পরিকল্পনা ও কার্যকরী ধারাটি তৈরি হয়। সাময়িক প্রয়োজনে যেমন কেউ মিথ্যে কথা বলে, প্রতারণা করে বা সত্যিসত্যিই কখনো ভাবে পৃথিবীতে নীতি প্রতিষ্ঠা করবার যখন কেউ নেই তখন সে নিরঙ্কুশভাবে অপরাধ করে যেতে পারে কিন্তু তার মনের তলাতেও ন্যায়-অন্যায়ের বোধ কাজ করে। সামাজিক সম্পর্কের জালটিও লুকিয়ে থাকে। এজন্যে বহুক্ষেত্রে ব্যক্তির জীবনে নিজস্ব জগত ও সাধারণের জগতে যথেষ্ট ফারাক থাকে। নিজেকে কেউই ঠকাতে চায় না, যতই কেনো-না সে অন্যদের ঠকায়। চোরা-কারবারীও নিজের সন্তানকে চোরাকারবারের অনৈতিক প্রতিযোগিতায় হারাতে চায় না। অথচ অন্য সবার ক্ষেত্রে তার এই মমতা কাজ করে না। সুতরাং দুটো কর্মের তফাৎ। প্রথম ক্ষেত্রে, নিজ সন্তানের ক্ষেত্রে তার ভীরুতা বা মমতা তৈরি হয়েছে শুধু জৈব রক্তের সম্পর্কের জন্যেই নয়, মনের কোণায় সামাজিক শ্রেয়বোধের চাপে। শ্রেয়বোধ পরিবার থেকে পরিবারের গ্রন্থিতে, সংস্কৃতির বিমূর্ত প্রবাহে তার মনেও ছাপ রেখে গেছে। আর অন্যদের ক্ষেত্রে তার হিসেবটাই সত্য, আশু ফল পাবার বাসনা—নিছক প্রেয় বা অভীপ্সিত লাভালাভের ব্যাপার। সমাজ-দর্শন আমাদের এই শ্রেয় আদর্শের ধারণা দেয়। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে সমাজ-দর্শনের কাজ সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি মূল্যবোধ (values) নিয়ে। মূল্যবোধের ওপরেই সমাজ প্রতিষ্ঠিত,—তা না-মানলে সমাজ থাকে না, ফলে ব্যক্তিও শূন্যে হারায়। এমন কি চূড়ান্ত স্বার্থপরতায় মানুষের চরিত্রকে ডুবিয়েও টমাস হবস্ ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন যে সিভিল-সোসাইটির জন্যে, শক্তির ভয়েই হোক আর অরাজকতার ভয়েই হোক, সমাজ-বন্ধনের কথা থাকে। হবস জানতেন সমাজ-বন্ধন বাইরের

ঘটনা নয় যে আমদানি করা যাবে। এটা সম্পূর্ণই মানসিক অর্থাৎ পারস্পরিক সম্মতির। হব্‌সে সম্মতি বা সমাজ-বন্ধনের প্রকাশ চুক্তিতে। য়ুরোপে উপযোগিতাবাদীরা (utilitarians) মানুষকে শুধুমাত্র উপযোগিতা-বোধের পিণ্ড মনে করেও মানতে বাধ্য হয়েছিলেন যে সবারই জন্যে সমাজ দরকার। সমাজদর্শন কাজেই সামাজিক শ্রেয় ও প্রেয়র আলোচনা করে।

অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি লিখেছেন "বিশেষতঃ সমাজদর্শন মানুষের সামাজিক ঐক্যের ওপর জোর দেয় এবং এই ঐক্যের সূত্রে মানবজীবনের বিশেষ দিকগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে চায়। তাই এর আলোচ্য হলো সমস্ত মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও আদর্শের পর্যালোচনা করা। শুধু যা আছে তা নয়, বা যা ছিলো বা এমন কি যা হতে পারে তা-ও নয়, তাদের অস্তিত্বের ধরণের মূল্য ও তাৎপর্যের বিচার" (আউটলাইনস্‌ অফ সোস্যাল ফিলজফি, পৃষ্ঠা ১৪)। আমরা তাকেই বলেছি 'উচিত' যা ব্যক্তি ও সমাজের মৌলিক বিশ্বাসের সূত্রেই তৈরি হয়। ব্যক্তি যেমন হতে চায় ও হওয়া উচিত, একই সঙ্গে এই ব্যক্তিদের নিয়ে সমাজ যেমন আছে ও হওয়া উচিত। অধ্যাপক গিন্সবের্গ সমাজচিন্তার ও সমাজ-দর্শনের পার্থক্য করে জানিয়েছিলেন সমাজদর্শনের দুটো অংশ। একটি বিচার ও অন্যটি সমন্বয়। বিচার সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব, পদ্ধতি ও সমাধান বিষয়ে। সমন্বয়, বিভিন্ন আলোচনার আপাত-বিরোধী ধারার চিন্তা ও লক্ষ্যের মধ্যে।

সামাজিক মানুষের জীবনযাত্রার বিষয়ে সমাজদর্শন চিন্তিত বলেই বোঝা যায় নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে তার যোগ ঘনিষ্ঠ। নীতিশাস্ত্রের নির্দেশে ঘটনাবলীর লক্ষ্য বিষয়ে রায় দেওয়া হয়। অথচ বৈজ্ঞানিক আলোচনায় নীতির স্থান নেই। বিজ্ঞান তথ্যের আলোচনা করে, তথ্যের উচিত-অনুচিত বিষয়ে নয়। যা আছে তাই বিজ্ঞানের আলোচ্য। বিজ্ঞানে তাই সংখ্যা ও পরিমাণের কথাই প্রধান, গুণের পরিমাপ নেই। গুণের আলোচনার ক্ষেত্রেও হিসেবটাই প্রধান। সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞানের ধারায় নীতিশাস্ত্র থেকে দূরে থাকতে চায়। উচিতের কথা না-বলে যা আছে সেই সব তথ্য বিষয়েই মাথা ঘামায়। সংখ্যা-পরিমাণের হিসেব করে সমাজ-সংগঠন ইত্যাদিকে বোঝার চেষ্টা করে। অথচ সমাজের আলোচনায় নীতির ব্যবহার বাদ দেওয়া যায় না। সমাজের পেছনে সচেতন

মানুষের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কাজ করে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে পরিমাণের মানে জানা যায় না, গুণের কথাতেই বুঝতে হয়। মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, বেদনা—সবই সামাজিক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। আমাদের আগেকার উদাহরণ বিবাহ-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে যেমন দেখেছি সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞানের ধারায় শুধু পদ্ধতি আলোচনা করে রায় দিতে পারে। সমাজতত্ত্বের সে সংবাদ নিশ্চয়ই সত্য। কিন্তু পুরো সত্য নয়। যেহেতু ওই বিবাহ-ব্যবস্থার মধ্যে একটি জাতির মানসিক পরিচয় লুকিয়ে থাকে, তার পরিচয় শুধু বহিরঙ্গের তথ্যসংগ্রহে প্রকাশ হয় না। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল সেইজন্যে বলেন সমাজদর্শন মূল্যবোধের একটি ক্রমবিবর্তিত ছক তৈরি করবে আর সমাজবিজ্ঞানগুলো তাদের তথ্যকে ছকের সঙ্গে মিলিয়ে নেবে। ("...social philosophy, should first lay down its specification in accordance with a hierarchy of values completely thought out and validated. Then the various social sciences should proceed to discover how these values may best be realised.")

৪। সমাজদর্শনের পরিধি (Scope of Social Philosophy)

আমাদের সংজ্ঞার সূত্রে বোঝা যাচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা সমাজদর্শনের বিচার মেনে নেয়। সমাজদর্শনের পরিধি সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্রের সঙ্গে পৃথক হলেও মানুষকে কেন্দ্র করে বিচারক্রিয়ায় সব তথ্যকে গ্রহণ করে। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি অবশ্য বলেন "সমাজ-দর্শনের আলোচনাক্ষেত্র অনেক সীমাবদ্ধ।" এক অর্থে অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির কথা সত্য। সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলো নিজ নিজ ক্ষেত্রে মানুষ ও তার আচার-ব্যবহার, রীতি নীতি ও সংগঠন বিষয় তথ্য সংগ্রহ করে, তথ্য বিশ্লেষণ ও তথ্যের শ্রেণীবিভাগ করে। নির্দিষ্ট এই আলোচনায় সমাজদর্শনের কোন স্থান নেই। সুতরাং সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে সমাজদর্শনের ক্ষেত্র বড়ো। কিন্তু যে মুহূর্তে ঐ সব তথ্যের মূল্য নির্ধারণের প্রশ্ন ওঠে সমাজদর্শনও সমাজবিজ্ঞানের তথ্যা-বলীকে নিজের আলোচনায় গ্রহণ করে। এই আলোচনার পরিসরে সমাজদর্শনের ব্যাপ্তি প্রমাণিত হয়।

সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়কে ভাগ করে দেখা যায়। (ক) মানুষের সামাজিক প্রকৃতির তাৎপর্য বিচার। মানুষই সমাজ গড়ে

কিন্তু সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও লক্ষ্য থাকে। ইতিহাসে দেখা গেছে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কে নানাধরণের গোলোযোগ উঠছে। কখনো সমাজকে মূল্য দেওয়া হয়েছে বেশি কখনো ব্যক্তিকে। সমাজকল্যাণের আদর্শ বিচারে জট পাকিয়েছে। সমাজদর্শন এই সমস্যার আলোচনা করে।

(খ) সামাজিক সম্পর্কের প্রকাশ যে-সব সংগঠনের মধ্যে হয় সমাজ-দর্শন তার মূল্য বিচার করে। দেখে সংগঠনগুলো যথার্থই সম্পর্কের পরিচায়ক কিনা। তাদের বিরোধ ঘটলে সমাজদর্শন বিরোধের কার্য-কারণ নতুন মীমাংসার নির্দেশ দেয়। এজন্য পরিবার, সম্প্রদায়, রাষ্ট্র ইত্যাদি তার আলোচনার বিষয়।

(গ) শুধু প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্কই নয় তাদের মূল্য বিচার করবার সামগ্রিক আদর্শটি সমাজদর্শন জানায়। আদর্শ ও বাস্তবের সম্পর্ক নির্দেশ করে, শ্রেয় ও প্রেয় বিষয়ে কল্পনা তৈরি করে দেয়। বিরোধ বিচার করার মানদণ্ড থাকে শ্রেয় ও প্রেয়র আদর্শে। বিচারে মানদণ্ড তারই সূত্রে তৈরি হয়। সমাজদর্শনে ব্যবহৃত প্রগতি, উন্নতি, সহযোগিতা, আদান, প্রদান, ভূমিকা, অবস্থান, ক্ষেত্র ইত্যাদি প্রত্যয়গুলো এইভাবে গড়ে। এইগুলোও সমাজদর্শনের আলোচ্য।

(ঘ) সমাজদর্শন পৃথকভাবে ধর্মের আলোচনা করে। ধর্মই মানুষকে, জীবনের সত্যকে ধারণ করতে শেখায়। মানুষের জীবনের লক্ষ্য ধর্মের পরিমণ্ডলেই ঘেরা থাকে। শ্রেয়র আদর্শ ধর্মই তৈরি করে, ধর্মের ভিত্তিতেই সংস্কৃতির ঐশ্বর্য। স্বভাবতই মানুষের জীবনের কেন্দ্র ধর্ম সমাজদর্শনের প্রধান একটি আলোচ্য।

(ঙ) জীবদেহ হিসেবে বাঁচা-মরার শারীরিক প্রক্রিয়া মানুষের পক্ষে নিতান্তই প্রাকৃতিক। জন্মালেই যেমন মরতে হয় দেহধারণের সঙ্গে তেমনি ব্যাধির যোগ। সমাজদর্শন দৈহিক ব্যাধির আলোচনা করে না বটে তাকে আধির (মানসিক অসুস্থতা)-র খোঁজ রাখতে হয়। প্রশ্নটা তখন থাকে কেনো এই রোগ, কেমন করে তাকে সুস্থ করে তোলা যাবে। ভারতবর্ষে যেমন বলা হয় "শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্মসাধনম্" (শরীর রক্ষা করেই ধর্ম)। সমাজের ক্ষেত্রে তেমনি সমাজদেহটি সুস্থ রেখেই সমাজ-কল্যাণ। সমাজদর্শনে তাই অপরাধ ও শাস্তির আলোচনা অন্তর্ভুক্ত।

(চ) সমাজদর্শন মানুষের মন বিষয়ে সরাসরি আলোচনা না করলেও অনেকাংশেই মনোবিজ্ঞান সমাজদর্শনের কাছে এসে গেছে। মানুষের মনের সঙ্গে তার উদ্দেশ্য ও কল্পনা জড়িয়ে থাকে বলেই সমাজদর্শনও থাকে। বর্তমানে সামাজিক মনস্তত্ত্ব নামে একটি নতুন শাখার চর্চা হচ্ছে যা সমাজদর্শনের কাছে ঋণী।

(ছ) নীতিশাস্ত্রও সমাজদর্শনের কাছ থেকে সামাজিক মানুষের পরিচয় নেয় ও তাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের লক্ষ্যকে জানে। কার্যত মূল্যের ক্ষেত্রে এই দুই শাস্ত্রের তফাৎ প্রায় নেই।

অনুশীলনী

1. Define social philosophy. Explain the statement "Social philosophy is the meeting-point of Sociology"—Discuss

2. Show "Social philosophy interprets social facts while sociology only collects them."

3. Discuss why social philosophy is value-oriented.

4. Define Social philosophy and indicate its scope.

5. "Man is the centre of social philosophy"—Discuss.

6. Elucidate the statement, "social philosophy studies man in his sociality."

7. Elucidate and explain, "social philosophy begins where sociology ends."

8. Do you accept the statement "social philosophy inevitably leads to sociology and sociology gets its fulfilment in social philosophy ?"

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজদর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রের সম্পর্ক

১। সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞান (Social Philosophy and Social Science)

সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক দুটি গুরুত্বপূর্ণ-শব্দের সঙ্গে জড়িত। একটি 'দর্শন' ও একটি 'বিজ্ঞান'। সাধারণভাবে আমাদের চিন্তায় দর্শন ও বিজ্ঞানের বিরোধ গভীর। বিজ্ঞান, বিশেষ জ্ঞান অর্থে, প্রকৃতির সামগ্রিক পরিচয় গ্রহণ করে না। বিভিন্ন শাখায় ভাগ করে, নিজস্ব নিয়মের সূত্রে, প্রকৃতিকে টুকরো টুকরো করে দেখে। মৌল নিয়মের রাজত্ব আবিষ্কার করে প্রতিটি শাখার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে। যেমন পদার্থবিদ্যা ও তার নিজস্ব নিয়ম, রসায়নবিদ্যা ও তার নিজস্ব নিয়ম, জীববিদ্যা ও তার নিজস্ব নিয়ম। এই বিভাগ ও বিভাগের আলোচনা থেকে সাধারণভাবে একটা ধারণা প্রচলিত হয়েছে যে ভেঙে ভেঙে দেখা, টুকরো টুকরো করে দেখাই বুঝি বিজ্ঞান। দার্শনিক কলিংউড এই পদ্ধতিকে 'বিজ্ঞান' বলতে চাননি। বিদ্রূপ করে তিনি জানান যে নিজেদের অজ্ঞতার কারণে আমরা কেমন বিজ্ঞানের চরিত্রকে সীমাবদ্ধ করে ভেবেছি। আসলে ওঁর মতে বিজ্ঞান হলো যে-কোনো শৃঙ্খলাবদ্ধ অন্তঃসঙ্গতিপূর্ণ ধারণা। যুক্তির নিয়মে চালিত লক্ষ্যবদ্ধ জ্ঞানকেই তিনি বিজ্ঞান বলেন। বিজ্ঞানকে এমন ব্যাপক অর্থে ধরলে দর্শনও বিজ্ঞান কারণ দর্শন স্বভাবতই যুক্তি-পরম্পরায় গাঁথা তত্ত্বালোচনা। সীমাবদ্ধ অর্থে কিন্তু দর্শন বিজ্ঞান নয় যেহেতু দর্শন প্রকৃতিকে হাতে-কলমে, প্রমাণ-নজীরে, কার্য-কারণের সূত্রে দেখে না।

সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন সমাজকে ঘিরে বিজ্ঞান তেমনি সমাজ দর্শন সমাজকে কেন্দ্র করে। উভয়তই 'সমাজ' কথাটি সত্য। সমাজই উভয়ের প্রধান আলোচ্য। কিন্তু সমাজের প্রসঙ্গে দুটি ভিন্ন নামীয় শাস্ত্রের কথা ওঠায় বোঝা যাচ্ছে ওদের আলোচনার ক্ষেত্র এক এবং সদৃশ হলেও নিশ্চয়ই পদ্ধতি ও লক্ষ্যে বিরোধ আছে। বিজ্ঞান নিশ্চয়ই দর্শনের সীমায় পা বাড়ায় না ও দর্শন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্যায় প্রবেশ করে না।

অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি মনে করেন 'সমাজদর্শন সামাজিক ঐক্যের ওপর দৃষ্টি দেয়। এই ঐক্যের আলোয় মনুষ্যজীবনের বিভিন্ন দিকগুলোর আলোচনা করে।' এই বাক্যটিতে অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি জানতে চাচ্ছেন যে দর্শনের মূল লক্ষ্য ঐক্য স্থাপন করা, যেমন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন আলোচ্যকে দর্শন সামগ্রিক ঐক্যে বাঁধতে চায়। এই বক্তব্যের মূল কথাটি মানতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই কিন্তু এই সংজ্ঞায় সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক ক্ষেত্র বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা হয় না।

বিজ্ঞান বলতে আমরা আরো জানি যে বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-নির্ভর। তথ্যকে অভিজ্ঞতায় জেনে বিজ্ঞানও নিজস্ব সীমায় ঐক্যরূপ দিতে চায়। এবং ঐক্যসূত্রের নিয়মেই ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, সদৃশ ঘটনা ও অবস্থায় সর্বত্র, স্থান-কাল পাত্র নির্বিশেষে, একই ফল পাওয়া যাবে। সমাজের আলোচনা বিজ্ঞান হয়ে উঠলে পণ্ডিতরা নিশ্চয়ই বিভিন্ন বিষয়ে আগে থেকেই সম্ভাব্য ফলাফলের কথা ঘোষণা করবেন। সুতরাং অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির 'ঐক্যসূত্র'টি আলোচ্য দুটি শাস্ত্রের বক্তব্যকে তফাৎ করে বুঝতে শেখায় না।

সমাজবিজ্ঞানের লক্ষ্য বিষয়ে পৃথিবীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের আলোচনা থেকে আমরা নির্দেশ পেতে পারি। ইংরেজ অধ্যাপক হব্‌হাউস জানিয়েছেন সমাজতত্ত্ব হলো মানবিক প্রগতির বিজ্ঞান। ওঁর মতে 'To form by a philosophic analysis a just conception of human progress, to trace this progress to its manifold complexity in the course of history, to test its reality by careful classification and searching comparisons, to ascertain its conditions, and if possible to forecast the future—this is the comprehensive problem towards which all sociological science converges and on the solution of which reasoned sociological effort must finally depend. তাহলে অধ্যাপক হব্‌হাউসের বক্তব্য থেকে আমরা পাচ্ছি (ক) সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর পদ্ধতি হবে দার্শনিক বিশ্লেষণ; (খ) দার্শনিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন মৌলিক। কারণ সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য সমাজ-প্রগতির সঠিক বোধ। অধ্যাপক হবহাউস সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলেই তাকে দর্শনের ওপর নির্ভরশীল করে দিলেন। যদিও বিজ্ঞানের কর্তব্য তিনি ভোলেন নি। তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের বিচার ও শ্রেণীবিভাগ,

এমনকি আমাদের ভবিষ্যত বিষয়ক ঘোষণার কথাও উল্লেখ করেছেন। মোটামুটিভাবে প্রচলিত বিজ্ঞান ও দর্শনের বিভাগটি তিনি প্রায় তুলে দিয়েছেন। সমাজবিজ্ঞান একাধারে যেমন তথ্য বিচার করবে অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যে, তেমনি সমাজ-প্রগতির লক্ষ্য স্থির রেখে দর্শনের মতো বিশ্লেষণে মৌলিক সত্যের খোঁজ করবে। অর্থাৎ শুধুই তথ্যের ওপর নির্ভর করলে চলে না, সমাজবিজ্ঞানকে বিচার-বিশ্লেষণের লক্ষ্য রাখতে হয়। এবং বিচারের মানদণ্ড প্রস্তুত করতে হয়। অধ্যাপক হব্‌হাউসের আলোচনায় এই দুই শাস্ত্রের তফাৎ অনেকটা মুছে যাচ্ছে। এমনকি মূল্য-বিচারের প্রসঙ্গও অর্থহীন যেহেতু তিনি সমাজবিজ্ঞানের লক্ষ্য সমাজ-প্রগতি স্থির করে দিয়েছন আলোচনার সূত্রপাতেই।

ওঁর বক্তব্যের বিপক্ষে মতামত পাই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফরাসী পণ্ডিত অগাস্তে কোঁতের আলোচনায়। তিনি বলেন সমাজবিজ্ঞানের নিজস্ব নিয়ম আছে এবং সমাজ একটি স্বাধীন ও পৃথক সত্তা। কোঁতের প্রভাবে আর একজন পণ্ডিত ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ দুর্খাইম ঘোষণা করেন, সমাজবিজ্ঞান কার্যত একটি পরীক্ষার পদ্ধতি মাত্র। সমাজবিজ্ঞান সমাজের স্থিতিশীল গড়নটি বিষয়ে চিন্তিত হয়। পূর্ব-নির্ধারিত কোনো লক্ষ্য বা মূল্য তার আলোচ্য নয়। যা-কিছু তত্ত্ব ও সংগঠন আমরা পাচ্ছি তা সমাজেরই সৃষ্টি। সমাজকে ব্যক্তিদের থেকে তফাৎ করে সমাজ-বিজ্ঞানকে আলোচনা করতে হয়। সমাজের স্বকীয় সত্তা আছে এবং এই সত্তার চাপেই ব্যক্তি ও সংগঠনের রূপ নির্ধারিত হয়। দুর্খাইমের ব্যাখ্যায় সমাজবিজ্ঞান হব্‌হাউসের বক্তব্য থেকে সরে এসে প্রচলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় যেখানে সংগঠন (Structure) ও সংগঠনের নিয়মাবলীই একমাত্র আলোচ্য। বাইরে থেকে কোনো তত্ত্ব, সূত্র বা মূল্য জোগাড় করার প্রয়োজন নেই। দুর্খাইমের সমর্থন পাওয়া যায় বিখ্যাত ইতালীর পণ্ডিত ভিলফ্রেড প্যারেটোর লেখায়। প্যারেটো সমাজকে দেখেন যন্ত্রবিদ্যার নজীরে। যন্ত্রবিদ্যায় যেমন প্রতিটি অংশের সংযোজনে পূর্ণ যন্ত্রটি তৈরি হয় এবং অংশগুলোর পৃথক অস্তিত্ব সত্ত্বেও তারা যন্ত্রটির পরিচালনায় কোনো বাধা সৃষ্টি করে না তেমনি সমাজের ব্যক্তিরা যন্ত্রের অংশের মতো সমাজ-যন্ত্রটিকে গড়েছে। তাদের পৃথক অস্তিত্ব আছে কিন্তু যন্ত্রের গড়ন ও নিয়মটাই আসল। সমাজ-বিজ্ঞানের কাজ এই সমাজ-যন্ত্রটির পরিচয় গ্রহণ করা।

হব্‌হাউসের সমর্থন পাওয়া যায় জর্মন পণ্ডিত ম্যাক্স হেবারের বক্তব্যে। তিনিও মনে করেন সমাজবিজ্ঞানের কাজ যুক্তিপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক কর্ম। যে-মুহূর্তে তিনি উদ্দেশমূলক কর্ম বলেছেন তখন থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে সমাজবিজ্ঞান কেবলমাত্র সমাজের গড়ন ও সংগঠন বিষয়ে ব্যস্ত থাকলে মানুষের কর্ম ও জীবনের পরিচয় পাবে না। অবশ্য হেবার মূল্য-বিচারকে বাদ দেন। কারণ মূল্যের পরিমাণ ও সংখ্যানুপাত পাওয়া মুশকিল। তবু জীবনের উদ্দেশ্যমূলক কর্মেই নীতি ও মূল্যের কথা লুকানো থাকে। হেবার মূল্যের কথাটা এভাবে জানান যে সমাজ-বিজ্ঞানী নিশ্চয়ই একটি সংগঠনের গড়ন ও তার কর্মের পরিচয় গ্রহণ করবে। গড়নটি রক্ষা করবার জন্য নির্দিষ্ট কর্মের প্রয়োজন এ-কথাও তিনি মানেন। কিন্তু কর্মের যাথার্থ্য ও গুরুত্ব বিচারের ভার সমাজ-বিজ্ঞানের হাতে নয়। কারণ ওঁর মতে বিজ্ঞান উদ্দেশ্যমূলক নয়। হেবারের সমর্থন আবার পাই জর্মন পণ্ডিত সম্বর্টের আলোচনায়। মূল্যের চর্চা বিষয়ে হেবারের যতোটুকু সংশয় আছে সম্বর্টের তা নেই। তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেন "We cannot call it anything less than unpardonable intellectual provincialism when we are time and again enjoined to apply the principles of mechanics or some other natural science to the phenomena of culture. Such naive folk seem to have the delusion that the methods of the natural science alone enable us to arrive at 'true' knowledge. As a matter of fact, the situation is precisely the reverse; we have 'true' knowledge in so far as we understand; i.e. our knowledge is limited to the sphere of culture and fails us in the realm of nature." সুতরাং সমাজবিজ্ঞানে যন্ত্রবিদ্যা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি ব্যবহার করতে চাচ্ছেন না সম্বর্ট। সরাসরি তিনি জানাচ্ছেন যে সাধারণদের ধারণা মতো বিজ্ঞান মোটেই 'সত্য' জ্ঞান দেয় না। আমাদের 'বোধে'র ওপরেই জ্ঞান নির্ভর করে। সম্বর্ট সমাজবিজ্ঞানকে 'সংস্কৃতিমূলক বিজ্ঞান' বলেন এবং জানান যে 'সংস্কৃতিমূলক বিজ্ঞানের' চর্চার বিষয় হলো এই 'বোধ' ('understanding')। সমস্ত জ্ঞান এই বোধে ভেতর থেকে বাইরে আসে। কিন্তু, সম্বর্ট বলেন, 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলো, অন্যপক্ষে, সুধুমাত্র 'ব্যাখ্যা' করতে পারে, অর্থাৎ বাইরে

থেকে ভেতর বিষয়ে অনুমান করবে'। তিনি স্পষ্টতই বোঝাতে চাচ্ছেন যে সমাজবিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুসরণ করে না কারণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বাইরের সাদৃশ্যে কখনোই ভেতরের খবর পায় না। তাই 'All truly scientific sociology strives to become 'understanding sociology'. বিশ্ববিখ্যাত জর্মন দার্শনিক ডিলথির প্রভাবে সম্বর্ট ও হেববার সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞান মনে করলেও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বোঝেন না এবং আলোচনায় বিজ্ঞান ও দর্শনের ফারাকটা প্রায় সম্পূর্ণই অস্বীকার করেন সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে। ওঁদের এই 'বোধ' তত্ত্বেই সমাজবিজ্ঞান ও সমাজদর্শন এসে মেশে। ব্যাপারটাকে স্পষ্ট করবার জন্যে সম্বর্ট একটি উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। দাবা খেলা হচ্ছে। দু-পক্ষের অনেক ঘুঁটি ও অনেক চাল। এক-এক ঘুঁটির চালের বাঁধা নিয়ম। প্রত্যেকেই সে-নিয়ম মেনে অন্য আরো একটা বড়ো নিয়মের দিকে যাচ্ছে। পক্ষ-প্রতিপক্ষ নিজেদের মাথায় যে-নিয়মটি রেখে সমস্ত ঘুঁটিগুলোকে চালাতে চাচ্ছে। সম্বর্ট তাই বলেন, খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত কৌশল ও চাল এ খেলাটির নিজস্ব নিয়ম ও লক্ষ্য তখনই জানা যায় যখন বুঝি প্রতিটি খেলোয়াড় কী চাচ্ছে। কার্যত সম্বর্ট এই উদাহরণে সমাজদর্শনের মতো সমাজবিজ্ঞানকেও উদ্দেশ্য-চালিত বলতে চাচ্ছেন।

দুর্খাইমের মতো জর্মন পণ্ডিত হ্বিজে সমাজকে বুঝতে চান সম্পর্কের বহিরঙ্গতায়। তিনি একটি বিভাগ করেছেন,

1. Sociology, as the science of interhuman relations as such, has two main divisions ;

A. The systematics of social relations.

B. The systematics of social structures.

ওঁর মতে সমাজতত্ত্ব বা সমাজবিজ্ঞান, প্রকৃত বিজ্ঞানের মতোই, শুধুমাত্র মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ককে দেখবে। বিজ্ঞান বস্তুর বাহ্য সম্পর্কের আলোচনা করে, সত্তার কথা বলে না। সমাজতত্ত্ব সম্পর্ক ও সম্পর্ক অনুযায়ী সংগঠনের খোঁজ করবে। আসলে সমাজবিদ্যার চর্চা সম্পর্ক ও সংগঠন।

(ক) সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের বিরোধ এমন গভীর নয় যে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে কোনো সংযোগ নেই। 'বিজ্ঞান' বাদীদের তত্ত্ব অনুযায়ী নিশ্চয়ই বলতে পারি সমাজ-সম্পর্কের চরিত্র ও সংগঠন সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য। যতক্ষণ সমাজবিদ্যা শুধুমাত্র বিভিন্ন সমাজ-

প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও বিকাশ, তাদের গড়নের চরিত্র ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ততোক্ষণ সে বিজ্ঞান। কিন্তু সমাজ মানুষকে কেন্দ্র করে এবং মানুষকে জানা যায় না শুধুমাত্র তার বাহ্য ক্রিয়াকর্মে ও আচরণে। ক্রিয়াকর্ম ও আচরণের অর্থও বুঝতে হয় তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের আলোয়। এরিস্টটল যেমন মনে করতেন মানুষ উদ্দেশ্য-চালিত জীব বা সম্বট দাবারুদের মধ্যেও যেমন একটি উদ্দেশ্যময় লক্ষ্য দেখতে চাচ্ছেন। সমাজবিদ্যা যে-মুহূর্তে এই উদ্দেশ্যময় মানুষের সম্পর্ক বুঝতে চায়, তাকে মানুষের অন্তর্লোকে যেতে হয়, বাইরের নিছক কয়েকটি মোটা আচরণ ও সম্পর্কে আর তাকে পুরো বোঝা যায় না। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে সম্বর্ট ও হ্বিজের বক্তব্যে গভীর একটা যোগসূত্র আছে। হ্বিজের কথায় আবদ্ধ থাকলে সমাজবিজ্ঞান সমিতি থাকে আবার তেমনি সম্বার্টের 'বোধ' তত্ত্বে পৌছতে কার্যকরী, প্রকৃত তথ্যাবলী সম্পর্কে অবহিত হতে হয়।

(খ) সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের একটি পার্থক্য নির্দেশ করা যায় যার গুরুত্ব আছে। সমাজবিজ্ঞান যদিও হ্বেবার-সম্বর্টের নির্দেশে সম্পর্ক ও গড়নকে অন্তর থেকে বুঝতে চায়, তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে পরিবেশের সঙ্গে মিশিয়ে, যাথার্থ্য বিষয়ে চিন্তিত হয় উৎপত্তির কার্য-কারণ জেনে তবু শেষ পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞান পরিবেশ ও সংগঠনের ঔচিত্য বিষয়ে প্রশ্ন করে না। সমাজবিজ্ঞান কেনো কোন্ সংগঠন গড়েছে প্রশ্ন করে, কিভাবে কাজ করছে ও কতোটুকু আদর্শ অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। কিন্তু কি তার করা উচিত জানতে চায় না বা সে-বিষয়ে কোনো নির্দেশ দেয় না। সমাজদর্শন ঔচিত্যের আলোচনা করে, ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের নির্দেশ দেয়। এক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে যে সমাজবিদ্যার আলোচনা থেকেই কিন্তু আমাদের ঔচিত্যের ধারণা জন্মায়। কারণ, সংগঠন কতোটুকু উদ্দেশ্য অনুযায়ী গড়ে উঠেছে জানতে পারলেই তা থেকে আমরা কর্তব্য বিষয়ে মনস্থির করতে পারি।

(গ) ঔচিত্যবিষয়ক আলোচনা থেকেই বুঝতে পারি সাধারণভাবে সমাজবিদ্যা অন্যান্য বিজ্ঞানের মতোই 'বর্ণনামূলক' (descriptive)। বিজ্ঞান বস্তুর সম্পর্ক ও চরিত্রের বর্ণনা দেয়, তার অন্তর্নিহিত চরিত্র ও সঙ্গতি বিষয়ে কিছু বলে না। দর্শন যেমন বর্ণনা দেয় তেমনি তাৎপর্য ও গুরুত্বও বিচার করে। সমাজবিদ্যাকে তাই কিছুটা বিজ্ঞান বলা চলে। সমাজবিদ্যা সামাজিক সংগঠন ও তার কর্ম সম্বন্ধে বর্ণনামূলক তথ্য সংগ্রহ

করে, বিশ্লেষণ করে, শ্রেণীবদ্ধ করে ও তা থেকে সমাজ-সংগঠনের মূল সূত্রাদিকে স্পষ্ট করে। আর সমাজদর্শন সেই সূত্রগুলোর মূল্য ও তাৎপর্য বিচার করে। বিচারের ক্ষেত্রে সমাজদর্শন নিজস্ব কয়েকটি নীতি ও মানদণ্ড প্রয়োগ করে। এই মানদণ্ড ঔচিত্য বিষয়ক অর্থাৎ লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত। নিছক বর্ণনায় তাকে জানা যায় না। সমাজদর্শনকে তাই বলা হয় আদর্শ-নিষ্ঠ (normative)। সমাজবিদ্যা উদ্দেশ্যচালিত মানুষকে বুঝতে চায় কিন্তু উদ্দেশ্য বিষয়ে মতামত দেয় না। সমাজদর্শন উদ্দেশ্য-চালিত মানুষেরই আলোচনা করে কিন্তু প্রধানতই উদ্দেশ্যগুলোর গুণাগুণ বিচার করে।

(খ) সমাজবিদ্যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো ভবিষ্যদ্বাণী করতে না পারলেও মোটামুটিভাবে সমাজ-সংগঠন ও তার পরিবর্তনের মূল সূত্র খোঁজে এবং সারা বিশ্বে ওই সূত্রগুলোর উপস্থিতি ঘোষণা করতে চায়। সদৃশ অবস্থায় সর্বত্রই যে একই নিয়মে একজাতের সংগঠন গড়বে—এমন একটা বক্তব্য সমাজবিদ্যা প্রচার করে। ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি সমাজ-পরিবর্তনের সর্ববাদীসম্মত কোনো নিয়ম গড়া সম্ভব নয়। তবু বলা চলে নিয়মের খোঁজটাই সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত। অর্থাৎ সমাজবিদ্যাও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হয়ে উঠতে চায়। উদাহরণত যেমন সমাজবিদ্যা বলে, মানুষ চিরকালই সমাজবদ্ধ জীব এবং বাঁচার জন্যে তাকে বিভিন্ন সংগঠন গড়তে হয়, সংগঠনের রূপ সর্বত্রই মোটামুটিভাবে এক।

সমাজদর্শন বিজ্ঞানের মতো ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। ভবিষ্যদ্বাণীকে নিজস্ব মানদণ্ডে বিচার করতে পারে মাত্র। বিচারে তার কাছে বক্তব্যের মূল্যায়নটাই প্রধান। মূল্য-বিচারের ক্ষেত্রে সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞান পৃথক জাতের আলোচনা।

এই পার্থক্য সত্ত্বেও বুঝতে হবে এই দুটি শাস্ত্র গভীর সম্পর্কে সম্পর্কিত। সম্বর্ট ও হেবার দেখিয়েছেন কেনো সমাজবিদ্যা কখনোই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয় বরং সমাজদর্শনের সঙ্গে তার যোগ কতো মৌলিক।

২। সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞান (Social Philosophy and Psychology)

সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞান উভয় শাস্ত্রেই মানুষ আলোচনার কেন্দ্র। মানুষের যাবতীয় চিন্তা ও কল্পনার ছাপ তার মনের বিভিন্ন শাখায় থাকে।

সমাজদর্শনে মানুষের সমাজবিষয়ক চিন্তা, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রেরণা ও স্বপ্ন মিলিয়ে উপস্থিত হয়। সংস্কৃতির সূত্রে মানুষ ঐতিহ্য বিচারের মানদণ্ড তৈরি করে ও সংগঠনের মূল্য ও তাৎপর্য্য বিচার করে। নিছক ডারয়ুইনীয় তত্ত্বের মতো সমাজসংগঠনকে যদি পরিবর্তনের ধারায় দেখা যায় তবে সমস্ত পরিবর্তনটা ঘটে প্রকৃতির খেয়ালে একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো। মানুষের কোনো অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ থাকে না তাতে। অথচ মানুষ যন্ত্র নয়। সে শুধু প্রকৃতির নিয়মের লৌহ-নিগড়ে বাঁধা নয়। সমাজ-যন্ত্রের প্রাণহীন অংশও নয় মানুষ। সংগঠনের প্রতিটি পর্যায়ে, বিবর্তনের প্রতিটি ধাপে মানুষের ইচ্ছা ও কল্পনা সংগঠনকে ভাঙে, গড়ে, নিত্য নতুন রূপ দেবার চেষ্টা করে। ইচ্ছার এই স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার সূত্রেই মনোবিজ্ঞানের কথা সমাজদর্শনের প্রসঙ্গে ওঠে।

মনোবিজ্ঞান ঠিক কতোটুকু বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি ইত্যাদি বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কিন্তু মতভেদ সত্ত্বেও তাঁরা একমত যে প্রাকৃতিক নিয়ম বা ভৌত-রাসায়নিক (physico-chemical) প্রক্রিয়ায় মানুষের সব পরিচয় মেলে না। জড়ের নিয়ম নিশ্চয়ই মানুষের ওপর কার্যকরী, সঙ্গে সঙ্গেই আছে মনের নিয়ম। মন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তার নিয়মকে প্রতিষ্ঠা করে। এই নিয়মের হাত থেকে রেহাই পাবার কোনো উপায় নেই। মনোবিজ্ঞান মনের প্রকাশিত ও গোপন কার্যকরণকে আবিষ্কার করতে চায় এবং আবিষ্কারের পর জানায় কোন্ কোন্ কাজটি মানুষ করেছে। কোন্ অবস্থায় তার পক্ষে কি কাজ করা সম্ভব।

সমাজবিদ্যার স্বরূপ বিশ্লেষণে হর্বট স্পেনসর অভিব্যক্তি (theory of evolution)-র তথ্যকে প্রয়োগ করেন। সমাজবিদ্যা ওঁর কাছে অভিব্যক্তিবাদের একটি অংশমাত্র ছিলো। অভিব্যক্তিবাদে, স্পেনসর ভেবেছিলেন, জীবদেহ বা প্রাণ ক্রমশ বিশ্লেষিত হয় ও জটিল হয়ে ওঠে এবং এই অভিব্যক্তির লীলা চলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে। জীবের এই নিয়মের ওপর কোনো হাত নেই। প্রকৃতির সর্বত্রব্যাপী নিয়মটি নিজের চালে চলবে ও প্রাণ উদ্বর্তনের কাজ করে যাবে। অনেকটা যেনো নিয়তি। কেউ জানেনা কোন্ পথে চলবে এই অভিব্যক্তির ধারা। ঘটে যাবার পর তার পরিচয়। স্পেনসর সমাজকে অভিব্যক্তির ধারায় দেখে প্রাণবান জীবদেহের সঙ্গে তাকে মিলিয়েছিলেন। ব্যক্তি ও সমাজকে বলেছেন

দেহযন্ত্রের বিভিন্ন শাখা ও পূর্ণ যন্ত্রাদির সম্পর্ক। অধ্যাপক হব্‌হাউস অবশ্য স্পেনসরের অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করলেও মনে করেন নি যে উদ্‌বর্তনের ফলে সংগঠন, জীবদেহের বা সমাজের, কেবলমাত্র পূর্ণতা থেকে বিশ্লেষিত হয়। তিনি বরং বলতে চেয়েছেন উদ্‌বর্তনের অর্থই হলো পারস্পরিক নির্ভরতা ও সঙ্গতি। অধ্যাপক হব্‌হাউস আরো মৌলিকভাবে স্পেনসরের প্রতিবাদ করেন। স্পেনসরের মতো তিনি অভিব্যক্তিকে অন্ধ নিয়তি মনে করেন নি। স্পেনসর অভিব্যক্তিকে শুধুই যে অন্ধধারা মনে করতেন তাই নয়, তিনি মানুষের কোনো স্বাধীন ইচ্ছাই স্বীকার করেন না যেহেতু মানুষ তাহলে অভিব্যক্তির ধারাতে বাধা সৃষ্টি করবে। অধ্যাপক হবহাউস বলেন, অভিব্যক্তির ধারা যতোই কেনো-না স্বয়ংক্রিয়ভাবে যন্ত্রের নিয়মে চলুক, সমাজ-বিবর্তন ক্রমশ সচেতন নিয়ন্ত্রণের অধীন হয়েছে। সচেতনতার সূত্রপাতে, হব্‌হাউসের বক্তব্য যে, মানুষ নিজ হাতে পরিচালনার ভার গ্রহণ করবে কারণ 'প্রগতি' নির্ভর করে 'সামাজিক মনে'র নিয়ন্ত্রিত সমাজ-ব্যবহারে। তিনি স্পষ্টই জানান যে, যে-সঙ্গতি আমরা খুঁজি সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে তা কখনই নিজে থেকে আসে না, নিজেদের সচেতন প্রয়াসে তাকে গড়তে হয়। ওঁর ভাষায় কথাটা হলো "But in all its meanings, harmony, as already hinted, is something which does not come of itself, but is achieved in greater or less degree by effort, that is to say, by intelligence and will." অর্থাৎ অধ্যাপক হব্‌হাউস মানুষের স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও সংকল্পের ওপর নির্ভর করছেন, মানুষকে নিছক যন্ত্র মনে করছেন না। আরো লিখেছেন 'The growth of rational control by society over the conditions of life may thus be taken as the measure of social progress." সমাজ-প্রগতিকে তিনি নিয়ন্ত্রণের হাতে ছেড়ে দিয়ে বোঝাতে চাচ্ছেন যে সমাজ প্রকৃতির নির্বাচনে চলে না, সমাজের পেছনে যে-কার্যকারণ ক্রিয়াশীল তা প্রাকৃতিক নয়, মানবিক। কোনো সন্দেহর অবকাশ না দিয়ে তিনি ঘোষণা করেন 'The distinguishing characteristics of our time are that civilization for the first time has the upper hand, that the physical conditions of life have come and are rapidly coming more and more within human control, and that at least the foundations have been laid for a

social order which would render possible a permanent and unbroken development.'

অধ্যাপক হব্‌হাউসের পাশাপাশি দেখা যাবে মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক উইলিয়ম গ্রাহাম সামনর ঘোষণা করছেন যে সমাজতত্ত্বের আলোচনা জীবনযাত্রার রীতি ও বিধি বিষয়ে। সেক্ষেত্রে মানুষের কোনোই স্বাধীনতা নেই, তাকে শৈশব থেকে মেনে নিয়েই চলতে হয়। ওঁর মতে, 'Men in groups are under life conditions; they have needs which are similar under the state of the life conditions; the relations of the needs to the conditions are interests under the heads of hunger, love, vanity, and fear; efforts of numbers at the same time to satisfy interests produce mass phenomena which are folkways by virtue of uniformity, repetition and wide occurence.' সামনর বলতে চাচ্ছেন যে মোটামুটিভাবে জীবনযাত্রার একই অবস্থায় একই সম্পর্ক কাজ করে। এই অবস্থা ও সম্পর্ককে মোটা-মুটিভাবে ক্ষুধা, প্রেম, অহমিকা ইত্যাদির নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এদের সর্বব্যাপী ঐক্য ও কার্যক্রমের উপস্থিতি থেকে আমরা নিয়ম গড়তে পারি। কিন্তু এই নিয়মগুলোকে ভাঙা মানুষের সাধ্যাতীত। যেমন তিনি বলেন 'They pervade and control the ways of thinking in all the exigencies of life, returning from the world of abstraction to the world of action, to give guidance and to win revivification.

এই আলোচনায় দেখা যাচ্ছে সমাজতাত্ত্বিকদের প্রধান ঝোঁক হচ্ছে প্রকৃতির অন্ধ নিয়ন্ত্রণের দিকে। আবার যদিবা হবহাউস মানুষের কর্তৃত্বের কথা বলছেন তিনি সমস্ত প্রচেষ্টাকেই এমন যুক্তিসিদ্ধ বলতে চাচ্ছেন যে মনে হবে সমাজে মানুষেরা বুঝি সবটাই সম্পূর্ণ ভেবে ভালোমন্দ বিচার করে কাজে নামে। মানুষ যেনো কেবলই বুদ্ধি ও বিবেচনা। এই বক্তব্যে মনস্তত্ত্ব বাতিল হবে যায়। তাই এই বক্তব্যের বিরোধী মনস্তাত্ত্বিক ধারা গড়ে ওঠে যার প্রধান বক্তব্য মানুষ মূলতই অযুক্তির পথে চলে কারণ তার মনের তলায় যে-সব বৃত্তি ও ঝোঁক কাজ করে তাদের শাসনভার কারো হাতে নেই। সচেতনতার আড়ালে থাকে অজ্ঞান ও প্রবৃত্তির রাজত্ব। সে-রাজ্যের দাপট এমন একচ্ছত্র যে সচেতন বুদ্ধিমান মানুষের চরিত্র তার চাপে মুহূর্তেই বদলে যেতে পারে।

ইংরেজ দার্শনিক ডেভিড হিউম এই অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তিনি নির্বিশেষ নিয়মকে দাঁড় করান মানসিক বোধের উপর। কার্য-কারণ তত্ত্ব আলোচনা করে তিনি দেখান যে কার্যকারণ প্রকৃত ঘটনায় নেই, আমরা মনে মনে ওটাকে গড়ে নিই। এই বক্তব্যকে দর্শনে **'অজ্ঞেয়তাবাদ'** বলা হয়। হিউম অজ্ঞেয়তাবাদের যুক্তিকেই সমাজতত্ত্বে আনেন। সমাজতত্ত্ব তখন আর নৈর্ব্যক্তিক নিয়ম থাকে না, মানুষের মনের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। হিউমের বক্তব্যের সঙ্গে জর্মন দার্শনিক কাণ্টের গভীর মিল আছে। কাণ্ট সরাসরি ঘোষণা করেন যে সমাজ এগোয় 'বিরোধে'র জন্যে। কাণ্টের বিরোধ বোধ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে সমাজের আলোচনায় ব্যক্তির মনের খোঁজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কাণ্ট লিখেছেন 'By this Antagonism, I mean the *unsocial sociability* of men; that is, their tendency to enter into society, conjoined however, with an accompanying resistance which continually threatens to dissolve this society. The disposition for this lies manifestly in human nature. Man has an inclination to *socialise* himself by associating with others, because in such a state he feels himself more than a natural man, in the development of his natural capacities. He has, morever, a great tendency to *individualise* himself by isolation from others, because he likewise finds in himself an unsocial disposition of wishing to direct everything merely according to his own mind; and hence he expects resistance everywhere just as he knows with regard to himself that he is inclined on his part to resist others'. কাণ্টের এই উদ্ধৃতিতে দেখা যাচ্ছে যে তিনি বারংবার ব্যক্তির মন ও মানসিকতার কথা বলেছেন। সুতরাং সমাজের আলোচনায় ব্যক্তি মনকে বাদ দিলে সমাজের তাৎপর্যটাই বোঝা যাবে না। যেহেতু সমাজ যাদের নিয়ে তারা পুতুল বা যন্ত্র নয়। তাদের ভালোমন্দ বোধ আছে, আশা-আকাঙ্খা আছে, রাগ-বিদ্বেষ আছে, প্রেম-প্রতিহিংসা আছে।

কাণ্টের পরবর্তী উনিশশতকে আর একজন জর্মন মনীষী সিগমুণ্ড ফ্রএড দেখান কেমন করে মনের অন্তর্গূঢ় কারণে মানুষ যেমন পাণ্টায় তেমনি সমাজের চরিত্রও পালটে যায়। ফ্রএডের একটি বিখ্যাত তত্ত্ব

হলো সমাজ মানুষের প্রবৃত্তির সহায়ক নয় অর্থাৎ সমাজে মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। এ-কারণেই মানুষের মনে একটি 'সমাজভীতি' কাজ করে। কখনো কখনো কেউ এই ভয়কে হয়তো জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে, কেউ পারে না। সমাজ সর্বদাই এই দুটি টানের মধ্যে বিব্রত থাকে। কাজেই মানুষের মনকে বাদ দিলে সমাজ-চর্চাই বৃথা। ইংরেজ সমাজতাত্ত্বিক ম্যাকডুগাল সমাজের ব্যাখ্যায় মানুষের মনের ঝোঁকের ওপর দাঁড়াতে চান, যাকে তিনি নাম দিয়েছেন 'প্রোপেন্-সিটি'। এই ঝোঁকের তাড়নায় মানুষ সবকিছু করে। যেমন উড়বার ঝোঁকটা প্রকাশ হয় গাছে ওঠা ইত্যাদিতে। ম্যাকডুগালদের চর্চায় সমাজবৃত্তির পরিচয় তাই মিলবে ব্যক্তি মানুষদের মনের খোঁজে। বর্তমান কালে এঁদের প্রভাবেই 'সামাজিক মনস্তত্ত্ব' নামে একটি নতুন শাখা সংযোজিত হয়েছে জ্ঞানকাণ্ডে।

বর্তমান আলোচনা থেকে আমরা প্রধান কয়েকটি সূত্র তৈরি করতে পারি,—

সমাজতত্ত্বকে অধ্যাপক গিন্সবের্গের মতো ব্যাখ্যা করলে আমরা চারটি কর্তব্য পাই। সমাজতত্ত্বের প্রাথমিক লক্ষ্য ওঁর মতে (১) বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর প্রকৃতি ও প্রসারের ধারা বিচার করা। (২) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যতোদূর সম্ভব তুলনামূলক আলোচনায় গড়পড়তা বা আনুপাতিক নিয়ম দাঁড় করানো। (৩) প্রয়োগসিদ্ধ ব্যবহারিক নিয়ম তৈরি করা ও (৪) জীবন ও মনের মৌলিক নিয়মের সূত্রে সমস্ত তথ্যাবলীকে বিচার করা। এই বক্তব্য অনুযায়ী মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজদর্শনের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই। কারণ সমাজদর্শন যতোটুকু সমাজতত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল ততোটুকু তার তথ্যের ভিত্তি। সমাজতত্ত্বের তথ্য থেকে সমাজদর্শন যে-আলোচনার সূত্র গড়ে তার সঙ্গে ব্যক্তিমন বা 'সমাজমনে'র কোনো যোগ নেই। সূত্রগুলো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্কের বাহ্য বিন্যাস মাত্র। কি কি মানসিক কার্যকারণের টানাপোড়েনে তা গড়েছে জানবার দরকার নেই।

(খ) মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞান হিসেবে বর্ণনামূলক শাস্ত্র। প্রসঙ্গত তার সঙ্গে উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা নীতির কোনো যোগ নেই। মনোবিজ্ঞানের প্রশ্ন: মন এমন কেনো করলো? আর সমাজদর্শনের প্রশ্ন: কেমন করে উদ্দেশ্যটি যাচাই করবো? কেনোর জবাবে মনোবিজ্ঞান নিজ এলাকার

বাইরে উত্তর খোঁজে না আর সমাজ দর্শনের ঝোঁকটাই হলো মানুষের বৃহত্তর জ্ঞানের জগত থেকে জীবনের লক্ষ্যকে গ্রহণ করা। যেহেতু সমাজ-দর্শন মূল্য বিষয়ে সচেতন। সাধারণভাবে তাই বলতে হবে সমাজদর্শন আদর্শনিষ্ঠ (normative) ও মনোবিজ্ঞান বর্ণনামূলক (descriptive) শাস্ত্র। একটির খোঁজ কেমন করে ও অন্যটির খোঁজ বিষয়ের কেনো (why) ?

(গ) আপাতদৃষ্টিতে সমাজদর্শন ব্যক্তিমানুষ নিয়ে চিন্তিত নয় অথচ মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় নির্দিষ্ট একটি মানুষের মন। প্রতিটি মানুষের মন যেহেতু একই নিয়মে সর্বত্র সাড়া দেয় না সেহেতু মনোবিজ্ঞানকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতোই অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়াতে হয় এবং অভিজ্ঞতা সমস্ত সময়েই ব্যক্তিগত। নির্দিষ্ট স্থান কাল পাত্র ভেদে তার পরিচয়। অথচ সমাজদর্শনের ব্যবহার গড়পড়তা নিয়মে। কোনো একটি ব্যক্তি সমাজদর্শনের আয়ত্তের বাইরে থাকতেই পারে। সেই ব্যতিক্রমটি কখনো মূল বক্তব্যকে অপ্রমাণ করতে পারে না। সমাজদর্শন,ব্যস্ত সমাজকে নিয়ে আর মনোবিজ্ঞান ব্যক্তিকে নিয়ে।

(ঘ) সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞানে তেমনি যথেষ্ট মিলও আছে। সমাজ যদিও সর্বব্যাপী মৌলিক প্রতিষ্ঠান তবু ব্যক্তিমানুষ ছাড়া তার কোনো ক্ষেত্র নেই। ব্যক্তিমানুষগুলোর আবেগ বাসনা ও সঙ্কল্পই সামাজিক সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রায় প্রকাশিত হয়। যদিও প্রতিটি মানুষ কমবেশি প্রচলিত ধারণার দ্বারা চালিত তবু তাদের সমর্থন-অসমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যে-কারণে সমাজ-ব্যবস্থায় দাসপ্রথার স্বীকৃতি যদি থাকে তার মধ্যে কোনো একজনের প্রতিবাদ সমাজদর্শনের দিক থেকে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। সুতরাং মানুষের মনের দিক থেকে সমাজ দর্শন ও মনোবিজ্ঞান পরস্পরবিরোধী শাস্ত্র নয়। অধ্যাপক ম্যাকাইভর বেশ বলেছেন যে জীবনের কোনো ঘটনা বোঝা যাবে না যদি আমরা ঘটনাকে মানুষের আবেগ, প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য থেকে তফাৎ করে দেখি। এ-কথা নিশ্চয়ই ঠিক যে আমরা সমাজদর্শনে প্রতিটি মানুষের আদর্শ ও আবেগ পৃথক পৃথক করে দেখি না তবু স্বীকার করতেই হচ্ছে যে মানুষের মনেই আদর্শের জন্ম-মৃত্যু। মানুষের শাস্ত্রে যতোই কেনো-না নৈর্ব্যক্তিক নিয়মের খোঁজ করা হোক, মানুষের মনের প্রসঙ্গ বাদ পড়তে পারে না। সমাজদর্শনকে তাই মনোবিজ্ঞানের কাছ থেকে পাঠ নিতে হয়।

(ঙ) বর্তমানের 'সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক'রা যেমন বলেন যে একটি ব্যক্তির জীবনে যেমন মনের প্রকাশ নানাভাবে ঘটে তেমনি সমাজের ক্ষেত্রেও হুবহু পরম্পরা আছে। ব্যক্তি প্রধানত তিনটে ঝোঁকে বা নিয়ন্ত্রণে চলে। তুটি মানুষ ইতিহাসের সূত্রে পেয়েছে আর একটি তার নিজের সৃষ্টি। প্রথম তুটি হলো সহজাতবৃত্তি, এই প্রবৃত্তিজাত প্রতিবর্তী ক্রিয়া (reflex action) ও তৃতীয়টি, মানুষের বিচারবুদ্ধি। সামাজিক জীবনে প্রবৃত্তির পরিচয় আমাদের পাশবিক ব্যবহারে ও তজ্জাত সংগঠনে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসীরা যেমন ইহুদী হত্যায় মানুষের বন্য হিংস্র প্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে! সমাজে হিংসামূলক নানা প্রতিষ্ঠান যার উদাহরণ। প্রতিবর্তী ক্রিয়ার পরিচয় যূথ-ব্যবহারে। যেমন দেখা যায়, গ্রামের লোকেরা একই সঙ্গে একটা কাজ করে, শহরের রাস্তা পেরোনো বা মন্দিরদর্শন ইত্যাদি কাজে। স্বাভাবিক সুস্থ লোকেরা যেমন সভা-সমিতিতে যূথবদ্ধ মনোভাবের পরিচয় দেন। শান্ত লোক পাগলের মতো ব্যবহার করেন। এই আচরণগুলো স্বাভাবিক বৃত্তি নয়। সমাজে বসবাসের ফলে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সমাজদর্শনের ব্যবহার এই সব তথ্যের ওপর নির্ভর করেই গড়ে। সুতরাং মনোবিজ্ঞান সমাজদর্শনকে সাহায্য করে। একই রকমে মনোবিজ্ঞানও শেখে সমাজদর্শনের কাছ থেকে। মনোবিজ্ঞান কখনোই একটি একক শূন্য-বাসী মনকে বিচারের জন্য পায় না। নিরালম্ব মানুষ বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। সুতরাং মনোবিজ্ঞান মনকে বিচার করতে বাধ্য হয় তার সামাজিক পরিবেশের কার্যকারণের সূত্রে। এ-কথা ফ্রএড মানতে বাধ্য হয়েছেন তাঁর 'মুক্ত অনুষঙ্গ' (free association) তত্ত্বে। আরো সমর্থন পাই রুশ বৈজ্ঞানিক প্যাভলভের নির্ধারিত প্রতিবর্তী তত্ত্বে (conditioned reflex) কারণ তিনি দেখিয়েছেন যে একটি কুকুরকে কেমন একটি অভ্যাস তৈরি করিয়ে দেওয়া যায়! মানুষকেও যায়। আফিং-খোরদের যেমন নির্দিষ্ট সময়টিতে আফিং না-হলে চলে না।

৩। সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Social Philosophy and Political Science)

সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথম বিরোধ 'দর্শন' ও 'বিজ্ঞান' বিষয়ক। একদল পণ্ডিতের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রকৃতি বিজ্ঞানের মতোই রাজনৈতিক সংগঠনের চরিত্র ও নিয়ম ব্যাখ্যা করে। এই চরিত্র ও নিয়মের ব্যাখ্যায়

কোনো বহিরাগত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে চাপানো যায় না। রাজনৈতিক সংগঠনের সূত্র নির্দেশ দিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ভবিষ্যদ্বাণী করবে সম্ভাব্য সংগঠনের ভাবীরূপ বিষয়ে যেমন করে থাকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র। এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে আর একদল পণ্ডিত ঘোষণা করেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিশ্চয়ই রাজনৈতিক সংগঠনের চরিত্র ও প্রকৃতি বিষয়ে চর্চা করে কিন্তু সেই চর্চার রূপ নির্দিষ্ট হয় কয়েকটি লক্ষ্য ও নীতির আদর্শে। সংগঠনগুলোর ভালোমন্দ ও যাথার্থ্যবিচার তাদের লক্ষ্যের বাইরে নয়। যেমন, রাষ্ট্রবিদরা গ্রীক রাজনৈতিক সংগঠনের পরিচয় গ্রহণ করেন কিন্তু সঙ্গেসঙ্গেই আমাদের জন্য নির্দেশ তৈরি করেন ওই সংগঠনগুলো কতোটুকু গ্রীকদের জীবনের সত্যকে প্রকাশ করেছে ও কতোটুকু তারা বর্তমানের জীবনযাত্রায় প্রযোজ্য। রাষ্ট্রবিদদের কাছ থেকেই আমরা জেনেছি স্পার্টা নগররাষ্ট্রের সংগঠন কেনো স্পার্টাবাসীদের জীবনের সত্যকে প্রকাশ করে, কেনো এথেন্স নগররাষ্ট্রের রূপ স্পার্টার অনুরূপ না-হয়ে এথেন্সের গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রাকে প্রকাশ করে। এই বক্তব্যটিই বর্তমানে সর্বাধিক স্বীকৃত।

(ক) এই আলোচনার বক্তব্যকে স্মরণ রেখে আমরা বলতে পারি রাষ্ট্রবিজ্ঞান নামটিতে যদিও 'বিজ্ঞান' শব্দটি জোড়া হয়েছে তবু রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতি ও আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় সমাজদর্শনের সমগোত্রীয়। কার্যত রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের মতো বর্ণনামূলক না-হয়ে আদর্শনিষ্ঠ শাস্ত্রের সীমায় এসে পড়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ব্যবহৃত আদর্শ ও লক্ষ্য প্রস্তুত করে সমাজদর্শন। সমাজদর্শন সমাজবদ্ধ মানুষের সংগঠনকে নির্দেশ দেয়, ভালোমন্দ ও উচিত-অনুচিতের পাঠ দেয়, জানায় কোন্ পথে চললে জীবনের সত্যকে প্রকাশ করতে পারবে। সংগঠন গড়বার আগে সংগঠনের আদর্শ তৈরি হয়। দর্শন নীতির বিচারে আদর্শের রূপ ও কাঠামোটি তৈরি করে। রাজনৈতিক সংগঠন বানাবার সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজদর্শনের কাছ থেকে তার রূপ ও পরিচয় গ্রহণ করে। যেমন গণতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী আদর্শ। এই আদর্শ অনুযায়ী রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রস্তুত হবার বহুপূর্বেই দার্শনিকরা নানা গ্রন্থ ও আলোচনায় মতবাদ দুটির চরিত্র স্থির করেন ও তারপর কালক্রমে একটু একটু করে রাজনীতিজ্ঞরা তার ব্যবহার করতে থাকেন। জর্মন পণ্ডিত কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস যেমন সাম্যবাদের তত্ত্ব গড়েন ও সেই মতাদর্শ অনুযায়ী রুশ দেশে লেনিন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদী রাষ্ট্রসংগঠন তৈরি করবার

ব্যবস্থা করেন। গ্রীক দার্শনিকদের কাছ থেকে যেমন গণতান্ত্রিক আদর্শের বীজ সংগ্রহ করে লক ও রুশো, জেফার্সন ও টম পেইন পরবর্তীকালের প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বক্তব্য উপস্থিত করেন।

(খ) রাজনৈতিক সংগঠনের পূর্বে যেমন দার্শনিক আদর্শ তেমনি যে-কোনো সংগঠনের পূর্বেই সমাজ-সংগঠন। সমাজদর্শন সমাজ-সংগঠনের, প্রকৃতি, লক্ষ্য ও চরিত্র স্থির করবার পর সমাজতাত্ত্বিকরা তাদের পরিচয় গ্রহণ করেন; ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় অথবা জনগোষ্ঠীও ব্যবহারিক জীবন-যাত্রার তথ্যাদি সংগ্রহ করে তাঁরা সমাজদর্শনের আলোয় মূল্য নির্ধারণ করেন। সমাজ-সংগঠনের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য যেহেতু সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আদি ও মূল শাস্ত্রস্বরূপ সমাজদর্শনের কাছ থেকে মানুষের মৌলিক পরিচয় গ্রহণ করতে হয়। সমাজদর্শন গোড়াতেই জানায় যে মানুষ ইতিহাসে চিরকাল যূথবদ্ধভাবে বসবাস করেছে, যৌথ জীবন ছাড়া প্রতিকূল প্রকৃতিতে তাদের বাঁচবার কোনো উপায় নেই। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই শিক্ষায় মানুষের সামাজিক ঐক্য অনুযায়ী সংগঠন বানাবার কথা ভাবে। যেমন, গণতান্ত্রিক দার্শনিকরা জানান মানুষের মৌলিক ঐক্য একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় সংগঠনেই মূর্ত হয়। সুতরাং আমরা সহজেই ঘোষণা করতে পারি সমাজদর্শন আদি ও মূলশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান তার সন্তান। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজদর্শনের একটি অংশ মাত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা মানুষের সর্ববিধ সংগঠন বিষয়ে নয়, কেবলমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন বিষয়ে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আংশিক আলোচনা মাত্র। সমাজদর্শন তাকে পূর্ণতা দেয়।

৪। সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান (Social Philosophy and Ethics)

নীতিশাস্ত্র স্বাধীন মানুষের লক্ষ্য-নির্দিষ্ট কর্মের আলোচনা করে। নীতিশাস্ত্র আলোচনার আদিতেই জীবনের মূল লক্ষ্য স্থির করে ও সেই লক্ষ্য অনুযায়ী জীবনকে সংগঠিত করবার নির্দেশ দেয়। সমাজদর্শন একই রকমে গোড়া থেকেই সমাজ জীবনের নীতি স্থির করে, ও সেই নীতিকে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিদের কর্মে প্রকাশিত দেখতে চায়। নীতি ও আদর্শের সূত্রেই সমাজদর্শন ও নীতিশাস্ত্রের সংযোগ।

(ক) নীতিশাস্ত্র ও সমাজদর্শন জীবনের বাহ্যরূপটি বিষয়ে চিন্তিত নয়। ওই রূপের আড়ালে যে তাৎপর্য ও মূল্য গোপন থাকে তাদের প্রত্যক্ষ

করাই এই শাস্ত্র দুটির কাজ। অর্থাৎ এই শাস্ত্র দুটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পথে চলে না। বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংগঠনের আলোচনা করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, বস্তুর অন্তর্নিহিত চরিত্রের খোঁজ দেয় না। নীতিশাস্ত্র ও সমাজ-দর্শন অন্তরের সংবাদ দেয়, গুরুত্ব বিচার করে। মানুষের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংগঠনের পরিচয় আছে সমাজতত্ত্বে। তার পদ্ধতি বর্ণনামূলক আর নীতিশাস্ত্র ও সমাজদর্শন আদর্শনিষ্ঠ। সামাজিক জীবনের ভালোমন্দ, শুভাশুভ যেমন সমাজদর্শনের আলোচনা তেমনি নীতিশাস্ত্রেরও। এই দিক থেকে তাদের কোনোই তফাৎ নেই।

এই সূত্রেই আরো একটি মিল নজরে পড়বে। নীতিশাস্ত্র ও সমাজ-দর্শন সমাজবদ্ধ মানুষের কথা বলে। নিরালম্ব শূন্যে অবস্থিত একক সম্পর্ক-রহিত কোনো ব্যক্তির পরমার্থ বিষয়ে আলোচনা করে না। অর্থাৎ দুটি শাস্ত্রেরই পটভূমি 'সমাজ'। এক্ষেত্রে একটিমাত্র তফাৎ আছে। নীতিশাস্ত্র নিঃসন্দেহেই সমাজিক মানুষের শুভাশুভ, ন্যায়-অন্যায়ের কথা বলে কিন্তু তার মূল লক্ষ্য মানবজীবনের চূড়ান্ত আদর্শ বা পরমার্থের কথা। যাকে ভারতবর্ষে বলা হতো শ্রেয়সের আদর্শ। সমাজদর্শন পরমার্থের খোঁজ দেয় না। যদিও সমাজদর্শনের আদর্শ পরমার্থ-তত্ত্ব দ্বারা জারিত। যেমন, ভারতবর্ষে জীবনের মূল লক্ষ্যকে 'অপবর্গ' বলা হয়। চারটি অপবর্গ আছে। সমাজদর্শনে ভারতবর্ষের বক্তব্য অপবর্গানুযায়ী জীবনযাত্রাকে প্রস্তুত করা। কিন্তু অপবর্গের চরিত্র বিষয়ে সমাজদর্শনের প্রশ্ন নেই। সমাজদর্শন মূল তত্ত্ববিদ্যা থেকে অপবর্গ বিষয়ে জেনে সমাজে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করে। এই শাস্ত্রে অপবর্গের প্রয়োগ কেবলমাত্র সমাজজীবন ও সমাজ-সংগঠনের ক্ষেত্রে। নীতিশাস্ত্র সম্পূর্ণতই পরমার্থ বিষয়ে ও ব্যক্তির জীবনে তার সংযোগ বিষয়ে আলোচনা করে যদিও মূল তত্ত্ববিদ্যা বা দর্শনশাস্ত্র তাকেও অপবর্গের খোঁজ দেয়। সমাজদর্শন সমাজে কোনটা ভালো ও কোনটা মন্দ এ-বিষয়ে আলোচনা করে আর নীতিশাস্ত্র সেই ভালোটি কেনো ভালো, কেনো মন্দ এই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান দেয়।

(খ) সমাজদর্শন ও নীতিশাস্ত্রের একটি পার্থক্যের কথা অনেকে বলেন। পার্থক্যটি হলো, নীতিশাস্ত্র ব্যক্তিকে নিয়ে চিন্তিত, ব্যক্তির কাজকর্মের, জীবনযাত্রার নির্দেশ দেয় মাত্র অথচ সমাজদর্শন কোনো একটি মানুষ বিষয়ে কিছু জানায় না, সংঘবদ্ধ মানুষের কথা বলে। বিচার করলে দেখা যাবে একটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে-নিয়মটি কার্যকরী তা সমগ্র

সমাজের ক্ষেত্রে সার্থক না-ও হতে পারে। কাজেই ব্যক্তি ও সমাজের কর্মে তফাৎ আছে। এই পার্থক্যের কারণেই নীতিশাস্ত্র ও সমাজদর্শনের ক্ষেত্র বিভাগ। যেমন, ভারতবর্ষে চতুরাশ্রমের সর্বশেষ আশ্রমটি সন্ন্যাস। সামাজিক জীবনে অন্যান্য তিনটি আশ্রমের ব্যবহার কম বেশি সম্ভব। কিন্তু সবার পক্ষেই সন্ন্যাস সম্ভব নয়। অথচ ভারতবর্ষে চতুরাশ্রমে সন্ন্যাস সর্ব শেষ ধাপ। নিশ্চয়ই সন্ন্যাস জীবনের একটি মহৎ আদর্শ, কোনো কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে মহত্তম। কিন্তু প্রতিটি লোকের জীবনেই এই আদর্শটি প্রযোজ্য হতে পারে না। সুতরাং নীতিশাস্ত্র ব্যক্তির আর সমাজদর্শন সমগ্রের।

কিন্তু এই বিভাগটি সর্বত্রই সমভাবে মূল্যবান নয়। সমাজদর্শনের পশ্চাৎপট সমাজ, কিন্তু সমাজ যেহেতু ব্যক্তি নিয়েই গড়েছে সেহেতু ব্যক্তির চেতনা বাদ দিয়ে কোনো শাস্ত্রই সম্ভবপর নয়। সমাজের সামগ্রিক আদর্শটি ব্যক্তিরাই পরস্পর আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে গড়ে। কোনো আদর্শ পরিত্যক্ত হয়, নতুন কোনো আদর্শ স্বীকৃত হয়। যেমন, য়ুরোপে পেগান-বিশ্বাসী রোমক সাম্রাজ্যের ওপর খৃষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবনযাত্রার কল্পনা ও লক্ষ্যের বিরাট পরিবর্তন ঘটে। সঙ্গে সঙ্গেই আমরা জানি, নীতিশাস্ত্র সমাজকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না। প্রথমত, নীতিশাস্ত্র একক মানুষের জন্যে নয়, সামাজিক মানুষের জন্যে। দ্বিতীয়ত, আলাদা আলাদা ব্যক্তির জন্য আলাদা আলাদা নীতি তৈরি হয়নি। নীতি সামগ্রিকভাবে সত্য এবং তার চরিত্র সামগ্রিকতার। সামগ্রিক নীতিকেই ব্যক্তিরা তাদের নিজের নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যবহার করে। আমরা কখনোই যেমন বলতে পারি না 'সদা সত্য বলবে' নীতিটি শুধু রামের জন্য কি শুধু শ্যামের জন্য। বলতে হয় আলোচিত সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য। কোন্ ব্যক্তি কিভাবে সত্যটি ব্যবহার করবে তার হিসেব নিশ্চয়ই সমাজ করে না কিন্তু সমাজ তেমনি কিছু পৃথক পৃথক নীতির কথাও বলে না। আসলে 'সদা সত্য বলবে' সবার জন্যেই সত্য। সন্তান মারা গেলে মাকে সেই সংবাদ জানানো নামক সত্যটি ব্যবহার করা উচিত কি উচিত নয় বিচার করবে সম্পর্কিত ব্যক্তিরা কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বক্তব্যটির সামান্য সত্য (universal truth) নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আসলে, মনে রাখতে হবে নীতিশাস্ত্রের বক্তব্য সর্বজনীন ও সামান্য আর তার ব্যবহার

ব্যক্তিগত। গ্রীক ইতিহাসে সোফীবাদীরা, যেমন প্রোটাগোরাস, একক ব্যক্তির নীতি ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন নীতির আদৌ কোনো প্রয়োজন বা ভিত্তি নেই। প্রয়োজনে যে যেমন খুশি কাজ করবে। বর্তমানেও যেমন দার্শনিক প্রয়োগবাদীরা, ডিউই প্রমুখেরা বলেন, যে কাজে ফল পাবে তা-ই গ্রহণ করো। সেকালে প্লেটো এই মতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে প্রমাণ করেছিলেন যে প্রোটাগোরাসের বক্তব্য স্বীকৃত হলে সত্য নামে জগতে কিছু থাকবে না। এ-কালেও প্লেটোর প্রামাণ্যই সিদ্ধ। সুতরাং নীতিশাস্ত্রও কার্যত 'সমাজ'-বিষয়ক। সমাজদর্শনের ক্ষেত্রে তেমনি 'সাম্যবাদ' বা 'গণতন্ত্রে'র ভালোমন্দ বিষয়ে ব্যক্তিদের মতামত ও আলোচনাই সত্য যেহেতু তারাই মত গ্রহণ করে বা বর্জন করে।

বর্তমান আলোচনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে সমাজদর্শনের কোনো বিরোধ নেই। যাঁরা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ভুল বিরোধ তৈরি করেন তাঁরাই নীতিশাস্ত্র 'ব্যক্তিক' ও সমাজদর্শন 'সামাজিক' বলেন। কার্যত, ব্যক্তি সমগ্র নীতির চর্চা করতে করতেই সমাজ মঙ্গল গড়ে আর সমাজ মঙ্গল নিছক ব্যক্তিস্বার্থের সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর জীবনের আদর্শ সবার সামনে উপস্থিত করে। কারণ একমাত্র ব্যক্তিই প্রত্যক্ষ আর সমাজ বিমূর্ত প্রত্যয় মাত্র। ব্যক্তির প্রত্যক্ষতার সঙ্গে সমাজের বিমূর্ততাকে বাঁধে নীতিশাস্ত্র ও সমাজদর্শন। তাই নীতিশাস্ত্র ও সমাজ-দর্শন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যেমন একটি টাকার এ-পিঠ ও ও-পিঠ।

অনেক পণ্ডিতের একটা ধারণা আছে যে সমাজদর্শন যেহেতু সমগ্রের আলোচনা করে এবং এই সমগ্রটি ব্যক্তিদের দ্বারা সংগঠিত সুতরাং সমাজের পূর্বে ব্যক্তির আলোচনা থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তি সমাজের পূর্ববর্তী ও সমাজ ব্যক্তির জীবনে একটি সংগঠনমাত্র। কাজেই ব্যক্তির শুভাশুভের শাস্ত্র নীতিশাস্ত্র ও সমাজের শুভাশুভের শাস্ত্র সমাজদর্শন। স্বভাবতই এখন বলা চলে নীতিশাস্ত্রের একটি অংশ হচ্ছে সমাজদর্শন। সামাজিক ভালো-মন্দের ধারণা নীতিশাস্ত্রই ঘোষণা করে।

কিন্তু এই বক্তব্যটি সত্য নয়। ইতিপূর্বেই আলোচনায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে প্রথমত যেমন কোনো বিরোধ নেই, দ্বিতীয়ত তেমনি সময়ের হিসেবেও পূর্বাপর নেই। ব্যক্তি থাকলেই সমাজ আছে এবং সমাজ ছাড়া মানুষ মানুষও হতে পারে না। সুতরাং

আগে ব্যক্তি ও পরে সমাজ কথাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সমাজ ও ব্যক্তি যদি পরস্পর সম্পূরক হয়, একটির সঙ্গে অন্যটি যদি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়, তবে ব্যক্তি ও সমাজে কোনো বিরোধ থাকে না। সমাজ আগে বা ব্যক্তি আগে এমন কথাও বলতে হয় না।

আমাদের এই বক্তব্যটি যদি সত্য হয় তবে বুঝতে হবে ব্যক্তির শুভাশুভের শাস্ত্র নীতিশাস্ত্র ও সামাজিক শুভাশুভের শাস্ত্র সমাজদর্শনে কোনো মৌলিক তফাৎ নেই। সুতরাং সমাজদর্শন নীতিশাস্ত্রের অংশ নয়।

অনুশীলনী

1. Explain the relation between Social Philosophy and Psychology. Is Psychology to be included in the scope of Social Philosophy ?

2. What is the relation of Social Philosophy to Ethics ? Is Social Philosophy a branch of Ethics ? (B. U. 1962)

3. Give a clear idea of the subject-matter of Social Philosophy and discuss its relation to Sociology.

(C. U. 1962, B. U. 1962)

4. Discuss the relation of Social Philosophy to Political Science.

5. Discuss clearly the nature and scope of Social Philosophy and suggest its affinity to other branches of knowledge

6. Which of the other branches of knowledge is akin to Social Philosophy and why ?

তৃতীয় অধ্যায়

ব্যক্তি ও সমাজ

১। সমাজের সংজ্ঞা (Definition of Society)

প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি সমাজ বলতে বোঝায় সম্পর্ক। সম্পর্কের বিন্যাসটি জটিল। জটিল সম্পর্কের বিন্যাসে সমাজ সভ্যতার আদি থেকেই আছে। কোনো একদিন মানুষকে সমাজ নামক সংগঠনটিকে তৈরি করতে হয়নি ঐতিহাসিক প্রযোজনে। অধ্যাপক ম্যাকাইভর তাঁর 'কমিউনিটি' নামক গ্রন্থে যখন সমাজের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন 'মানুষে মানুষে যে-কোনো সংকল্পস্থিত সম্পর্কই সমাজ' আমরা আপত্তি করেছি। কারণ অধ্যাপক ম্যাকাইভর ধরে নিয়েছেন ব্যক্তিরা যেনো স্বেচ্ছায় পরিকল্পনা মতো সমাজ তৈরি করে। এ-কথা মানলে হব্‌সের মতো প্রাক্-সামাজিক অবস্থার কথাও ভাবতে হয়। আমরা বরং অধ্যাপক ন্যাডেলের বক্তব্য ('এনথ্রোপলজি এণ্ড মডার্ণ লাইফ' গ্রন্থে প্রকাশিত) নিয়ে অগ্রসর হবো, যে সমাজ হলো এমন একটি জনগোষ্ঠী যার মধ্যে কোনো-না-কোনো ঐক্য এসেছে, যার ফলে সেই গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তার স্থায়িত্ব রক্ষা পায়। এই বক্তব্যে নিজে থেকে স্থির করবার কথা নেই আর বুঝতে পারছি যে জনগোষ্ঠির জন্যে স্থায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অধ্যাপক ন্যাডেল যখন ঐক্যের কথা বলেন তিনি কিন্তু শুধুমাত্র বাইরের সম্পর্কের কথা বলছেন না, মানসিক ঐক্যের কথা বলছেন। মানসিক ঐক্য, আমরা সবাই জানি, বাহ্যরূপে প্রকাশ পায় না ; তার পরিচয় আছে ঐতিহ্যের ধারায়, সংস্কৃতির পরম্পরায়। যেমন ভেবে এসেছেন আমাদের পিতা-পিতামহরা, আমরাও তেমনভাবে ভাবছি এবং ভবিষ্যত বংশধরদেরও তেমনিভাবে ভাবতে হবে। তার অর্থ নয়, একই কথা ও একই তার প্রকাশভঙ্গি চিরকাল চলে আসছে। সময়ের স্রোতে সমাজবিষয়ে আমাদের হৃদয়ের যোগটাই একটানা প্রবাহিত, তার ধরণ যদিও পাল্‌টাচ্ছে যুগে যুগে।

মানসিক ঐক্য বুঝবার জন্যে দার্শনিকরা একটি উদাহরণ দেন। দর্শনে সমাহার বা সমন্বয় বোঝাতে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। একটিকে আমরা

'সমাহার' (collection) বলবো, অন্যটিকে 'শ্রেণী' (class)। 'শ্রেণী' বোঝাতে আমরা বলতে পারি, 'ছ-ফিট লম্বা লোকদের শ্রেণী'। যতোগুলো ছ-ফিট লম্বা লোক আছে সবাই এই শ্রেণীতে পড়বেন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে শ্রেণী গড়বার একটি নীতি থাকে এবং সেই নীতিটি উপস্থিত থাকলেই সমাহারটিকে আমরা শ্রেণী বলতে চাই। অথচ শ্রেণীতে কিন্তু ওই লোকদের পারস্পরিক কোনো সংযোগ নেই, তাদের পরিচিত না-হলেও চলে, ঐক্যের সূত্রটি না-জানলেও চলে। বাইরের সাধারণ হিসেবটা, যে ছ-ফিট লম্বা মাপ, একবার শুনে নিলেই আমরা একটি শ্রেণী তৈরি করতে পারবো। সমাজ কিন্তু এমন শ্রেণী নয়। কারণ, সমাজ বাইরের কোনো নীতির সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করা হচ্ছে না এবং যোগটাও পরস্পরের মধ্যে বাহ্য নয়। সমাজ নামক শ্রেণীভুক্ত মানুষরা নিজেদের মধ্যে এমন সম্পর্ক গড়ে যে তাদের বন্ধন মনের তলায় কাজ করে। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় সমাজকে ইচ্ছা মতো নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন ছ-ফিট লম্বা শ্রেণী, ছত্রিশ ইঞ্চি মোটা শ্রেণী, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ শ্রেণী ইত্যাদি, কিন্তু তার দ্বারা সমাজের মানসিক ঐক্য নষ্ট হয় না। মানসিক বন্ধনের কারণেই সমাজ একটি সম্পর্কিত স্থায়ী সংগঠন। মানসিক বন্ধনের পরিচয় মেলে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে। ব্যবহার বা আচরণ সমাজ সম্পর্ক ও আদর্শকে প্রকাশ করে। যখন 'ক'-র আচরণ 'খ'-কে প্রভাবান্বিত করে ও 'খ'-র ব্যবহার 'ক'-এর চরিত্র বদলায়, তখনই বুঝতে হবে সমাজের সম্পর্ক ব্যক্তিদের মনের গভীরে কাজ করে।

কোনো কোনো সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিত এই সম্পর্ককে 'আদান-প্রদান' বলেন। কিন্তু অন্য পণ্ডিতরা এই প্রত্যয়টি স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে নিশ্চয়ই সমাজ আদান-প্রদানের সম্পর্ক কিন্তু আদান-প্রদানে সহজ সরল একটি ভাবনা কাজ করছে। যেনো তুমি দিলে আর আমি নিলুম, আমি দিলুম আর তুমি নিলে। দেওয়া-নেওয়া বা আদান-প্রদানে সমাজ সংগঠনের অন্তর্নিহিত পরিবেশটি উপস্থিত নেই। সমাজে যে আমরা কেবল দিই বা নিই তা-নয়, আমরা প্রতিবার দেওয়া-নেওয়ায় জানি যে সম্পর্কের ফলে আমাদের আচরণ নানাভাবে বদলে যাচ্ছে, আমাদের চরিত্র আগেকার মতো স্থির ও অটুট থাকছে না। সুতরাং 'আদান-প্রদান' প্রত্যয়টি বড়ো সংকীর্ণ ও যান্ত্রিক। অধ্যাপক র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন এ-কারণে বলেন যে, সমাজ-সম্পর্কের পেছনে প্রতিদান পাবার মানসিক বাসনা

লুকিয়ে থাকে। এই বাসনা ও সম্পর্কটি কিন্তু কেবলমাত্র বর্তমান প্রসঙ্গ নয়, ভূত ভবিষ্যত ও বর্তমান জুড়ে চলে। ইংরেজ পণ্ডিত এডমণ্ড বর্ক চমৎকার বলেছিলেন যে সমাজ হলো 'a partnership not only between those who are living, but between those who are living, those who are dead, and those who are to be born.' যদি 'আদান-প্রদান' প্রত্যয়টিকে রক্ষা করি তবে মনে রাখতে হবে আদান-প্রদান বাইরের ঘটনা নয়, যারা আদান-প্রদান করে তাদের মনে পরস্পরের সঙ্গে 'জড়িয়ে আছি' (belonging to) এমন একটা বোধ ভিত্তি হিসেবে থাকে।

সমাজ যে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক, সম্পর্ক দুটি জীবন্ত মানুষের মধ্যে, সে-কথা বর্তমানের বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক মার্টিন বুবের চমৎকার বলেন তাঁর 'আই এণ্ড দাউ' গ্রন্থে। 'আমি ও তুমি' এই প্রত্যয়টির সাহায্যে মার্টিন বুবের সমাজ বিষয়ে তাঁর মৌলিক বক্তব্য উপস্থিত করেন যে, বর্তমান পৃথিবীতে 'আমি' একপ্রান্তে, 'তুমি' আর একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে সম্পর্কের সূত্রটি গেছে ছিঁড়ে। পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে অসংখ্য বিরোধ। অথচ সমাজ গড়ে 'আমি' ও 'তুমি'র পারস্পরিক স্বীকৃতিতে। এই 'স্বীকৃতিই' সমাজের ভিত্তি এবং তাকেই সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে আমরা সমর্থন করি। কারণ পৃথিবীতে শুধু 'আমি'র দল থাকলে তাদের পরিচয় কেউ জানতো না, তারা যে আদৌ আছে তারো প্রমাণ মিলতো না নিজের নিজের কাছে। 'তুমি'র দলের চোখেই 'আমি'দের স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতি দু-তরফা কারণ যে-আমি আর একজনের সঙ্গে, সেই আবার 'তুমি' হয়ে যাবে অন্যের সম্পর্কে। এই 'আমি-তুমি' সম্পর্ক জীবনের প্রতিটি স্তরকে ঘিরে থাকে, সঞ্জীবিত করে। কারণ মানুষ সহযোগী, অনুরক্ত বিশ্বের কল্পনা ছাড়া বাঁচতেই পারে না।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিত ফ্র্যাঙ্কলিন গিডিংস এডাম স্মিথ ও হর্বর্ট স্পেনসরের প্রভাবে ব্যাখ্যা করেন সমাজ হলো 'সদৃশ সচেতনতা' ('Consciousness of kind')। কিছুকাল পরে তিনি আচরণবাদের (Behaviourism) প্রভাবে প্রত্যয়টিকে অন্য ভাষায় প্রকাশ করেন, 'সদৃশ উদ্দীপকের সদৃশ প্রতিক্রিয়া' ('like response to like stimulus') ও 'বহু আচরণ' ('pluralistic behaviour')। গিডিংসের মনে স্পেনসরের বক্তব্য যেহেতু কাজ করেছে, তিনি ধরে নিয়েছেন যে

একই অবস্থায় মানুষেরা একই ভাবে গড়ে উঠবে এবং 'সদৃশমনা' (like-minded) হবে। এই সদৃশ আচরণের ধারণা থেকেই আসে 'সদৃশশ্রেণী' এবং এই শ্রেণীবোধের ফলে সাধারণ যূথবদ্ধতা ('gregariousness') বদলে নির্দিষ্ট সংগঠনের রূপ নেয়। তাঁর সংজ্ঞায় পাচ্ছি 'Society is a number of like-minded individuals, who know and enjoy this like-mindedness and are therefore able to work together for common ends.' গিডিংস বলছেন মানুষরা পরস্পরকে সদৃশমনা জেনে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করে। কিন্তু জানতে চাননি 'সদৃশমনা' প্রত্যয়টি মনে কেমন করে তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ তৈরি হবার আগে কি সমাজ থাকবে না? মানুষরা নিশ্চয়ই সদৃশমনা কিন্তু এই বোধটি জন্মাবার আগেই সমাজবদ্ধ অবস্থায় তারা 'আমি ও তুমি'র ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িত। তাছাড়া 'সদৃশমনা' বোধটি নিছক একটি মনের ঝোঁক মাত্র, এই প্রত্যয়ের সাহায্যে সম্পর্কের গভীরতা অনুধাবন করা যায় না। সদৃশমনা জানলেও পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ঐক্যবোধ মনে না-ও থাকতে পারে। হৃদয়ের গভীর সংযোগই উদ্দেশ্যের ঐক্য ও সহযোগী কর্মপ্রেরণা তৈরি হয়।

গিডিংস পরবর্তী সমাজবিদ অধ্যাপক ম্যাকাইভর ও পেজ একটু বিশদ করে সংজ্ঞা দেন 'Society is a system of usages and procedures, of authority and mutual aid, of many groupings and divisions, of controls of human behaviour and of liberties. This ever-changing, complex system we call society. It is the web of social relationships'. এই সংজ্ঞায় সমাজের বিভাগ ও কর্তব্যের পরিচয় আছে যে, সমাজ বিধিবদ্ধ নিয়ম, সমাজে কর্তৃত্ব থাকে, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও বিভাগ থাকে, সাহায্য-ব্যবস্থা থাকে, আচরণ-নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও স্বাধীনতার ব্যবস্থা থাকে। এককথায় অধ্যাপক ম্যাকাইভর ও পেজ সমাজের বিলি-বন্দোবস্ত ও কর্মের কথা ঘোষণা করছেন কিন্তু সমাজ-সম্পর্কের চরিত্রটি বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানাচ্ছেন না। সম্পর্কের উল্লেখ আছে কিন্তু সম্পর্কটি কেমন বলছেন না।

আমরা দার্শনিক মার্টিন বুবেরের আলোচনায় জেনেছি সমাজ হলো পারস্পরিক সম্পর্কের ফল, 'আমি-তুমি'র ঘনিষ্ঠ আদান-প্রদান ও স্বীকৃতির ফল। এই স্বীকৃতিতে শুধু কিছু একটা পাওয়া বা দেওয়ার কথাই থাকেনা, পুরো মানুষ হিসেবে তাকে গ্রহণ করবার কথা থাকে। সেই

ব্যক্তিটি যেমন জীবনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী নিজে কাজ করে, কল্পনার লক্ষ্যকে প্রকাশ করতে চায় তেমনি অন্যদেরও একইভাবে পরিপূর্ণ উদ্দেশ্যবান পুরুষ বলে ভাববে। জানতে হবে তাকে যে উদ্দেশ্যময় কর্মের আলোকে চরিত্র রূপ পায় এবং চরিত্র বিকাশের, পূর্ণতম হবার সমস্ত প্রয়াস সহযোগী পৃথিবীতেই একমাত্র সম্ভব। সহযোগিতায় প্রকাশ পায় সক্রিয় মমতা ও করুণা, প্রেম ও মৈত্রী। শুধুমাত্র উদ্দেশ্যসিদ্ধির ফিকির বা কৌশল নয়।

সুতরাং সমাজ বলতে আমরা বুঝবো মানুষের প্রাথমিক একটি সংগঠন যা উদ্দেশ্যময় কর্মের ভিত্তি, পারস্পরিক গভীর সম্পর্কের সহযোগী পৃথিবী; ব্যক্তির পরিপূর্ণতার লক্ষ্যকে যা নিজের ক্রম-উদ্‌বর্তিত উদ্দেশ্যর দ্বারা সঞ্জীবিত করে।

২। সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক (Relation between Society and Individual)

সমাজ বলতে আমরা ব্যক্তির সম্পর্ক বুঝেছি। ব্যক্তি ছাড়া যেমন সমাজ নেই, তেমনি সমাজ ছাড়াও মানুষ মনুষ্যত্বে পৌছাতে পারে না। মনুষ্যত্ব লাভ করলেই মানুষ ব্যক্তি হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে আমরা যে-কোনো লোককেই ব্যক্তি বলি। দর্শনে কিন্তু যে-কোন লোককেই ব্যক্তি বলা চলে না। ব্যক্তিত্বের কার্য-কারণ জানা দার্শনিকের কর্তব্য। ব্যক্তি-সত্তার প্রশ্ন তুলবার আগেই আমরা বারবার শুনে থাকি যে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কে নানা ভাঙাগড়া থাকে। কোনো কোনো সভ্যতায় সমাজের ওপর ঝোঁকটা বেশি, সমাজের মূল্যই ব্যক্তির মূল্যকে স্থির করে। সমাজ যেমন বলবে ব্যক্তিকে তেমনি চলতে হবে। এক-কথায় ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা ও সঙ্কল্পের দাবী অনেক কম। সমাজ-নির্দিষ্ট পথেই তাকে নিজের ভাগ্য গড়তে হয়। যেমন, সর্বগ্রাসী সমাজ-ব্যবস্থা বা সঞ্চালকতন্ত্র (Dictatorship)। সঞ্চালকতন্ত্রে নিছক ব্যক্তি বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বলতে কিছু থাকে না। কোনো কোনো সমাজব্যবস্থায় তেমনি ব্যক্তির ওপরেই ঝোঁকটা বেশি। ব্যক্তিকে সমাজের চাইতে প্রাধান্য দেওয়া হয়, যে-যার নিজের মতো জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সমাজের নামে তার দাবীকে খর্ব করা চলে না।

য়ুরোপে ও ভারতবর্ষে ইতিহাসের নানা পর্বে আমরা এই দুটি বক্তব্যকে বারবার দেখতে পাই। এই বক্তব্য দুটির সূত্রেই বোঝা যায় সমাজ ও

ব্যক্তিতে যতো গভীর সম্পর্কই থাক বিরোধও আছে। বিরোধ কখনো প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, কখনো চাপা থাকে। পৃথিবীতে ব্যক্তি ও সমাজের সঠিক সম্পর্ক বিষয়ে দুটি প্রধান মত আছে। সমষ্টিবাদ (collectivism) ও অন্যটি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism)। সমষ্টিবাদের নানা রূপ। যেমন, ভাববাদ, নানাধরণের সমাজতন্ত্রবাদ ও ফ্যাসীবাদ ইত্যাদি।

৩। **সমষ্টিবাদ (Collectivism) :** সমষ্টিবাদের প্রধান কথাই হলো সমাজের অগ্রাধিকার। সমাজ যদিও ব্যক্তিদের সমষ্টি তবু সমাজ গঠনের পর ব্যক্তিদের স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্ব ইচ্ছার পেছনে সমাজ নানাভাবে কাজ করে। সমাজের নিজস্ব বক্তব্য ও রূপ প্রতিটি ব্যক্তির মনের তলায় থাকে ও সেই বক্তব্য ব্যক্তির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। ব্যক্তি কখনোই তার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইচ্ছার দ্বারা চালিত হতে পারে না। প্রতিটি ব্যক্তিকেই অন্যের কথা ভেবে অন্যের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে চলতে হয়। কারণ আপাতদৃষ্টিতে যদিও ব্যক্তি তার নিজের নিজের পরিবার ইত্যাদি বিভিন্ন সংগঠনে থাকে তবুও তার ওপর অন্যান্য সংগঠন অর্থাৎ অন্যদের সংগঠন প্রভাব ফেলে। ব্যক্তিরা শুধুই নিরালম্ব শূন্যে বসবাস করে না। জানা-থাক বা না-থাক, তার জীবন অদৃশ্য সব বন্ধনে বাঁধা ; সেই সব বন্ধনের সম্পর্কেই তার জীবনযাত্রা নিয়ত পরিবর্তিত হয়, ভাঙে গড়ে। এই বন্ধন বা সম্পর্কগুলোকেই এককথায় 'সমাজ' বলা হয়। ব্যক্তির জীবনে দু'ভাবে আমরা সমাজের প্রকাশ দেখতে পাই। প্রথমত, একটি ব্যক্তির চারপাশে আরো অসংখ্য ব্যক্তি বসবাস করে। তাদের জীবনযাত্রা ও ভাবনাচিন্তা প্রতিটি ব্যক্তির কাজকর্মে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। কারণ, কোনো একটি ব্যক্তি দ্বীপের মতো অন্তহীন জলরাশির মধ্যে বাস করে না। প্রত্যেকেই প্রতিমুহূর্তে অন্যের সহযোগ বা বিরোধের টানে চলে। সহযোগিতায় সে সাড়া দেয় বন্ধুত্বে, মৈত্রীর প্রকাশে, প্রেমে। বিরোধে থাকে সংঘর্ষ, প্রতিবাদ ও যন্ত্রণা। সম্পূর্ণ একা বাঁচা মানুষের স্বভাববিরোধী। তাই সহযোগিতাই হোক আর বিরোধই হোক মানুষ কোনো-না-কোনো ভাবে পারস্পরিক ভিত্তি খোঁজে জীবনযাত্রার। তাছাড়া ইতিপূর্বেই আমরা জেনেছি একক একটি ব্যক্তিকে পৃথিবীতে কেউ কখনো দেখেনি। কমপক্ষে ইতিহাসে দুজন ব্যক্তি উপস্থিত থাকবেই। দ্বিতীয়ত, সময়ের হিসেব করলে দেখা যায় জীবন নিয়ত প্রবহমান। একটি ব্যক্তি নিশ্চয়ই ইতিহাসের নির্দিষ্ট কোনো পর্বে বাঁচে কিন্তু তার পেছনে থাকে অতীতের আরো

অনেক ব্যক্তি, তাদের জীবনযাত্রা ও ভাবনাচিন্তা। একটি পারিবারিক সংগঠনে যেমন বংশাবলীর ধারা কাজ করে, তেমনি বৃহত্তর অর্থে সমগ্র দেশেই অসংখ্য বিভিন্ন সংগঠন ইতিহাস জুড়ে কাজ করে। এক কথায় যাকে আমরা বলি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পরবর্তী প্রতিটি পরিবার ও প্রতিটি ব্যক্তিকে বিভিন্ন ছাচে তৈরি করে। এই ছাঁচের মধ্যে রূপ পায় বলেই আমরা সহজে ঘোষণা করতে পারি, 'ভারতীয় সংস্কৃতি', 'ফরাসী সংস্কৃতি' ইত্যাদি। ব্যক্তিরা যদি নিছক একক সত্তা হতো, যদি ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সম্পর্কের সূত্রে সমাজ না গড়তো, তবে আমরা বড়োজোর ব্যক্তির মতামত ও কার্যক্রম বলতে পারতাম, কিন্তু সংস্কৃতি শব্দটি উচ্চারণ করতে পারতাম না। সংস্কৃতি একদিকে যেমন ব্যক্তির, অন্যদিকে তেমনি সমগ্র সমাজের। ব্যক্তির সংস্কৃতি সমাজ-মানসের কথা জেনেই আত্মপ্রকাশ করে। উদাহরণত যেমন, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত মহত্ত্ব ও সিদ্ধি ভারতবর্ষের মহৎ সভ্যতার জলহাওয়াতে পুষ্ট হয়েছে।

একক ব্যক্তি নেই : জীবনের পরম্পরা

বিখ্যাত ইংরেজ মনীষী এডমণ্ড বর্ক (১৭২৯—১৭৯৭) তাঁর 'স্পিচেজ এণ্ড লেটর্স' সঙ্কলনে আমাদের এই বক্তব্যটিকে চমৎকারভাবে প্রকাশ করেন। বর্ক সমাজ ও ঐতিহ্যকে স্পষ্ট করবার জন্যে লেখেন 'A nation is an idea of continuity which extends in time as well as in numbers and in space. And this is a choice not of one day, or one set of people, not a tumultuary and giddy choice, it is a deliberate election of ages and generations; it is a constitution made by the peculiar circumstances, occasions, tempers, dispositions and morals, civil and social habitudes of the people which disclose themselves only in a long spell of time. It is a vestment which accommodates itself to the body.

এডমণ্ড বর্ক সমস্ত মানবগোষ্ঠীর ইতিহাসকে পরস্পর সম্পর্কিত বলছেন। সময়ের ধারায় তা রূপ পাচ্ছে, এবং সময়ের সূত্রেই পরিপূর্ণতা তৈরি হচ্ছে। জাতি বা মানবগোষ্ঠীর ধারণা তাই কোনো একটি নির্দিষ্ট কালেই সম্পূর্ণ নয়। কোনো একটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেই পরিণত হয়। সমাজের প্রবহমান সমগ্রতায় তাকে বুঝতে হয়। এই সূত্রেই বর্ক আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন সমষ্টিবাদের তাৎপর্য প্রকাশ করতে। ওঁর মতে কোনো একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর অভিব্যক্তির নিজস্ব ধারা থাকে। ওই ধারা নষ্ট হলে জন-গোষ্ঠীর চরিত্রই নষ্ট হয় বা তাকে তার মৃত্যু বলা চলতে পারে।

মানবগোষ্ঠী নির্দিষ্ট কালেই পূর্ণ নয় : তার অভিব্যক্তির নিজস্ব ধারা আছে

বর্ক বৃক্ষের উদাহরণ দিয়ে বোঝান। কোনো একটি বৃক্ষ, ধরা যাক বট, অন্য বৃক্ষের মতো কখনই নয়। তার নিজস্ব ইতিহাস ও চরিত্র আছে। বৃক্ষ-সংগঠন প্রণালীই ভিন্ন। বটের রূপ ও চরিত্র শিমুল বা অশত্থে মিলবে না। তেমনি তার ফল। এই চরিত্রের ধারাবাহিকতাতেই সেই জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিদের রূপ। ব্যক্তিদের হঠাৎ খেয়াল-খুশিতে কিছুই করবার অধিকার নেই।

এই বক্তব্যকেই স্যর হেনরী মেইন (১৮২২—১৮৮৮) অন্যভাবে উপস্থিত করেন তাঁর 'এনসেণ্ট ল' ও 'পপুলার গভর্ণমেণ্ট' গ্রন্থদ্বয়ে। আইনের উৎস আলোচনা কোরে স্যর হেনরী দেখা' যে আইন মোটেই রুশো বা বেণ্টামের তত্ত্ব অনুযায়ী তৈরি হয়নি। রুশো মনে করেছেন আইন হলো জনসাধারণের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প 'সাধারণ সঙ্কল্প', আর বেণ্টাম ভেবেছেন আইন হলো সর্বাধিক জনসাধারণের সর্বাধিক সুখ। মেইনের মতে যেমন রুশো আইনের চরিত্র বোঝেননি, তেমনি বেণ্টামও সম্পূর্ণ ভুল পথে চলেছেন। কারণ, আইন কেউ নিজের ইচ্ছেতে, কোনো কিছুই সঙ্কল্প করে তৈরি করে না। আইন কার্যত জনসাধারণের চরিত্র। যাদের আইন, তারা তাদের সমগ্র জীবনযাত্রার সত্য, রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদিকে আইনের মধ্যে প্রকাশ করে। সুতরাং এই আইনের যেমন ক্রম-বিবর্তিত রূপ থাকছে, তেমনি তা জনসাধারণের চরিত্রকে মূর্তি দিচ্ছে। ফরাসী পণ্ডিত স্যাভিনি (Savigny) এ-কথাই চমৎকার লেখেন 'Law is the organ of folk right: it moves and grows like every other expression of the life of the people: it is formed by custom and popular feeling, through the operation of silent forces and not by the arbitrary will of a legislature.'

হেনরী মেইন আইনের চরিত্রে এই প্রবহমানতা দেখান

বর্ক ও স্যর হেনরীর বক্তব্য থেকে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্ত করতে পারি। (১) সমাজের স্বকীয় একটি চরিত্র আছে। যদিও ব্যক্তিদের সমষ্টিই সমাজ, তবু কোনো ব্যক্তির চরিত্র দ্বারা সমাজ-চরিত্র গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত নয়। (২) সমাজের চরিত্রকে হঠাৎ ও কৃত্রিমভাবে বদলানো যায় না। যেমন সম্ভব নয় ব্যক্তির চরিত্র আকস্মিকভাবে ও কৃত্রিমভাবে বদলানো। আসলে বলা হচ্ছে, সমাজের স্বাভাবিক পরিণতি ও বিবর্তন আছে, এই বিবর্তনে সমাজের নিজস্ব স্বভাবটি প্রকাশ

(ক) সমাজের চরিত্র আছে

(খ) সমাজকে কৃত্রিম ভাবে বদলানো যায় না

পায়। ব্যক্তিরা সমাজের স্বভাব অনুযায়ী নিজেদের চরিত্রের মান ও লক্ষ্য লাভ করে।

সমষ্টিবাদের বক্তব্য বিশেষ সমর্থন পায় রুশোর 'সাধারণ সঙ্কল্প' তত্ত্বে। 'প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার' অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী বক্তব্যের বিরোধিতা করে রুশো প্রশ্ন তোলেন: কেমন করে একজন বা একদল সমগ্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব করবে? যেহেতু সে বা তারা কখনোই সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হতে পারেনা, সুতরাং প্রশ্ন উঠবে: কি ব কার প্রতিনিধিত্ব করা তার উচিত?' রুশো প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের বক্তব্য সম্পূর্ণ বর্জন করেন। ওঁর মতে ব্যক্তিত্ববাদের স্বাতন্ত্র্য মোটেই সত্য নয়। শেষ পর্যন্ত এমন কি লক ও মিল, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রধান দুই প্রবক্তা দার্শনিক, স্বীকার করতে বাধ্য হন যে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার কার্যত সবার প্রতিনিধি নয়, সংখ্যা গরিষ্ঠের প্রতিনিধি মাত্র। সুতরাং সমাজ ও সমাজ মন নামক একটি প্রত্যয় তাঁদের প্রায় স্বীকার করতেই হয়। নইলে সমাজ বা রাষ্ট্রের সংহতি লাভ করা যায় না। ব্যক্তির বদলে সমাজের গুরুত্ব প্রমাণিত হতে থাকে। সমষ্টিবাদের প্রধান সিদ্ধান্তাবলী তাই:

সাধারণ সঙ্কল্প সমষ্টিকে সমর্থন করে

(১) সমাজ প্রধান সংগঠন, ব্যক্তি সমাজ মনকেই প্রকাশ করে মাত্র,

(২) সমাজ ইতিহাসের ধারায় চলে। তার পরম্পরাগত রূপ আছে। ব্যক্তি কোনো একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তেই পূর্ণ হতে পারে না। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ছাচ তাকে গড়ে,

(৩) সমাজের একটি মন বা শুভাশুভের ধারণা আছে। এই ধারণা ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ সম্পাদন করে না। সমগ্র জন-গোষ্ঠীর জীবনকে উচিত কর্মে চালিত করে।

৩নং বক্তব্যটি সর্বাধিক সমর্থন পায় প্লেটো-এরিস্টটলের বক্তব্যে। প্লেটো দেখিয়েছিলেন সমস্ত জীবন একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে চলে। জীবনে কখনো তার ব্যতিক্রম নেই। পরিণতির পথে চলাই স্বভাবের প্রকাশ। বটবীজের পরিণতি বটবৃক্ষে। বটবীজটি অনিবার্যভাবেই বটবৃক্ষত্বের দিকে চলবে। যদি মধ্যপথে তার বিবর্তন বন্ধ হয়, তবে আমরা

বলবো বীজটি পরিণতি পেলোনা। কিন্তু বটবৃক্ষে পরিণত হওয়া ছাড়া বীজটির আর কোনো লক্ষ্য নেই। এই পরিণতির নাম এরিস্টটল দিয়েছেন 'টিলস'। 'টিলস'কে সমাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে ওঁরা দেখিয়েছেন যে মানুষ তার প্রকৃত স্বভাব লাভ করে সমাজে। বটবীজটি যেমন তার পরিণতির টান সত্ত্বেও পরিপূর্ণ বটবৃক্ষ হতে পারে না—যদি না তার অনুকূল পরিবেশ পায়, তেমনি মানুষও মানুষ নয় সমাজের অনুকূল পটভূমি ছাড়া। অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্কহীন অবস্থা প্লেটো-এরিস্টটলের মতে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। সমাজে বাস করে সে তার স্বাভাবিক পরিণতির কথা জানে, সমাজ-নির্দিষ্ট পথে, সমাজের কর্তব্য সম্পাদন করেই সে ক্রমশ নিজের সত্তার অর্থ বুঝতে থাকে। সমাজ তার পরিণতির পটভূমিকা জোগায় বলে একটি প্রশ্ন হতে পারে: 'তবে কি সমাজের কাজ শুধু ব্যক্তির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা?' এই প্রশ্নের জবাবে প্লেটো-এরিস্টটল ঘোষণা করেন যে, সমাজ শুধু জীবনরক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নয়। সমাজ 'শুভ' জীবনের স্রষ্টা। শুধু বাঁচাই নয়, ভালোভাবে বাঁচা।

সমাজ ও ব্যক্তিতে পরিণতির লক্ষ্য: সমাজ ব্যক্তিকে পরিণত করে

কিন্তু ভালোভাবে বাঁচার কল্পনা বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন হতে পারে। তেমনি আবার অনেকের সে-বিষয়ে কোনো কল্পনা না-ও থাকতে পারে। সুতরাং প্রশ্ন উঠবে 'শুভ' জীবনের কল্পনা বা রূপ কে গঠন করবে। ব্যক্তিরা? ব্যক্তিদের হাতে সে-ভার থাকতে পারে না; যেহেতু তাদের অনেক বক্তব্যই পরস্পর-বিরোধী। একমাত্র সমাজ প্রতিটি ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্যকে বুঝতে পারে। তার নিজের কোনো স্বার্থ নেই সুতরাং সবার মঙ্গলের কল্পনাই তার কল্পনা। ব্যক্তির চাইতে সমাজের গুরুত্ব তাই অনেক বেশি।

বিরোধী ধারণাকে সমাজ মেলায়

ভাববাদ (Idealism) ॥ সমষ্টিবাদের একটি শাখা হিসেবে ভাববাদ আদিতেই 'সমাজ-মন' ও 'সমাজ সত্তার' প্রসঙ্গ তোলে। এই সমাজ-মন ও সমাজ-সত্তা আবার পূর্ণের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১। **পূর্ণতাতত্ত্ব**—সমাজ যদিও ব্যক্তিদের সমষ্টি তবু সমাজ পূর্ণতার আদর্শ, ব্যক্তিরা তার অংশমাত্র। অংশ পূর্ণতার আভাস দিতে পারে কিন্তু পূর্ণতার স্বরূপ প্রকাশ করে না। বরং পূর্ণতার বোধ থেকেই অংশের তাৎপর্য বোঝা যায়। যেমন ধরা যাক, একটি সঙ্গীতের অংশ। এই

অংশটির নিজস্বগুণ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু একক অংশটি মোটেই পরিপূর্ণ সত্য প্রকাশ করে না। সমগ্র সঙ্গীতটির সঙ্গে যুক্ত হয়েই পরিপূর্ণ অর্থকে প্রকাশ করে। অথবা যেমন একটি বৃত্ত। পরিপূর্ণ বৃত্তটির সঙ্গে মিলিয়েই বিভিন্ন অংশের মূল্য। মহৎ জর্মান দার্শনিক হেগেল বলেন যে পূর্ণতার আদর্শ গোড়া থেকেই থাকে। ধরা যাক একজন ছুতোর। সে একটি চেয়ার বানাবে। চেয়ারটির সংগঠনে নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন অংশ ছুতোর তৈরি করে এবং জুড়ে জুড়েই সমগ্র চেয়ারটি বানায়। কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে ছুতোরের মনকে। সে মনে মনে একটি আদর্শ চেয়ারকে আগে থেকেই কল্পনা করতে পেরেছে এবং সেই কল্পনার ছক অনুযায়ী অংশগুলোকে জুড়ে চেয়ারটা গড়ে তুলছে। সুতরাং হেগেল বলছেন—যে-কোনো কর্মের পেছনেই একটি পূর্ণতার আদর্শ কাজ করে। পূর্ণতা বাদ দিলে মানুষের জীবন থেকে অনুগমনের লক্ষ্য, জীবনকে গড়ে তুলবার আদর্শই মুছে যায়। প্লেটো এই আদর্শ ও পূর্ণতার কথা জানিয়েছিলেন তাঁর 'ভাব' তত্ত্বে। ওঁর মতে সমস্ত পৃথক বস্তুরই ভাবরূপ থাকে এবং এই ভাবরূপটিকে অনুসরণ করাই বস্তুর কাজ। প্রতিটি চেয়ারের ভাবরূপ গোড়া থেকেই আছে। কারিগর তার কল্পনায় চেয়ারটির ছবি তৈরি করে ভাবরূপের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করেন। যতো মেলে ততোই বাস্তব চেয়ারটি প্রকৃত চেয়ার হয়ে ওঠে। দার্শনিক তাৎপর্য ছাড়াই প্লেটো ও হেগেলের এই বক্তব্যকে বুঝতে হবে এই অর্থে যে, যে-কোনো সৃষ্টির পেছনে স্রষ্টার মনে একটি আদর্শের রূপ থাকে, যা তিনি কল্পনায় গড়েন। প্রকৃতি সৃষ্টির পরিচয় অন্যদের কাছে নিশ্চয়ই তাঁর কল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে নয়—এমনিতেই, সৃষ্টবস্তুর নিজস্ব পরিচয়ে। তবু একটু ভাবলেই ধরা পড়বে যে, স্রষ্টারও নিজস্ব কল্পনা আছে। সে যখন চেয়ারটার ভালোমন্দ বলবে, সে বলবে তার মনের আদর্শরূপটির সঙ্গে মিলিয়ে। সুতরাং পূর্ণতার আদর্শ ছাড়া অংশকে কখনোই প্রকৃত তাৎপর্যে বোঝা যায় না। সমাজ তেমনি একটি পূর্ণতার আদর্শ এবং ব্যক্তি নিছক তার অংশ মাত্র। কাজেই ব্যক্তির প্রকৃত অর্থ একমাত্র সমাজের সঙ্গে মিলিয়েই সম্ভব।

অংশের তাৎপর্য সমগ্রের সঙ্গে মিলিয়ে, পৃথক অংশ অর্থহীন

২। **সামাজিক সততা তত্ত্ব**—হেগেল তাঁর সমাজ ও রাষ্ট্র বিষয়ক প্রধান বক্তব্য গড়েছেন সামাজিক সততা তত্ত্বের উপর। কান্টের সমালোচনা করে হেগেল জানান যে, কান্ট ব্যক্তিকে অন্যান্য ব্যক্তির সম্পর্ক

বিচ্যুত করে আলোচনা করেছেন। শুধুমাত্র তাদের 'শুভ ইচ্ছা'র কথা বলছেন কিন্তু কর্মের কথা বলছেন না। কর্মের কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ কর্মের সূত্রেই পারস্পরিক সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। কেবলমাত্র 'শুভ ইচ্ছা'র কল্পনায় অন্য ব্যক্তির প্রসঙ্গ থাকে না। ব্যক্তিদের কর্মকে বুঝবার জন্যে প্রয়োজন সমাজের সততাতত্ত্ব (Social Righteousness)। এই তত্ত্বেই ব্যক্তিদের পৃথক পৃথক ইচ্ছার আড়ালে সমাজ-মনটির পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজ অধ্যাপক আর্নেষ্ট বর্কার এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, 'Social righteousness is a spirit and habit of life expressed in social opinion and enforced by the social conscience of a free people; it is at one and the same time a mind or self-consciousness, because it is a spirit, and a thing or external existence, because it is a visible system of habit and conduct. By it our relations to one another are controlled; and since our relations flow from our position or station in the community—or rather, since the sum of the relations in which we stand constitutes our position or station—we may say that it controls our position or station.' অর্থাৎ সামাজিক সততাকে একটি মন বা সচেতনতা বলা যেতে পারে। এই সততার বাহ্য অস্তিত্ব আছে। আমাদের জীবন নানা কর্ম ও ভাবনায় গড়ে ওঠে। এই কর্ম ও ভাবনা শুধু আমার নিজের সৃষ্টি নয়। একটা ধারা পাই ঐতিহ্য থেকে, আর একটা সমসাময়িক জীবনযাত্রায় অন্যের সঙ্গে সম্পর্কে। এই দুটি ধারার টানা-পোড়েনে আমাদের জীবন রূপ নেয়। ঐতিহ্যের অংশে সমাজের বক্তব্য প্রত্যক্ষত উপস্থিত থাকে সমাজ-মন হিসেবে। আমরা সহজে তাকে এড়িয়ে কাজ করতে পারিনা। প্রতি পদেই তার সমর্থন ও বিধি-নিষেধ উপস্থিত থাকে। সমসাময়িক পর্যায়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কও প্রায় বাহ্যরূপ পায়। কারণ প্রতিটি সম্পর্কই যেনো প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থেকে আমাদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে।

রাষ্ট্রই একমাত্র সৎ। রাষ্ট্র সবার স্বার্থরক্ষা করে, সৎ সঙ্কল্প প্রকাশ করে

সততার প্রকাশ সমাজ-মনে: ঐতিহ্য

সামাজিক সততা মনের ভেতর ও বাইরে কাজ করে। বাহ্যরূপের কথা ওপরে বলা হলো, ভেতরের পরিচয় আমাদের মনে। আমরা নিজেরাই নানা বিশ্বাসের খুঁটিতে বাঁধা থাকি।

৩। **রাষ্ট্র বা সমাজের সত্তা** –হেগেল বলছেন রাষ্ট্র বা সমাজের একটি নিজস্ব সত্তা আছে। সমাজের এই সত্তা ব্যক্তির সত্তাতেই প্রতিফলিত ও প্রকাশিত হয়। ব্যক্তি সমাজের সত্তা থেকেই তার ব্যক্তিগত সত্তার পরিচয় পায়। সমাজের সত্তার পরিচয় কোনো একটি ব্যক্তির সত্তাতে নেই, সব ব্যক্তির সত্তাতেই আছে। তাই কোনো একটি ব্যক্তি কেবলমাত্র তার অভিব্যক্তি দিয়ে সমাজকে প্রকাশ করতে পারে না। সে সম্পূর্ণ নিজের মতো চললে অন্যান্য ব্যক্তিদের জীবনে প্রকাশিত সমাজের সত্তা তাকে বাধা দেয়, তার জীবন ও চরিত্রকে সমাজের ধারায় গড়বার চেষ্টা করে। হেগেল যেমন লেখেন, 'The spirit of a nation (which is a spirit of social righteousness) controls and entirely dominates from within each person'। কোনো একটি ব্যক্তি সমাজের আদর্শকে সম্পূর্ণ বুঝতে না-ও পারতে পারে, কারণ সমাজ শুধুমাত্র তার মঙ্গলের কথাই ভাবছে না। সমাজ সবার কথা ভাবছে। যে-মঙ্গলের আদর্শে সবার কথা থাকে, সমাজ সেই আদর্শকে প্রতিটির কাছে উপস্থিত করে। ব্যক্তিরা সেই মতো নিজের নিজের জীবনকে গড়ে। এই জন্যই ইংরেজ দার্শনিক ভাববাদী এফ. এইচ. ব্র্যাডলী লেখেন, 'What we call an individual man is what he is because of and by virtue of community, and communities are not mere names, but something real.'

> সমাজের সত্তা একটি ব্যক্তিতে নেই সব ব্যক্তিতেই আছে

পরিবারে যেমন কোনো একজন ব্যক্তির ভাবনা-চিন্তা সম্পূর্ণই তার নিজের নয়। তার ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যান্য লোকদের প্রভাব থাকে। তাদের বক্তব্য হয় সে গ্রহণ করে, অথবা করে না। গ্রহণ করুক বা না করুক, প্রতি পদক্ষেপেই সে তাদের মতামতের সঙ্গে সহযোগিতা অথবা বিরোধিতা করে। সহযোগিতা ও বিরোধের মধ্য দিয়ে তার নিজের চরিত্র ও ভাবধারা গড়ে ওঠে। সুতরাং ওই ব্যক্তিটির ওপর পরিবার নামক একটি সমাজ-সংগঠনের সত্তা প্রতিনিয়ত ছাপ ফেলতে থাকে। অন্যান্য ব্যক্তিদের বক্তব্য তেমনি পূর্ববর্তী আরো অনেকের ভাবনা-চিন্তার দ্বারা গঠিত। পরম্পরায় তাই পরিবার তার নিজস্ব সত্তা নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তির জীবনে উপস্থিত থাকে। তার সত্তাকে অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই।

> পরিবারের চিন্তা যেমন একজনার নয়

উনিশ শতকের উপযোগিতাবাদীরা দেখাতে চেয়েছিলেন যে, সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও কর্মের ফলেই সামাজিক মঙ্গল তৈরী হয় এবং তাদের সমষ্টিকেই আমরা সমাজ বলি। কিন্তু ভাববাদীরা, যেমন রুশো, প্রমাণ করেন যে, প্রতিটি ব্যক্তির স্বতন্ত্র ইচ্ছার যোগফলে সমাজমঙ্গল গড়তে পারে না। কারণ প্রতিটি ইচ্ছার সমধর্মিতা না-থাকলে সমষ্টিবাচক পদটি আমরা পাই না। সাধারণভাবেই বোঝা যায় যে, ইচ্ছার মধ্যে নানা ফারাক থাকে এবং এই ফারাকের ফলে সামাজিক কোনো আদর্শ প্রস্তুত হয় না। কোঁৎ, বেণ্টাম ও মিলকে বরং 'উপযোগিতা' নামক তত্ত্ব তৈরী করে সমাজ-মন ও সমাজ-লক্ষ্যকে বোঝাতে হয়। সমাজে স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা যোগ দিলেই 'উপযোগিতা' তত্ত্বটি আসে না। যদি মিলদের গোড়া থেকেই এমন একটি তত্ত্ব প্রস্তুত করতে হয় তবে সমাজ সত্তা না মেনে উপায় নেই। সমাজ-সত্তা মানলেই তাঁরা বলতে পারেন যে উপযোগিতাই ব্যক্তিদের আলোচ্য ও লক্ষ্য।

উপযোগিতাবাদ: ব্যক্তিদের ইচ্ছা পৃথক, সমাজসত্তা অর্থহীন

৪। **সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism)**—সমাজতন্ত্রবাদ ভাববাদের সন্তান হওয়ায় সমাজের কথাই সমাজতন্ত্রবাদেও মুখ্য। সমাজতন্ত্র অর্থাৎ যে তন্ত্রে সমাজই প্রধান। সমাজের নির্ধারণেই ব্যক্তির জীবন ও লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়। ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছায়, কল্পনা ও কর্মে সমাজের অকথিত লক্ষ্যই সর্বত্র পরিস্ফুট হয়।

সমাজতন্ত্রবাদের সূত্রপাত প্লেটোর 'রিপাবলিক' গ্রন্থের 'সাম্যবাদী' বক্তব্যে। প্লেটোর মতে সমাজে বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা জন্মায় ব্যক্তির নিছক ব্যক্তিগত বোধ ও মমতা থেকে। ব্যক্তিরা নিজের নিজের সম্পত্তি ও পরিবার বিষয়ে মাথা ঘামায় বলেই তারা সমগ্র সমাজের কল্যাণ বিষয়ে নিশ্চুপ থাকে। এই অবস্থা দূর করতে হলে ব্যক্তিগত মালিকানা বন্ধ করতে হবে। প্লেটো-পরবর্তী পণ্ডিতরা যেমন ওএন, ফুরিঅর, সাঁৎ সিমোঁ ও কার্ল মার্কস, প্লেটোর অনুসরণে তাঁদের আদর্শ সমাজটি গড়তে চান। বর্তমানকালে কার্ল মার্কসের সঙ্গেই 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ' শব্দটি জড়িত।

প্লেটো: ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে সমাজে বিরোধের উৎস

কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস উনিশ শতকের য়ুরোপে ইতিহাস আলোচনা করে দেখান যে, জীবনের সমস্ত বিশৃঙ্খলা ও অন্যায়ের সূত্রপাত ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে জড়িত। ইতিহাসের গোড়ায় গোষ্ঠীজীবনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিলো না। তখন মানুষ পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতায় জীবনযাপন করেছে। কিন্তু কালক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হলে সমাজ পরস্পরবিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়—যে-শ্রেণীর আছে ও যে-শ্রেণীর নেই। সামাজিকভাবে থাকা বা না থাকা, মার্কসের মতে বোঝা যায় উৎপাদনযন্ত্রের মালিকানা দিয়ে। অর্থাৎ কারা সামাজিক উৎপাদনগুলোর নিয়ন্তা। উৎপাদনযন্ত্রের অধিকার যাদের হাতে তারাই সমাজকে পরিচালন করে। কারণ তাদের হাতেই জীবন মরণের ভার। উৎপাদনযন্ত্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করে তারা যদিও কর্তৃত্ব পেয়েছেন সমাজের, তবু কার্যত উৎপাদনযন্ত্রের মালিকানা সবার, কারণ উৎপাদনযন্ত্রগুলো সমাজের। শুধু তাই নয়, উৎপাদন-যন্ত্রগুলো ব্যবহার করে যারা বস্তু উৎপাদন করেন তারাই আসলে শ্রম দান করছে। তাদের অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষের পরিশ্রমজাত দ্রব্যে সমাজ নির্ভর করছে কিন্তু তার প্রধান ফল ভোগ করছে মুষ্টিমেয় লোক বা এমন একটি শ্রেণী যাদের হাতে আছে উৎপাদনযন্ত্রগুলো। মার্কস তাই ঘোষণা করেন যে, উৎপাদনযন্ত্রগুলো এই শ্রেণীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে এসে সমগ্র সমাজের হাতে দিতে হবে। তবেই সমাজ ও মানুষের মঙ্গল। উৎপাদনযন্ত্রগুলোর সামাজিক মালিকানা ও সামাজিক ফলভোগই সমাজতন্ত্র।

মার্কস-এঙ্গেলস : ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্য শ্রেণী, শ্রেণীই সমাজ-কর্ণধার

এই বক্তব্যের সূত্রেই মার্কস আরো দেখান সমাজ কেমন করে মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ওঁর মতে উৎপাদন ব্যবস্থায় জড়িত হয়ে মানুষ এমন কতোগুলো সম্পর্ক ও নিয়মের জন্ম দেয়, যা আর ব্যক্তিদের হাতে থাকে না। ওই নিয়মই তাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন। 'ক্রিটিক অব পলিটিকাল ইকোনমি'র ভূমিকায় তিনি লেখেন, মানুষের অস্তিত্বই তার সত্তাকে নির্ধারণ করে, সত্তা অস্তিত্বকে নির্ধারণ করেনা। সত্তা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন মানুষের মানস-জগত। আর অস্তিত্ব হলো দৈনন্দিন জীবনের বাঁচামরা অর্থাৎ সে যা উৎপাদন করে ও যেমনভাবে উৎপাদন করে। চিন্তার দ্বারা মানুষ এই উৎপাদনের নিয়মকে বদলাতে পারে না। বরং

সমাজের নিয়ম মানুষ বদলাতে পারে না

নিয়ম অনুযায়ী তাকে জীবনের রূপ দিতে হয়। মার্কসের উদাহরণে যেমন আমরা জানি যে, অনেকেই আমরা মনে মনে ধনতন্ত্রবাদ দূর করে সর্বমানবের কল্যাণ চাই কিন্তু শুধু চিন্তার দ্বারা তা কখনোই সফল করা সম্ভব নয়। খৃষ্ট যেমন পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য কল্পনা করেছিলেন কিন্তু শুধুমাত্র ওঁর এবং ওঁর শিষ্যবর্গের চিন্তায় তা আজো সম্ভব হয়নি। তার জন্যে প্রয়োজন সামাজিক কর্ম। এই সামাজিক কর্মের অর্থ প্রাক্তন ও প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা। যতোদিন না এই ব্যবস্থাকে ভেঙে অন্য ব্যবস্থা ও অন্য নিয়ম চালু করা যাচ্ছে ততোদিন আমাদের জীবন এই নিয়মগুলোই নিয়ন্ত্রণ করবে।

'দ্যস ক্যাপিটল' গ্রন্থে মার্কস সারাসরি লিখেছেন 'Technology discloses man's mode of dealing with Nature, the process of production by which he sustains his life, and thereby also lay bare the mode of formation of his social relations, and of the mental conceptions that flow from them.' মার্কসের সমাজতান্ত্রিক বক্তব্য থেকে জানছি যে, মানুষ একা মানুষ হয়নি, সংঘবদ্ধভাবে প্রকৃতি থেকে আদায় করেই মানুষ হয়েছে। প্রকৃতি থেকে আহরণের কেন্দ্র হলো তার উৎপাদন-ব্যবস্থা। প্রত্যেক উৎপাদন-ব্যবস্থার নিজস্ব নিয়ম থাকে। এই নিয়মের বাইরে যাবার কোনো উপায় ব্যক্তিদের হাতে নেই। স্বতন্ত্রভাবে তারা নিয়মের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না। যেমন মার্কসের উদাহরণে আমরা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার কথা জানি। এই ব্যবস্থায় উৎপাদন যন্ত্রগুলোর মালিকানা আছে একটি শ্রেণীর হাতে। আমরা চাই-বা-না-চাই, সমাজ এই ব্যবস্থার নিয়মে চলে। লাভের জন্য এই উৎপাদন ব্যবস্থা। আমরা সবাই সামাজিক উৎপাদনের অংশীদার, কিন্তু ফলভোগ সমানভাবে করি না। উৎপাদনের সঙ্গে প্রধানত জড়িত শ্রমিক ও মালিকরা। বাকী সবাই পরোক্ষভাবে জড়িত। যতোদিন লাভের ওপর উৎপাদন সংগঠিত থাকবে ততোদিন শ্রমিক-মালিক ভাগ সমাজে থাকতে বাধ্য এবং সমাজে বিরোধ ও হিংসা অনিবার্য। এই ব্যবস্থার সঙ্গেই সবার মানসিকতা জড়িত। একদল এই ব্যবস্থা টেঁকাবার জন্য গল্প গান কবিতা ছবি তৈরি করবে, আর একদল এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘোষণা করবে অন্য ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব। সুতরাং বিরোধ বা সহযোগিতা, যে-কোনো প্রকারেই হোক, সবাই এই ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত।

উৎপাদন যন্ত্রের পরিবর্তনে মানুষের বিবর্তন

ব্যক্তির স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব ও ইচ্ছা সমাজে থাকছে না। ব্যক্তি একমাত্র সেই নিয়ম জেনে নিজের ভাগ্যকে স্থির করতে পারে এবং সেটাই তার স্বাধীনতা।

৫। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রধান কথা ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাধিকার। ব্যক্তি ছাড়া সমাজে আর কিছু নেই। ব্যক্তিদের স্বকীয় চিন্তা-ভাবনা ও জীবনযাত্রাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। সমাজ একটি বিমূর্ত প্রত্যয় মাত্র, একমাত্র প্রত্যক্ষ হলো ব্যক্তি। ব্যক্তির জীবনকে সামগ্রিকভাবে সমাজ নামে অভিহিত করা হয়। তাছাড়া সমাজের আর কোনো অর্থ ও তাৎপর্য নেই।

ব্যক্তিই সমাজের কেন্দ্র

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রথম য়ুরোপীয় উদ্গাতা হলেন গ্রীসের সোফীবাদীরা এবং প্রধানতই প্রোটাগোরাস। প্রোটাগোরাস ঘোষণা করেছিলেন 'Man is the measure of all things' মানুষই সব, মানুষের বাইরে অন্য সত্য বলে আর কিছুই নেই। মানুষেরা আবার নিছক সমাজ-যন্ত্রটির অংশ নয়। তারা স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং স্বাধীন। নিজের নিজের একক সত্তায় তাদের পরিচয়। কোনো নিয়ম, গড্ডলিকা কোনো হিসেব বা কোনো প্রচলিত বিধির মাপে ব্যক্তিকে মাপা চলবে না। ব্যক্তিই জীবন ও সমাজের কেন্দ্র। সমাজ নামে কিছু নেই, ব্যক্তির জীবন থেকেই নানা সম্পর্কের সূত্রপাত। এই সম্পর্কগুলো ব্যক্তিই স্বাধীন ইচ্ছায় ভাঙে-গড়ে। সুতরাং ব্যক্তির ওপর নিয়মগুলোর কোনো মৌলিক জোর নেই। প্রোটাগোরাসের এই ঘোষণা ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের দার্শনিকরা নানাভাবে উপস্থিত করেন।

প্রোটাগোরাস: মানুষ সব কিছুর মাপ

বেন্টাম, মিল, কবডেন, ব্রাইট, পেইন, দিদেরো ইত্যাদির বক্তব্যের পেছনে শুধু প্রোটাগোরসই থাকেন না, সমগ্র এথেন্স নগর-রাষ্ট্রের ছবিটি থাকে। আর থাকে থুকিডিডিস উল্লিখিত পেরিক্লিসের বিখ্যাত ভাষণটি।

টম পেইন তাঁর 'রাইট্‌স অব ম্যান' গ্রন্থে ঘোষণা করেন যে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ 'free and equal in respect of their rights' মানুষের সর্ববিধ অধিকার স্বভাবজ, তা প্রকৃতির দান। সুতরাং প্রতিটি ব্যক্তির অধিকার

সমান। সুতরাং প্রত্যেক সমাজব্যবস্থার লক্ষ্য হবে "The end of all political association is the preservation of the natural and imprescriptible rights of man; and these rights are liberty, property, security and resistance of oppression." কার্যত ব্যক্তির সর্বাধিক অধিকার রক্ষা করাই সমাজের কর্তব্য। সমাজের লক্ষ্য সাধন করাই ব্যক্তির উদ্দেশ্য নয়। সমাজ অধিকার রক্ষা করতে বাধ্য—কারণ ব্যক্তিই সমাজের স্রষ্টা এবং ব্যক্তির অধিকার ব্যক্তির নিজস্ব ও জন্মগত। পেইনের প্রভাবেই ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে 'আমেরিকান ডেক্লারেশন অব ইনডিপেনডেন্স'-এ লেখা হয় 'every civil right has for its foundation some natural right pre-existing in the individual' ভাববাদীরা বলতে চেয়েছেন যে ব্যক্তির অধিকার জন্মায় সমাজে এবং সমাজ সচেতন ভাবে তাকে তা দেয়। আর পেইন বলছেন সামাজিক অধিকার আসলে ব্যক্তির মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি। ব্যক্তি আছে বলেই সমাজ এবং ব্যক্তির অধিকার সত্য বলেই সমাজের অধিকার সত্য। সুতরাং যা-কিছু ব্যক্তির নিজস্ব, তাই মহামূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। পেইনের প্রভাবেই ফরাসী বিপ্লবে ঘোষিত হয় 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি' 'an inviolable and sacred right'.

পেইন: অধিকার প্রকৃতির দান

জেরেমি বেন্টাম অবশ্য পেইনের 'স্বাভাবিক অধিকার'তত্ত্ব সমর্থন করেন নি। তবু তিনি সমাজে ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করবার জন্য কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রথমত, সর্বজনীন ভোটাধিকার চাই। কারণ রাষ্ট্রসংগঠনে নিজের প্রাথমিক অধিকার স্বীকৃত হয় নির্বাচনের ক্ষমতায়। ব্যক্তির প্রাথমিক দাবী তাই নিজের মনোমত শাসকগোষ্ঠী বেছে নেবার। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক বছর শাসন বিভাগীয় সংস্থাটির পুনর্নির্বাচন চাই কারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকলে বোঝা যাবে সত্যিই সংস্থার সভ্যরা জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করে কিনা। তৃতীয়ত, পার্লামেন্টকে প্রতিনিধিদের সভা না-বলে ডেলিগেটদের সভা বলা উচিত। কারণ প্রতিনিধিরা মনে করতে পারে যে, যেহেতু তারা একবছরের মতো নিশ্চিন্ত সুতরাং তাদের নিজের মতো চলতে বাধা কি। ডেলিগেটদের

বেন্টাম:
(ক) সর্বজনীন ভোটাধিকার

(খ) শাসন বিভাগের বাৎসরিক নির্বাচন
(গ) পার্লামেন্ট ডেলিগেটদের সভা

তা সম্ভব নয়। কারণ, তারা বিশেষ প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে মাত্র।

বেন্টামের তিনটি প্রস্তাব থেকে ব্যক্তির স্বাধীনতা বিষয়ে তাঁর মনোভাবটি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু বেন্টামের শিষ্য জেমস মিলের পুত্র জন স্টুঅর্ট মিলই বেন্টামের স্বাধীনতার বক্তব্যকে স্পষ্ট রূপ দেন। 'এসে অন্ লিবর্টি' গ্রন্থে মিল ব্যক্তি-স্বাধীনতার সূত্রেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের মূল প্রস্তাবনা রাখেন। গ্রন্থটির একটি অংশ চিন্তার স্বাধীনতা বিষয়ে আলোচনায় ভরপুর। মিল বলেন যে, যদি আমরা ধরে নিই সমাজ এগোয়, উদ্বর্তিত হয়, তবে সেই সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির চিন্তাব স্বাধীনতা আবশ্যিক। অথচ আমরা দেখেছি যে, কর্তৃত্ব (authority) সমস্ত ক্ষেত্রেই তাদের উচ্ছেদ করতে ব্যস্ত যারা ক্ষমতার ভিত্তিতে আঘাত দেয়। মিল চিন্তার স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে কয়েকটি প্রস্তাব দেন। মিল দেখান যে-কোনো নতুন বক্তব্যই হয় সত্য অথবা মিথ্যে—আংশিক ভাবে সত্য অথবা আংশিকভাবে মিথ্যে। কিন্তু কতৃত্ব এই বক্তব্যকে অস্বীকার কবে নানা কৌশলে। প্রথমত, গোড়ায় বোঝা যায় না বক্তব্যটি ভুল কি ঠিক। আমাদের ভুল মনে হয়েছে সুতরাং অন্যায়। দ্বিতীয়ত, যাকে অন্যায় মনে করা হচ্ছে তাব বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নেবার অধিকার আমাদের আছে। তৃতীয়ত, আমরা বিচারে কখনো কখনো ভুল করতে পারি, কিন্তু মানুষ মাত্রেই ভুল করে। সুতরাং কোনো ভুল সম্ভবপর বলেই আমাদের ক্ষমতা নষ্ট হয়না। চতুর্থত, কর্তৃত্বের আনুগত্য মানা আমাদের কর্তব্য। ভুল ভাবলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আমরা বাধ্য। এই বক্তব্য ভাববাদী প্রত্যয় থেকে তৈরি করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে মিলের জবাব হলো 'There is the greatest difference between presuming an opinion to be true because, with every opportunity for contesting it, it has not been refuted, and assuming its truth for the purpose of not permitting its refutation. Complete liberty of contradicting and disproving our opinion is the very condition which justifies us in assuming its truth for purposes of action ; and on no other terms can a being with human faculties have any rational assurance of being right.'

মিল : সমাজ প্রগতির জন্য চিন্তার স্বাধীনতা

মিল বলতে চাচ্ছেন, যে-কোনো বক্তব্যকে যে-কেউ সত্য বা মিথ্যা মনে করতে পারেন কিন্তু আমার মতটিই একমাত্র সত্য বলবার অধিকার আমাদের নেই। প্রতিবাদের স্বাধীনতা থাকলেই মতটির বিচার সম্ভব। যদি নতুন বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ই ভুল হয় তবু তাকে বন্ধ করে দেবার অধিকার কারো নেই। কারণ, বর্তমানে যা ভুল বলে মনে করা হচ্ছে পরে তা সত্য বলে গৃহীত হতে পারে। সুতরাং পৃথিবীতে যদি একটিমাত্র ব্যক্তিও প্রতিবাদ করে তবে তার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকা উচিত।

প্রতিবাদের স্বাধীনতাতেই সত্য-মিথ্যার বিচার

রুশো তাঁর 'সাধারণ সঙ্কল্প' তত্ত্বে একটি প্রস্তাব দেন যে সংখ্যা-লঘিষ্ঠকে, দরকার হলে, জবরদস্তিতে সংখ্যাধিক্যের মত মানাতে হবে। রুশোর বক্তব্যে যদিও সামাজিক মঙ্গলের কথাই থাকছে তবু বক্তব্যটি মারাত্মক। এই বক্তব্যের সূত্রেই কর্তৃত্বের অপব্যবহার শুরু হয়। মিল রুশোর বিরুদ্ধে স্পষ্টই ঘোষণা করছেন 'If all mankind minus one were of one opinion, and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person, then he, if he had the power, would be justified in silencing mankind.'

রুশোর জবরদস্তির প্রস্তাব

ভাববাদীরা বলেন যে, ব্যক্তি বহু ক্ষেত্রেই তার মঙ্গল জানেনা। সুতরাং তার মঙ্গলের জন্য সমাজ তাকে চালাবে। আবার কখনো কখনো ব্যক্তি সমাজ-মঙ্গলের বিরুদ্ধে যায়, সুতরাং সমাজ তাকে বৃহত্তম আদর্শের জন্য শাসন করবে। এই বক্তব্যের প্রধান ঝোঁক হলো একটি ফর্ম বানাবার দিকে অর্থাৎ সবাই একইভাবে চলবে। মিল এর বিরুদ্ধে জানান যে, বৈচিত্র্য সর্বাধিক মূল্যবান। বৈচিত্র্য ব্যতিরেকে জীবনের কোন মূল্য নেই, যেহেতু সবকিছুই এক হলে একটিমাত্র জীবনই আমরা পেতাম। পৃথক সত্তার প্রশ্ন উঠতো না।

ভাববাদীরা বলে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা জানে না। মিল বলেন ঐক্য নয় বৈচিত্র্যই লক্ষ্য

মিল লিখছেন, 'Such are the differences among human beings in their sources of pleasure, their susceptibilites of pain, and the operation on them of different physical and moral agencies, that unless there is a corresponding diversity in their modes

of life, they neither obtain their fair share of happiness, nor grow up to the mental, moral and aesthetic stature of which they are capable' অর্থাৎ বৈচিত্র্য প্রকৃতিরই ইচ্ছা। বৈচিত্র্য সমর্থিত হলেই বলতে হবে বৈচিত্র্যের সঙ্গে স্বাধীনতা জড়িত; যেহেতু স্বাধীনতাতেই বৈচিত্র্যের ভিত্তি। স্পষ্টভাষায় মিল তাই ঘোষণা করেন 'it is not by wearing down into uniformity all that is individual in themselves, but by cultivating it and calling it forth, within the limits imposed by the rights and interests of others, that human beings become a noble and beautiful object of contemplation; and as the words partake the character of those who do them, by the same process human life also becomes rich, diversified, and animating, furnishing more abundant aliments to high thoughts and elevating feelings, and strengthening the tie which binds every individual to the race, by making the race infinitely better worth belonging to.'

ভাববাদীদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীরা আর একটি কথা বলেন যে ব্যক্তির মঙ্গলের ভার তার নিজস্ব। সে যদি বিপথেও চলে তবু তার বিরুদ্ধে কারো কোনো অধিকার নেই। কারণ, ব্যক্তি নিজেই যদি সত্য মিথ্যার তফাৎ না-বোঝে, যদি ন্যায় অন্যায় বিষয়ে অবহিত না-হয়, তবে অন্যের তাঁবেতে সে বড়োজোর একটি দাবার বোড়ে অথবা পুতুল নাচের পুতুল হতে পারে, কিন্তু বিচারবুদ্ধিশীল সচেতন মানুষ হতে পারে না। ভাববাদ মানুষকে পুতুল বানাতে চায় আর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ তাকে যা-খুশি হবার সম্পূর্ণ অধিকার দেয়। মানুষকে ভুল করবারও অধিকার দিতে হয়, কারণ ভুলের মধ্যেই বারবার চেষ্টার বাসনা ও সচেতন শিক্ষার ইচ্ছা প্রমাণিত হয় এবং পরিপূর্ণ বিবেচক মানুষ হবার দিকে তারা এগোয়।

ব্যক্তির ভুল করবারও স্বাধীনতা চাই

৫। ভাববাদ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের তুলনামূলক আলোচনা
(Comparative study of Idealism and Individualism)

সমাজ ও ব্যক্তির বিরোধ থেকেই এই দুটি মতবাদের জন্ম। শুধুমাত্র সামাজিক নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে বিচার করলে ব্যক্তিকে সমাজের ফলই বলতে হয়। সেক্ষেত্রে ভাববাদের কথাই সমর্থনযোগ্য। ব্যক্তিকে পৃথক

করলে, তাকেই বিচারের কেন্দ্রে বসালে ভাববাদের প্রত্যয়ে নানা বিপদ প্রত্যক্ষ হয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে ভাববাদের প্রধান অভিযোগ এই যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমাজের প্রকৃতি বিষয়ে অবহিত নয়। সমাজকে তারা অন্তর্নিহিত সম্পর্কের সমবায় মনে করে না, ভাবে সমাজ বুঝি একটি বাহ্য সংযোগ বা সমষ্টিমাত্র। কার্যত সমাজ কখনোই কেবলমাত্র বাহ্য সংযোগ হতে পারেনা। সমাজ শুধু সমসাময়িক কালেই উপস্থিত নেই। সভ্যতার গোড়া থেকেই জীবন পরম্পরায় সমাজ চলে এসেছে। তার স্মৃতি মানুষ বহন করে, তার প্রভাব সর্বত্রই মানুষের জীবনে। তার বন্ধন অদৃশ্য গ্রন্থির মতো মনের ওপর কাজ করে। প্রত্যক্ষত জানা না থাকলেও দেখি আমাদের মনের ওপর পিতৃপুরুষের কেমন দাবী ও কেমন প্রভাব। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে আমাদের জীবনের মূল প্রত্যয়গুলো মোটামুটিভাবে চিরকালের মতো স্থির হয়ে গেছে। তাকেই নানাভাবে আমরা বর্তমান জীবনযাত্রায় উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তাকে সম্প্রসারিত করছি। কিন্তু কখনোই সম্পূর্ণ একক অস্তিত্বে দাঁড়িয়ে শূন্য পৃথিবীতে নিজেদের কথা বলছি না। এই যেমন প্রমাণ আমাদের ভাষা। ভাষা পারস্পরিক আদান প্রদানের বাহন। কোন একটি ব্যক্তির ভাষার প্রয়োজন নেই। এই ভাষা মানব সমাজ অতীত থেকে বহন করে আসছে। আমরা ভাষার পরিবেশেই জন্মাচ্ছি এবং তার নিয়মাবলীকে ধাতস্থ করে সাধ্যমতো সংযোজন করছি। সংযোজন করে প্রস্তুত ভাষাটি রেখে যাচ্ছি ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য। আমরা কিন্তু কোনো মুহূর্তেই বলতে পারিনা সম্পূর্ণ স্বাধীন মানুষ হিসেবে আমি নিজেই ভাষা তৈরি করবো।

ভাববাদের মতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমাজের প্রকৃতি বোঝেনা

এই ভাষা যেমন ব্যক্তি নিরপেক্ষ তেমনি অন্যান্য অসংখ্য মাধ্যমের মধ্য দিয়ে সমাজ কাজ করে। ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর আমাদের সামাজিক আচরণ, বিশ্বাস, ক্রিয়া-কর্ম, রীতিনীতি কিছুই সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। সুতরাং সমাজ কেবলমাত্র ব্যক্তিদের বাহ্য সম্পর্ক হলে সমসাময়িক ব্যক্তিদের খণ্ডিত আচরণের ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু ইতিহাসের তাৎপর্য বোঝা যায় না। বাহ্য-সম্পর্কের সংগঠন ক্লাব, দল ইত্যাদিতেও দেখা:যায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বাহ্য সংযোগ কেমন মনের

সম্পর্কে দাঁড়িয়েছে। বাহ্য সম্পর্ক বলতে আমরা বুঝি যেখানে দুটি বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কিত হলেও পরস্পরের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। অন্তর্লীন সম্পর্কে সম্পর্কিত বস্তু বা ব্যক্তির ব্যবহার ও চরিত্র বদলে যায়। সমাজ তাই কেবলমাত্র স্বাধীন ব্যক্তিদের সমষ্টি নয়, তাদের অন্তর্নিহিত সম্পর্কও।

এই সূত্রেই উপযোগিতাবাদীদের বক্তব্য অপ্রমাণিত হয় যে, ব্যক্তিদের মঙ্গল যোগ করলেই সমাজ মঙ্গলকে পাওয়া যায়। ওঁরা লক্ষ্য করেন না যে প্রতিটি ব্যক্তির চিন্তাতেই সমাজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানি যে প্রত্যেক সমাজেই একটি মৌলিক লক্ষ্য বা আদর্শ নিহিত থাকে। যেমন য়ুরোপে খৃষ্টধর্ম জীবনের আদর্শকে তৈরি করেছে, যেমন ভারতবর্ষে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য জীবনের সত্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। এমন কি 'উপযোগিতা'র তত্ত্বটিই যেমন উনিশ শতকের ইংরেজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা জীবনের লক্ষ্য হিসেবে উপস্থিত করেছিলেন। সুতরাং ভাববাদীরা সঠিক বলেন যে, সমাজ ব্যক্তির জীবনকে ঘিরে রেখেছে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের আরো একটি প্রচ্ছন্ন বক্তব্য ভাববাদ অস্বীকার করে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ধরে নেন যে, ব্যক্তি যেনো নিজে থেকেই ব্যক্তি হয়েছে। বা, ব্যক্তিরা চিরকালই পরিপূর্ণ ব্যক্তি ছিলো এবং পরিপূর্ণ ব্যক্তিরা প্রয়োজনে সমাজ গড়েছে। অথচ আমরা দেখেছি সমাজ ছাড়া মানুষ কখনোই ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অবাধ প্রতিযোগিতা ও বৈচিত্র্যের কোনো অর্থ ই নেই সামাজিক সংগঠন ছাড়া। প্রত্যেক সমাজ তার নির্দিষ্ট আদর্শের দ্বারা প্রতিযোগিতা ও বৈচিত্র্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ, বৈচিত্র্যের তাৎপর্য অস্পষ্ট থাকে ঐক্যসূত্র ছাড়া। মানুষের জীবনে ঐক্যসূত্র তার মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্বের বাইরে বৈচিত্র্যের কোনো তাৎপর্য হয়না। যে-বৈচিত্র্য মানুষকে মনুষ্যত্বে নিয়ে আসে না সেই বৈচিত্র্য অর্থহীন ও ধ্বংসকারী। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরাও স্বীকার করতে বাধ্য হন যে বৈচিত্র্যের আসল লক্ষ্য মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা।

ভাববাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, ব্যক্তির মূল্যকে যথোপযুক্ত স্বীকৃতিতে প্রতিষ্ঠা করা। সমাজের তাৎপর্য ঘোষণা করার ঝোঁকে বহুক্ষেত্রে ব্যক্তিকে একটি যান্ত্রিক অংশ বলে ঘোষণা করবার চেষ্টা হয়। ব্যক্তির স্বকীয়তা নষ্ট করে তাকে সমাজ সংগঠনের হাতে প্রাণহীন পুতুলের মতো ছেড়ে দেবার কথা ওঠে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-

বাদীরা তখন সঠিক বলেন যে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্য ছাড়া সমাজ একটি প্রাণহীন, যন্ত্রবৎ সংগঠন। সমাজের কোনো নিজস্ব মূল্য নেই ব্যক্তির অধিকার ও মনুষ্যত্ব ছাড়া। কারণ সমাজ ব্যক্তিদেরই সম্পর্কমাত্র।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের বক্তব্যের প্রমাণ একনায়কতন্ত্র বা সঙ্ঘালকতন্ত্র। সমাজের নামে ডিক্টেটররা ব্যক্তির সমস্ত অধিকার কেড়ে নেন ও নিজেদের স্বার্থে সমগ্র সমাজকে পরিচালনা করতে চান। যেহেতু সমাজ একটি বিমূর্ত প্রত্যয় মাত্র, যারা সমাজ পরিচালনার ক্ষমতা পান তারাই সমাজসত্তা ও সমাজমনের নামে সর্বময় কর্তৃত্ব দাবী করেন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীরা এই একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করতে চান। রুশো বা হেগেলের বিরুদ্ধে তখন তারা সঠিক বলেন যে ব্যক্তিকে হাতিয়ার ভাবা চলবে না, ব্যক্তিকে একটি লক্ষ্য বা আদর্শ হিসেবেই মূল্য দিতে হবে! রুশো জনকল্যাণের নামে সংখ্যালঘিষ্ঠের ওপর সংখ্যা-গরিষ্ঠের জবরদস্তি মেনে নিয়েছিলেন আর হেগেল একমাত্র জর্মন রাষ্ট্রেই ঈশ্বরের প্রকৃত লীলা দেখতে পেয়েছিলেন। এই দুটি বক্তব্যের স্বাভাবিক ঝোঁকই তাই ব্যক্তির অধিকার রাষ্ট্র কর্ণধারদের হাতে জলাঞ্জলি দেবার দিকে। পেইন, বেণ্টাম ও মিল তখন সঠিক বলতে পারেন যে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য থেকেই সমাজের অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য তৈরি হয়। ব্যক্তিই সমাজকে রক্তমাংসের চেহারা দেয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের ভয়ের প্রমাণ—ফ্যাসীবাদী ও সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় সমাজের নামে ব্যক্তির সমস্ত অধিকারকেই শাসকরা কেড়ে নেন। সুতরাং আমরা বুঝতে পারি ব্যক্তির অধিকার ও স্বাতন্ত্র্যের কতো মূল্য। ক্ষমতা হাতে পেলেই শাসকরা অন্যমূর্তি ধরে। লর্ড একটন তাই চমৎকার বলেছিলেন যে 'Power corrupts, and absolute power corrupts absolutety." ক্ষমতার অপব্যবহার রুখে দেবার একমাত্র পথ ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। স্বাধীনতা রক্ষার জন্যেই ব্যক্তিরা তখন শাসকদের বাধা দেবে, বাধা দিয়ে নিজের মৌলিক অধিকার রক্ষা করবে। কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সমাজের নামে এমন প্রবল বক্তব্য গড়ে উঠেছে যে বহু পণ্ডিত ব্যক্তিরাও নানাভাবে চিন্তার অধিকারকে খর্ব করতে চাচ্ছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর য়ুরোপের এই মানসিকতা বিষয়ে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও গণিতজ্ঞ লর্ড কীন্‌স্ ১৯১৫ সালে লিখেছিলেন কিছু জর্মান লেখকের মতে 'A system of regulations must be set up, the

object of which is not the greater happiness of the individual (Professor Gaffe is not ashamed to say this in so many words), but the strengthening of the organised unity of the state for the object of attaining the maximum degree of efficiency (Leistungs fahigkeit), the influence of which on individual advantage is only indirect.—This hideous doctrine is enshrined in a sort of idealism. The nation will grow into a 'closed unity' and will become, in fact, what Plato declared it should be—'। লর্ড কীন্‌সের ভয় পরবর্তীকালের ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদ প্রমাণ করেছে, যেখানে ব্যক্তির অধিকার রাষ্ট্রের পদানত।

সম্পূর্ণ সামাজিক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ন্যায্যতই বলেন যে ব্যক্তির অধিকার ও দাবী সমাজের মৌলিক ভিত্তি। যে-সমাজে ব্যক্তির অধিকার স্বীকৃত নয় সেই সমাজ বড়োজোর পিপীলিকাতন্ত্র হতে পারে, মানুষের সমাজ নয়। বর্তমানকালের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা তাঁদের বক্তব্য এইভাবে বলছেন যে পুরাণো কালের মতো আমরা মানুষকে স্বার্থপর, অহং সর্বস্ব ইত্যাদি বলছি না। একমাত্র বলার কথা হলো, সমাজের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব এবং সমাজে নানাস্তরে নানা মূল্যবোধ কাজ করে। সুতরাং ব্যক্তিকে নিজের মতো কাজ করতে দিতে হবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ

'...merely starts from the indisputable fact that the limits of our powers of imagination make it impossible to include in or scale of values more than a sector of the needs of the whole society, and that since, strictly speaking, scales of value can exist only in individual minds, nothing but partial scales of values exist, scales which are inevitably different and often inconsistent with each other. From this the individualist concludes that the individual should be allowed, within defined limits, to follow their own values and preferences rather than somebody else's, that within these spheres the individual's system of ends should be supreme and not subject to any dictations by others. It is this recognition of the individual as the ultimate judge of his ends, the belief that as far as possible his own views ought to govern his actions, that forms the essence of the individualist position.'

অধ্যাপক হাএকের এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে একটি স্বীকারোক্তি আছে যে ব্যক্তিস্বাধীনতার সীমা একটি নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে। এই সূত্রেই ভাববাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মিলন সম্ভব। পারস্পরিক ত্রুটিবিচ্যুতির প্রসঙ্গে এতোক্ষণ আমরা দেখিয়েছি দুটি বক্তব্যেরই গুণাগুণ আছে এবং দুটি বক্তব্যই একপেশে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের অভিযোগের জবাবে উনিশ শতকের ইংরেজ ভাববাদীরা ঘোষণা করেছিলেন যে সমাজ বা রাষ্ট্র যদি ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছাকে প্রকাশ না-করে তবে ব্যক্তির বিদ্রোহ করবার অধিকার আছে। কাণ্টপন্থী টমাস হিল গ্রীণ (১৮৩৬—১৮৮২) বলেন রাষ্ট্রের প্রথম কাজ হলো, ব্যক্তির নৈতিক জীবন যাত্রার বাধাগুলো দূর করা। গ্রীণের ভাষায় রাষ্ট্রে ব্যক্তির মৌলিক অধিকার থাকছে। গ্রীণের মতে 'প্রত্যেক নৈতিক ব্যক্তির অধিকার থাকছে। প্রত্যেক সভ্যের প্রতি তার স্বাধীন ব্যবহার স্বীকৃত হচ্ছে সমাজে অংশ গ্রহণের জন্য। তার সমর্থন মিলবে এই অধিকারাবলীর প্রতি অন্যদের সম্মতিতে কারণ তার মতো অন্যরাও একই স্বাধীনতার অধিকারী'। রাষ্ট্রের এই নৈতিক কর্তব্যকে গ্রীণ নাম দেন 'hindrance of hindrances' অর্থাৎ 'বাধার বাধা'। মানুষের নৈতিক জীবনের পরিপূর্ণতার বাধাকে রাষ্ট্র নির্মূল করবে সুতরাং রাষ্ট্র ওই বাধাগুলোর বাধা হিসেবে কাজ করবে।

রাষ্ট্রের দ্বিতীয় কর্তব্য ব্যক্তির শুভজীবনের প্রতিষ্ঠা করা। শুভজীবনের প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র ব্যক্তির পরিপূর্ণ সহযোগিতা দাবী করে। ব্যক্তি সহযোগিতা করতে বাধ্য। একমাত্র সমস্যা ওঠে ব্যক্তির বিবেকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের অন্যায়ে। গ্রীণ, ব্র্যাডলী ও বোসাঙ্কেট ব্যক্তির বিদ্রোহের অধিকারকে সমর্থন করেন। সুতরাং রাষ্ট্রের অনৈতিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে ভাববাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরোধ ঘুচে যায়। এবং আমরা বুঝতে পারি এই মত দুটি পরস্পরের প্রতিপূরক মাত্র।

৬। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ (Individualism and Socialism)

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের সংঘর্ষ কয়েকটি মৌলিক প্রত্যয়কে ঘিরে গড়ে উঠেছে (ক) জীবনের মঙ্গল (খ) স্বাধীনতা ও (গ) রাষ্ট্রকর্তৃত্ব। (ক) য়ুরোপে বর্তমান সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভিত্তি তৈরি হয় ইতালীয় নবজাগরণের সূত্রে। নবজাগরণের প্রধান কথাই ছিলো সমাজ-শাসনমুক্ত

ব্যক্তির একক স্বাধিকার। সামাজিক রীতিনীতি ও অনুশাসনের বন্ধন থেকে ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়ে তার ভাগ্য গড়বার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তার হাতেই ছেড়ে দেবার কথা তখন থেকেই ইতিহাসে প্রধান বক্তব্য হয়ে ওঠে। অবাধ মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তি নিজের নিজের লক্ষ্যে চলবে ও চলার সূত্রেই সামাজিক ঐক্য সংগঠিত হবে, এ কথাটাই বলতে থাকেন সমাজ বিজ্ঞানীরা। অর্থনীতি ও দর্শনের পণ্ডিতরা ঘোষণা করেন, কোনো নিয়ন্ত্রণই ব্যক্তির জীবনকে আর বেঁধে রাখতে পারবে না। এডাম স্মিথ জানান, বিচ্ছিন্ন উৎপাদক ও বিচ্ছিন্ন ক্রেতার ক্রয়-বিক্রয়ের টানা পোড়েনে সামাজিক জীবন ও অর্থনীতি চলবে। ক্রেতা-বিক্রেতার জীবনে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ না-থাকলেই সমাজের মঙ্গল। যে যার সাধ্য মতো চলতে পারলেই দেশে ধনসম্পদ যথাযোগ্যভাবে ব্যবহৃত হবে ও সামাজিক মঙ্গল দেখা দেবে। গত সাতশো বছরে য়ুরোপ ব্যক্তি বিষয়ে এই মতবাদ গ্রহণ করে বৈষয়িক ও মানসিক উন্নতির শিখরে পৌছোয়। কিন্তু এই ঐশ্বর্যের পাশেই দেখা যায় দরিদ্র্য, অনাহার ও শোষণের ছড়াছড়ি। এডাম স্মিথ যেমন ভেবেছিলেন, অবাধ প্রতিযোগিতায় প্রতিটি ব্যক্তির মঙ্গল, তেমন না-ঘটে ব্যক্তিদের জীবনে নানা অন্যায়ের প্রকাশ ঘটতে থাকে। অর্থ-নৈতিক শোষণে একদিকে যেমন কিছু ব্যক্তির স্বাধীনতা নিশ্চয়ই থাকে, অন্যদিকে অধিকাংশের পরাধীনতা বাড়তে থাকে।

সমাজতন্ত্রবাদ এই অন্যায়ের কারণ নির্দেশ করে। সমাজতন্ত্রবাদের মতে ব্যক্তিগত মালিকানাই সমাজকে শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছে। সুতরাং একমাত্র তখনই সামাজিক মঙ্গলের সূত্রপাত হবে যখন ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটানো হবে। সমাজের উৎপাদন যন্ত্রগুলোর মালিকানা ব্যক্তিদের হাত থেকে সরিয়ে এনে সবার উপকারে ব্যবহার করতে হবে। সমাজ হবে তাদের পরিচালক। সমাজের পরিচালনায় নিছক ব্যক্তিগত সুখসমৃদ্ধির বদলে, ব্যক্তিগত স্বার্থের বদলে, প্রতিটি মানুষ নিজের সঙ্গে সঙ্গেই অন্যের কথাও ভাববে। বুঝতে পারবে তারা সম্পর্কহীন এক একটি নির্জন দ্বীপ নয়, কার্যত পরস্পরের সম্পর্কে জড়িত সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ অর্থাৎ সম্পর্ক তাদের জীবনে পুষ্টি দিচ্ছে, তাদের বর্তমানের কর্মোদ্যম ও ভবিষ্যতের কল্পনাকে ধরে রেখেছে। যে-মুহূর্তে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা সমাজের হাতে আসবে সেই মুহূর্তেই ব্যক্তিরা স্বার্থের বাধা পেরিয়ে সামগ্রিক মঙ্গলের কথা ভাববে। ব্যক্তি-

স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রধান ত্রুটি প্রতিযোগিতায় প্রকাশিত হয়। অবাধ প্রতিযোগিতায় এডাম স্মিথের কল্পনা সত্য হয়নি, স্বাধীন ক্রেতা ও বিক্রেতার বদলে একচেটিয়া ব্যবসার সূত্রপাত হয়েছে। একচেটিয়া ব্যবসা ও অলিগোপলিতে একক ব্যবসায়ীদের কোনো স্বাধীন অস্তিত্বই থাকছে না। সিজউইক জেনেছিলেন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রধান শত্রু 'একচেটিয়া ব্যবসা'। ওঁর ভাষায় এই বিপদটা হলো 'the most deep-seated weakness and most formidable danger'। সমাজতন্ত্রবাদ প্রধানতই এই মারাত্মক ত্রুটি দূর করতে তৎপর। এখানেই সমাজতন্ত্রবাদের জোর।

সমাজতন্ত্রবাদের এই বক্তব্য বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করছে। দার্শনিকরা সামগ্রিক মঙ্গলের আদর্শকে স্বীকার করে নিয়েছেন। এমনকি উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা ও শোষণ বিষয়ে সমাজতন্ত্রবাদের বক্তব্য প্রত্যেকের বিবেচনার বিষয় হয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোও বর্তমানে সবাই সমাজতন্ত্রকে তাদের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে।

(খ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান সংঘর্ষ স্বাধীনতা বিষয়ে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলেন সমাজের মালিকানার নামে সমাজতন্ত্রবাদী ব্যক্তির সমস্ত স্বাধীনতা কেড়ে নিচ্ছে। ফরাসী মনীষী তকেভিল্ লিখেছিলেন 'গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার সীমা সম্প্রসারিত করে, সমাজতন্ত্র খর্ব করে। গণতন্ত্র প্রতিটি মানুষে সম্ভাব্য সমস্ত মূল্য আরোপ করে, সমাজতন্ত্র প্রতিটি মানুষকে শুধু কর্মী ও সংখ্যা বানায়। গণতন্ত্রে মাত্র একটি শব্দতেই মিল : সাম্য। কিন্তু তফাৎটা লক্ষ্য করুণ : গণতন্ত্র যেকালে সাম্য চায় স্বাধীনতায়, সমাজতন্ত্র সাম্য চায় বাধা ও দাসত্বে'। স্বাধীনতার সংজ্ঞা নিয়ে এই দুই মতবাদে প্রচণ্ড বিরোধ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে প্রধান ঝোঁকই হলো ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও সম্মানের ওপর। সমাজতন্ত্রবাদে ব্যক্তিকে সমাজ-দেহের একটি অংশ মনে করা হয়। ব্যক্তির মূল্যের চাইতে সেখানে সামগ্রিক মঙ্গলের বক্তব্য গুরুত্ব পায় বেশি। হেনরী সিজউইক (Sidgwick) তাঁর 'এলিমেণ্টস অব পলিটিক্স' গ্রন্থে স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দেশ করেন দুটি বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে। (ক) শারীরিক বাধা ও চাপের অভাব ('absence of coercion or confinement), (খ) ব্যক্তির কর্মে নৈতিক বাধার অভাব ('absence of moral restraint placed on inclination by the fear of painful consequences resulting from the

'action of other human beings.') প্রথম সর্তটির অর্থ, ব্যক্তির কর্মে সমাজের হস্তক্ষেপ চলবে না। দ্বিতীয়টির অর্থ আরো গভীরে। প্রথম সর্তটিতে শুধু কয়েকটি বাহ্য প্রতিবন্ধের কথা হচ্ছে। কিন্তু মানুষের ওপর সবচেয়ে বড়ো চাপ হলো নৈতিক চাপ। কাজেই তাকে নৈতিক চাপে স্বকীয় লক্ষ্যে চলতে না-দেবার মতো গুরুতর অপরাধ আর কিছু নেই। দ্বিতীয় সর্তে সিজউইক এই বাধাকে দূর করতে চেয়েছেন। এই দুটি সর্তকে মিলিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেন, যে যা-খুশি আচরণ করবে। ব্যক্তিকে প্রতিপদে যেমন বাধা দেওয়া চলবে না, তেমনি সে-ও নিজের সীমা মেনে চলবে। নিজের সীমা অর্থাৎ তাকে জানতে হবে তার কর্মে কতোদূর সে অন্যের স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলতে পারে। সিজউইক জানাচ্ছেন স্বাধীনতার অর্থ।

'Letting people manage their affairs in their own way, so long as they do not cause mischief to others without the consent of others.'

সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে স্বাধীনতা শব্দটির অর্থ অস্পষ্ট। এক হতে পারে, যা-খুশি করতে পারাই স্বাধীনতা। কিন্তু এমন অবাধ ইচ্ছের কথা কেউ মানবে না। সুতরাং ব্যক্তির দায়িত্বের কথা আসছে। এই দায়িত্ব বিচার করবে কে? ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলবেন, ব্যক্তি তো বড়োজোর নিজের এবং ঘনিষ্ঠদের স্বার্থেই পরিচালিত হবে, সমগ্র সমাজের কথা ভাববে কি? সাধারণতই ভাববে না। কাজেই সমাজের হাতে ব্যক্তির অধিকারের সীমা ও সবার স্বাধীনতার ক্ষেত্র বিচারের ভার থাকা উচিত। রুশো দেখিয়েছেন এবং হেগেল সমর্থন করেছেন যে, যা সম্পূর্ণ তা-ই একমাত্র সবার মঙ্গলের কথা ভাবে, অপূর্ণ ও অংশ নিজেতেই সীমাবদ্ধ। 'সাধারণ সঙ্কল্প' (general will) একমাত্র সমাজ জানতে পারে, ব্যক্তির জানবার কথা নয়। সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিদের 'সাধারণ সঙ্কল্প'কে জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং একমাত্র তার পক্ষেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যেহেতু ব্যক্তির বদলে সমাজই তার আলোচ্য বিষয়।

স্বাধীনতার প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে, স্বাধীনতার সীমা কতোটুকু? 'অবাধ ইচ্ছা'ও 'নিয়ন্ত্রণে'র দর্শনিক তর্কে বারুচ স্পিনোজা জানিয়েছিলেন যে অবাধ স্বাধীনতা বলে কিছু হয়না। মানুষ জীবনের প্রতি স্তরে নানা নিয়মের অধীন। প্রথমত, মানুষ ভৌত রাসায়নিক (physico-chemical)

প্রক্রিয়ায় পরিচালিত। দ্বিতীয়ত, জৈব নিয়ম তার ব্যক্ত কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি। প্রাকৃতিক নিয়মকে মানুষ মানতে বাধ্য। সুতরাং প্রকৃতির নিয়মের স্তরে মানুষের স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই। মানুষের স্বাধীনতার প্রকাশ সামাজিক কর্মে, যখন নানা বিকল্পের মধ্য থেকে সে নিজের ইচ্ছাটি বেছে নেয়। কিন্তু এই বাছাইয়ের সীমাও সঙ্কীর্ণ। সমাজ যে-পরিমাণ বিকল্প উপস্থিত করবে, সেইমতো তার স্বাধীনতা। যেমন পাঁচটাকায় তিনটি জিনিস কেনা যেতে পারে। তিনটির হিসেব তার বিকল্পের সীমা, এর বেশি যাবার উপায় তার নেই। কাজেই আমরা বলতে পারি ব্যক্তির স্বাধীনতা এই ক্ষেত্রে এই তিনটি বিকল্পের দ্বারা নির্দিষ্ট। স্পিনোজা তাই লেখেন যে স্বাধীনতার সীমা না বুঝলেই হঠকারী ধারণা তৈরি হয়, যেমন 'Thus a child believes it desires milk of its own volition, likewise, the angry boy believes he desires revenge voluntarily, while the timid man believes he voluntarily desires to flee.' লাইবনিৎজ ও ঠাট্টা করে জানান যে এই সবকিছুকেই ব্যক্তির স্বাধীনতা বললে কম্পাসটাও দাবী করবে উত্তরদিক মুখে করে থাকাটাও তার স্বাধীনতা।

স্পিনোজা ও লাইবনিৎজের বক্তব্য নিশ্চয়ই সত্য। কিন্তু যতো সীমাবদ্ধই কর্মক্ষেত্র হোক না কেনো মানুষ কাজ করে স্বাধীনতা বোধ থেকেই। এমনকি জৈব নিয়মগুলোকেও সে তার বৈচিত্র্য ও বাছাই দিয়ে ফিরে রাখে। সমাজতন্ত্রবাদের ঝোঁকই হলো স্বাধীন ব্যক্তিদের পুতুলের মতো প্রাণহীন জড়ে পরিণত করা। মানুষকে পুতুল ভাবলে সমাজটাই নষ্ট হয়ে যাবে। মিলতো স্পষ্টই জানিয়েছেন ব্যক্তি নিঃসন্দেহেই অন্যের স্বার্থের কথা ভাববে কারণ অন্য মানুষরাও তো তারই মতো সব ব্যক্তি। 'The only freedom which deserves the name is that of pursuing our own good in our own way *so long as we donot attempt to deprieve others of theirs or impede their efforts to obtain it.*' (বাঁকা হরফ আমার)। মিল ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রধান সর্তই বলছেন অন্যের অধিকার রক্ষা করা। সুতরাং সমাজতন্ত্রবাদের বক্তব্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অস্বীকার করে না।

(গ) সমাজতন্ত্রবাদ যখন বলে সামাজিক উৎপাদন যন্ত্রগুলো ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে সমাজের মালিকানায় আনা হবে তার অর্থ রাষ্ট্রের

কর্তৃত্বে ওগুলো পরিচালিত হবে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। সমাজতন্ত্রবাদে রাষ্ট্র ও সমাজ সমার্থক হয়ে ওঠে। রাষ্ট্র পরিচালিত হবে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তদের প্রতিনিধিদের দ্বারা। সুতরাং রাষ্ট্র সমস্ত জনগণ ও সমাজের কল্যান করতে শপথাবদ্ধ যেহেতু সমাজ নিজের বিরুদ্ধে নিজে দাঁড়াতে পারেনা।

সমাজতন্ত্রবাদের রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব বিষয়ে এই বক্তব্যে ব্যক্তির অধিকার নিষ্পিষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা তাই রাষ্ট্র নামক যন্ত্রটিকে ব্যক্তির ওপর বসাতে নারাজ। মিল ব্যক্তির কর্মকে দুভাগে ভাগ করেছেন। একটিকে বলছেন (ক) আত্ম-সম্পর্কিত কর্ম এবং এবং অন্যটিকে (খ) অন্য-সম্পর্কিত কর্ম। অন্যের সঙ্গে অসম্পর্কিত কর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তির তিনটি স্বাধীনতার প্রয়োজন। (১) চিন্তা ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা, (২) অভিরুচি ও ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহারের স্বাধীনতা এবং (৩) একত্রিত হবার স্বাধীনতা। মিলের বক্তব্যে রাষ্ট্র যতোদূর সম্ভব ব্যক্তির জীবন থেকে দূরে থাকবে। রাষ্ট্রের কাজ হবে 'না-ধর্মী' (negative) এবং সেই কাজও প্রত্যক্ষত ব্যক্তির 'আত্ম-সম্পর্কিত' (self-regarding) কর্মের ক্ষেত্রে আসবেনা। রাষ্ট্র একমাত্র অন্য-সম্পর্কিত কর্মের ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু এই হস্তক্ষেপও ব্যক্তির নিজস্ব কর্মক্ষমতা কেড়ে নিতে নয়। শুধুমাত্র পরস্পরের বিরোধী কর্ম-জাত বাধাকে দূর করতে রাষ্ট্র ব্যক্তির অন্য-সম্পর্কিত (other regarding) কর্মের বিচার করবে। কারণ মিল বলতে চান রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবন নিয়ন্ত্রণ করে মঙ্গল, সুখসমৃদ্ধি আনতে পারে কিন্তু ব্যক্তি তবে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল পরগাছায় পরিণত হবে। তার প্রাণ ও স্বকীয়তা বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র যে ব্যক্তির মঙ্গল আনবেই তার কোন নির্দিষ্টতা ও সত্য নেই। রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করে তারাই একমাত্র বিবেচনার ভার রেখেছে। সুতরাং শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্র যে-কোনো মুহূর্তেই অত্যাচারী স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হতে পারে। তার বিরুদ্ধে একমাত্র তখনই বাধা দেওয়া সম্ভব যখন ব্যক্তিদের পূর্ব থেকেই বাধা দেবার অধিকার ও ক্ষমতা আছে অর্থাৎ স্বাধীনতা আছে। মিল তাই লিখেছেন

'the spirit of improvement is not always a spirit of liberty, for it may aim at forcing improvements on an unwilling people ...... The only unfailing and permanent source of

improvement is liberty, since by it there are as many independent centres of improvement as there are individuals.'

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীরা তাই স্পষ্টতই বলেন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন কি রাষ্ট্রের মঙ্গল করবারও অধিকার নেই। কার্যত রাষ্ট্রের একটি মাত্র কর্তব্য আছে এবং দার্শনিক স্পিনোজা তার নির্দেশ দেন 'that the ultimate aim of government is not to rule, or restrain, by fear, nor to exact obedience, but contrariwise, to free every man from fear, that he may live in all possible security; in other words, to strengthen his natural right to exist and work without injury to himself or others.' অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবন থেকে সমস্ত ভয় ও বাধাকে দূর করবে, তাদের জীবনে নিরাপত্তা এনে দেবে। নিরাপত্তা দেবার একটিমাত্র কারণ হলো, ব্যক্তিরা স্বাধীন ভাবে নিজের নিজের সঙ্কল্প মতো কাজ করলেই মানুষ হয়ে উঠ্‌তে পারে। নইলে পুতুল হয়ে যাবে। স্পিনোজা তাই চমৎকার বলেন

'No, the object of government is not to change men from rational beings into beasts or puppets, but to enable them to develope their minds and bodies in security, and to anger, or deceit, nor watched with the eyes of jealousy and injustice. In fact, the true aim of government is liberty.'

সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তির জীবনে নিরাপত্তা ও কল্যান আনবার চেষ্টায় ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল পুতুলে পরিণত করে। সমাজতন্ত্রবাদের একটিই প্রধান কথা যে, প্রতিযোগী সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিদের অধিকার নষ্ট হয়। সুতরাং অবাধ বাণিজ্য ও শোষণ বন্ধ করে সবার জীবনে সমান সুযোগ আনতে হবে। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের প্রধান কথা স্বাধীনতার বক্তব্যটিকে সম্পূর্ণ বাদ দেয় সমাজতন্ত্রবাদ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমাজ-তন্ত্রের মানব কল্যাণের আদর্শটিকে গ্রহণ করলেই সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান হবে ও এই দুই বক্তব্যের বিরোধ শেষ হবে। একটি নেবে স্বাধীনতা ও অন্যটি নেবে সামগ্রিক কল্যান।

পঞ্চম অধ্যায়

সমাজের উৎপত্তি ও প্রকৃতি

১। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি সমাজ মানুষের জীবনের স্বাভাবিক ও মৌলিক প্রতিষ্ঠান। জীবনের যে-কোনো সম্পর্কেই সমাজের প্রকাশ ও পরিচয়। জৈব বৃত্তির তাড়নাতেই মানুষ পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে কিন্তু সেই সম্পর্ক প্রকৃতির নিয়মের ছকে সীমাবদ্ধ না রেখে ছড়িয়ে দেয় অনন্ত বৈচিত্র্যে, প্রকাশ করে মনুষ্যত্বের স্বাধীন গুণাবলী। সমাজ তাই আহার নিদ্রার মতোই সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে প্রতিটি স্তরে জীবনের পটভূমি হিসেবে উপস্থিত থাকে। বিশপ বাটলার তাঁর 'সার্মনস অন হিউম্যান নেচর' বক্তৃতায় চমৎকার ঘোষণা করেন

(ক) সমাজ স্বাভাবিক

'There is such a natural principle of attraction in man towards man, that having trod the same tract of land, having breathed the same climate, barely having been born in the same artificial district or division, becomes the occasion of contracting acquaintance and familiarities many years after; for anything may serve the purpose. Thus relation merely nominal are sought and invented, not by governors, but by the lowest of the people; which are found sufficient to hold mankind together in little fraternities and co-partnerships; weak ties indeed, end what may afford fund enough for ridicule if they are absurdly considered as the real principles of that union; but they are in truth merely the occasions, as anything may be of anything, upon which our nature carries us on according to its own previous bent and bias; which occasions therefore would be nothing at all were there not this prior disposition. and bias of nature.' বাটলার বলতে চাচ্ছেন মানুষ একই আকাশের তলায়, একই মাটি জল বায়ুতে বড়ো হয়ে প্রকৃতির নিয়মেই সম্পর্ক তৈরি করে। কেউ তাদের সম্পর্ক বানায় না বা সম্পর্ক তৈরি করতে বাধ্য করেনা। আসলে মানুষেরা যে পরস্পরের সঙ্গ চায়, কাছে আসে ও সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তার কারণ আদিতেই সমাজ তাদের পায়ের তলার মাটি। সমাজের কারণে তারা মানুষ বলেই সমাজ সম্পর্কের তাৎপর্য বুঝতে চায়।

২। সমাজ যে শুধু স্বাভাবিক তা-ই নয়, সমাজ মানুষ সচেতনায় স্বীকার করে। সামাজিক বৃত্তির স্বাভাবিক টানে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয় কিন্তু তার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে থাকে বাছাই ও বৈচিত্র্য। বাছাই ও বৈচিত্র্যের প্রকাশ হয় তার সংগঠনে। নিম্নস্তরের প্রাণীর মতো প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষ সংগঠন বানাতে বাধ্য বটে কিন্তু সংগঠনের রূপ নির্ভর করে তার বিবেচনা ও প্রয়োজনবোধের ওপর। সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ প্রয়োজনের সংগঠনে শুধু আশু লক্ষ্যকেই সিদ্ধ করেনা তার নিজস্ব বিচারকে প্রয়োগ করে। সংগঠনকে উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভাঙে গড়ে। **সচেতনতায় মানুষ সমাজকে তুলে আনে স্বাভাবিকতার স্তর থেকে সৃষ্টিশীলতার পর্যায়ে।** সমাজের স্বাভাবিকতা আলোচিত হয় প্রাণী দেহের নজীরে, আর সচেতন কর্মের বিচার চলে পরস্পরিক চুক্তির কথায়। এই দুটি মতবাদের একটিকে বলা হয় প্রাণীদেহমূলক (অর্গানিজমিক) ও অন্যটিকে চুক্তিমূলক (কনট্রাকচুঅল)।

(খ) সমাজ ইচ্ছামূলক

৩। **সামাজিক চুক্তি (Social Contract)**

সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রধান কথাই হলো মানুষের জীবন ইতিহাসের দুই পর্বে বিভক্ত। আদি পর্বে সমাজের অস্তিত্ব নেই। সমাজ আসে নির্দিষ্ট প্রয়োজনের সূত্রে। প্রাক্ সামাজিক ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে সমাজটি তৈরি করেন। এই চুক্তিতত্ত্বের প্রধান প্রবক্তাদের মধ্যে দুজন ইংরেজ দার্শনিক আছেন, টমাস হব্‌স (১৫৮৮-১৬৭৯) ও জন লক্ (১৬৩২-১৭০৪) ও অন্যজন ফরাসী দার্শনিক জ্যঁ জাক্ রুশো (১৭১২-১৭৭৮)। অবশ্য প্লেটোর 'রিপাবলিক' গ্রন্থেই আমরা চুক্তি তত্ত্বের কথা শুনেছি যখন গ্লকন ও এডিম্যানটাস সক্রাটেসের সঙ্গে তর্ক শুরু করেন।

(ক) হবস শুরুতেই মানুষদের আত্মসর্বস্ব ও স্বার্থপর বলে ধরে নেন। ওঁর মতে সমাজের পূর্বেকার অবস্থার নাম 'প্রাকৃতিক অবস্থা'। এই প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষদের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা ও অধিকার ছিলো। সঙ্গে ছিলো অধিকার মেটাবার পরিপূর্ণ ক্ষমতা। মানুষেরা ক্ষমতা ও অধিকারের এমন সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ে দেয়নি। প্রত্যেকেই নিজেদের স্বার্থরক্ষায় তৎপর থাকার ফলে স্বার্থের সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব ছিলো প্রতিদিনকার একমাত্র সত্য! পারস্পরিক

মানুষ স্বার্থপর

বিরোধ ও সংঘর্ষে প্রতিটি ব্যক্তিই নিজের নিজের মঙ্গল কামনা করতো। পারস্পরিক প্রীতি ও মিলনের কোনো প্রশ্নই প্রাকৃতিক অবস্থায় উঠতো না। একক ব্যক্তির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেই একমাত্র প্রাকৃতিক অবস্থার সত্য প্রকাশিত হতো। একমাত্র নিজেদের জীবন ছাড়া আর কোনো অবলম্বন ব্যক্তিদের ছিলো না। স্বভাবতই ওই বিরোধের রাজত্বে ব্যক্তিদের ধন প্রাণ বিপদগ্রস্থ ছিলো। নিরন্তর সংগ্রামের অনিবার্যতায় ব্যক্তিদের নিরাপত্তা যখন সম্পূর্ণ-ই চূর্ণ তখন তারা ওই শ্বাসরোধকারী অবস্থা থেকে মুক্তি চাইতে থাকে। কিন্তু দ্বন্দ্বের মীমাংসা কিছুতেই ঘটতে পারেনা ক্ষমতার খেলায়। অথচ নিরাপত্তা ছাড়া জীবনও সুরক্ষিত হয় না। বাধ্য হয়ে তাই ব্যক্তিরা প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে মিলন ও সম্প্রীতির জগতে আসতে চায়। কিন্তু সম্প্রীতির বন্ধন সার্থক হয় না ব্যক্তিদের পূর্ণ ক্ষমতা বজায় থাকলে। কারণ যে-কোনো মুহূর্তেই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিরা শক্তির দাবীতে ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে। তাই তাদের পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে রাখবার জন্য প্রয়োজন হলো এমন একটি শক্তির যে তাদের দমিয়ে রাখবে ও মিলনের পথ প্রস্তুত করবে। ব্যক্তিগত শক্তিকে দমাবার জন্যে প্রয়োজন এমন একজন শাসক ও শাসকের চূড়ান্ত ক্ষমতা যাঁকে স্বাধীন ব্যক্তিরা মানতে বাধ্য হবে, না মেনে কোনো উপায় থাকবে না। এই শাসককে সমীহ করবে বলেই তারা সুযোগ মতো সামাজিক বন্ধন ভেঙে পালাবে না। হবসের ভাষায় শাসক বিষয়ে জানছি "a common power to keep them in awe and to direct their actions to the common benefit." এই সাধারণ স্বীকৃত ক্ষমতা কে পাওয়া যাচ্ছে চুক্তির মাধ্যমে। চুক্তির মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক অবস্থার স্বাধীন ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা তাদের স্বাভাবিক অধিকার ও ক্ষমতা বর্জন করে। বর্জন করে গচ্ছিত রাখে শাসক বা শাসকবর্গের কাছে। প্রতিটি ব্যক্তি নিজের অধিকার ত্যাগ করে কারণ সে জানে যে অন্যরাও ত্যাগ করবে। এই সর্তটি ছাড়া সে ত্যাগ করতে রাজী হবে না। ব্যক্তিদের সঞ্চিত ক্ষমতার অধিকারী শাসককেও একজন ব্যক্তির মতো ভাবা হয়। হব্‌স বলেন, 'He that carrieth this person is called Sovereign and hath sovereign powers ; and everyone besides, his subjects.'

নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য চুক্তি

হব্‌সীয় চুক্তির ফল হলো : (ক) অবাধ মুক্ত স্বাধীন অবস্থা থেকে ব্যক্তিরা মুক্তি চাইলো, (খ) সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার ছেড়ে দিলো শাসকের হাতে, (গ) শাসক তাদের জীবনে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা দেবে, (ঘ) শাসক সর্ববিধ ক্ষমতার অধিকারী হলো, (ঙ) পূর্বেকার স্বাধীন ব্যক্তিরা এবার শান্তির বাসনায় ক্ষমতাহীন প্রজা হয়ে গেলো।

হব্‌সের চুক্তির সবচেয়ে মারাত্মক সিদ্ধান্ত এই যে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য ব্যক্তিরা যদিও তাদের সর্ববিধ ক্ষমতা ত্যাগ করলো তবু শান্তিশৃঙ্খলার নিশ্চিতি তাদের হাতের বাইরে থেকে গেলো। কারণ, শাসক ক্ষমতা গ্রহণ করলেন নিশ্চয়ই ব্যক্তিদের কাছ থেকে এবং ব্যক্তিরা ক্ষমতা সমর্পণ করলো নিরাপত্তার বাসনায়, কিন্তু শাসক কখনোই স্বীকার করলেন না যে তিনি শান্তি দিতে বাধ্য। অর্থাৎ তিনি ব্যক্তিদের সঙ্গে কোনো চুক্তি করেন নি। ব্যক্তিদের ক্ষমতা গ্রহণ করেই তিনি শাসক কিন্তু ক্ষমতা প্রয়োগের জবাবদিহি তিনি করতে বাধ্য নন। জবাবদিহি করবেন কাকে? সবাই তো বর্তমানে 'প্রজা'—শাসকের ওপর নির্ভরশীল মানুষ মাত্র। তারা তো ক্ষমতা ও অধিকারে পরিপূর্ণ স্বাধীন মানুষ নন। সামাজিক সত্তা বর্তমানে সম্পূর্ণই শাসকের ওপর নির্ভর করে আছে যেহেতু শাসক প্রাকৃতিক পর্যায়ের হানাহানি থেকে মুক্তি দিয়েছে।

শাসক চুক্তি মানতে বাধ্য নয়

সুতরাং শাসক স্বৈরাচারী হলে, হবসের তত্ত্বে, বাঁচবার একমাত্র পথ, শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। অন্য কোনো নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যক্তিদের হাতে না-থাকায় নিরন্তর তাদের বিদ্রোহের অবস্থা বজায় রাখতে হবে। কারণ একবার বিদ্রোহের মধ্যে কায়েম হবার পরও শাসক জনস্বার্থ বিরোধী হতে পারেন। তখন তাকে থামাবার জন্যে একমাত্র পথ খোলা থাকে বিদ্রোহের। হব্‌সের শাসক যে স্বৈরাচারী হবেন তাতে আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই। হব্‌স স্পষ্টই লিখেছেন,

শাসক স্বৈরাচারী

'A *commonwealth* is said to be *instituted* when a *multitude* of men do agree, and *covenent everyone with everyone*, that to whatsoever *man*, or *assembly of men*, shall be given by the major part, the *right* to *present* the person of them all, that is to say, to be their *reprsentative*; everyone, as well he that *voted for it*, as he that *voted against it*, shall *authorize* all the actions

and judgments of that man, or assembly of men, in the same manner as if they were his own.'

হব্‌স বলছেন যে 'সাধারণতন্ত্রে' প্রত্যেক ব্যক্তি শাসকের কথা মানতে বাধ্য। যারা কার্যত শাসককে সমর্থন করেন তারাই শুধু নয়, যারা তার কার্যাবলীর বিরুদ্ধে বলেন, তারাও শাসকের সমস্ত বক্তব্য মানতে বাধ্য। একমাত্র শাসকই যা করছেন বা করবেন তাই ঠিক, তাই ন্যায্য। শাসক যদি কাউকে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা দেন তবে বুঝতে হবে ওই দণ্ডাজ্ঞা সমস্ত জনসাধারণের বাসনা। শাসকের বিরুদ্ধে যে দাঁড়াবে, মৃত্যুই তার একমাত্র শাস্তি কারণ সে সমাজের বিরুদ্ধে অর্থাৎ নিজেরই বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে।

স্বার্থপরতায় সমাজ হয় না

সমালোচনা—(ক) হবসের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, মানুষেরা নিছক স্বার্থপর হলে কখনোই স্বার্থের বাইরে চলবে না। সুতরাং সমাজ পাওয়া যাবে না। যদি ধরা যায়, প্রাক-সামাজিক পর্যায়ে ব্যক্তিরা যে-কোনো রকম সামাজিক সম্বন্ধহীন ছিলো, তবে বোঝা ভার কেনো তাদের মনে হঠাৎ সমাজ-শৃঙ্খলার ধারণা জন্মাবে। হব্‌স বলেছেন ব্যক্তিরা বাধ্য হয়ে শাসককে তৈরি করেছে এবং পরে শাসকের ক্ষমতার ভয়ে সমাজ-বন্ধন মানছে। কিন্তু এই বক্তব্যের যুক্তিতে আসলে অনেক ফাঁক। কারণ, শুধুমাত্র ভয়েই যদি মানুষ সমাজ-বন্ধন মানবে তবে প্রথম সুযোগেই কি তারা সমাজকে অস্বীকার করতে চাইবে না? আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়েছি যে গোড়াতেই সামাজিক মন উপস্থিত না থাকলে সমাজ গড়া সম্ভব নয়। সুতরাং হবসের প্রাকৃতিক পর্যায় যুক্তিতে অস্বীকৃত হয়। চুক্তির পূর্বেই সামাজিক সম্পর্ক উপস্থিত থাকে।

চুক্তি পুরুষানুক্রমিক নয়

(খ) চুক্তির ফলাফল কেনো পুরুষানুক্রমে চলবে তাও হব্‌স স্পষ্ট জানান না। প্রাকৃতিক অবস্থার দুর্যোগে তৎকালীন ব্যক্তিরা হয়তো নিরাপত্তার জন্যে একটা চুক্তি করতে পারে কিন্তু পরবর্তী বংশধারা সেই চুক্তিকে মানবে কেনো? হব্‌সের বক্তব্য অনুযায়ী প্রতিটি মানুষ নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভাবে। সুতরাং চিরকালই তারা স্বার্থ-সচেতন থাকে। ভবিষ্যত বংশধারা স্বার্থের জন্যেই পূর্বপুরুষের চুক্তিকে অস্বীকার করতে পারে। অথচ হব্‌সের মতে একবার চুক্তি করা হলে তাকে আর অস্বীকার করা যায় না।

(গ) চুক্তির বক্তব্যটি সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। ইতিহাসের কোনো পর্বেই এমন চুক্তির উদাহরণ পাওয়া যায় না।

লক্—হব্‌সের মতোই দার্শনিক জন লকও সমাজ-পূর্ব অবস্থা ধরে নেন ও তার নাম দেন 'প্রাকৃতিক অবস্থা'। প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে ব্যক্তিরা চুক্তির মধ্য দিয়েই সমাজে আসে। লক্ শুধু প্রাকৃতিক অবস্থার চরিত্রকে হব্‌সের মতো পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের চিত্রে ভাবেন না। ওঁর মতে প্রাকৃতিক অবস্থা ছিলো প্রায় স্বর্গীয়। লোকেরা শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিয়মের রাজত্বে তখন বসবাস করতো। যদিও তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার ছিলো তবু তারা হব্‌সের মানুষদের মতো বিরোধে বাঁচেনি, পারস্পরিক সম্প্রীতিতে জীবন-যাপন করেছে। লক্ জানান প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষেরা এমন একটা অবস্থায় ছিলো যেখানে,

প্রাকৃতিক অবস্থায় যুক্তিও ন্যায় আছে

'A state of perfect freedom to order their actions, and dispose of their possessions and persons as they think fit, within the bounds of the law of nature, without asking leave or depending upon the will of any other man.'

এই উদ্ধৃতিতে জানা যাচ্ছে লোকেদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে এই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা কি তারা হবসের মানুষদের মতো ব্যবহার করতো? লক জানান, প্রাকৃতিক অবস্থা একটা বিশৃঙ্খল ও অযৌক্তিক পর্যায় নয়। প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পূর্ণই যুক্তির নিয়মে চলতো। কারণ মানুষের চরিত্রের প্রধান লক্ষণই হলো তারা যুক্তি-বিবেচনার পথে চলে এবং এমন কাজ করেনা যা যুক্তির বিরুদ্ধে যায়। যুক্তিতেই তাদের স্বার্থ রক্ষিত হয়। যুক্তির কারণেই মানুষের সামাজিকতা ও শৃঙ্খলাবোধ। লক্ ঘোষণা করেন,

'The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges everyone, and reason, which is that law, teaches all mankind who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty or possessions.'

এবারে প্রশ্ন হবে, প্রাকৃতিক অবস্থা যদি যুক্তির নিয়মেই চলে তবে লক্ কেনো সমাজে আসতে চাচ্ছেন? লক্ জানাচ্ছেন সমাজের প্রয়োজন

হয় কিছুটা সুবিধের জন্য। তাছাড়া প্রতিটি লোকই সমান নয়। আবেগ ও স্বার্থ কোনো কোনো ব্যক্তিকে নিয়ম ও যুক্তির বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে পারে। কোনো একজন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছেকে অন্যদের ওপর চাপাবার কথা ভাবতে পারে। সুতরাং যদি বিরোধ জন্মায় তবে একজন নিরপেক্ষ বিচারকের প্রয়োজন। লকের এই নিরপেক্ষ বিচারক হলেন শাসক এবং শাসকের জন্যেই ব্যক্তিরা পরস্পরের সঙ্গে চুক্তি করে সমাজ গড়ে।

চুক্তি : নিরপেক্ষ বিচারের জন্য

লকীয় চুক্তির ফলাফল—(ক) প্রাক্-সামাজিক প্রাকৃতিক পর্যায়ে মানুষের যে সমস্ত অধিকার ছিলো, তা পুরোপুরি বজায় রেখেই মানুষেরা সমাজে আসে। শুধুমাত্র একটি অধিকার তারা ত্যাগ করে, তা হলো বিরোধ বিচারের অধিকার। হব্সের মতো লক্ বলেন না যে ব্যক্তিরা শাসকের হাতে তাদের সমস্ত অধিকার ত্যাগ করে 'প্রজা' হয়ে যায়।

অধিকার পুরো থাকে

(খ) হব্সের শাসকের মতো লকের শাসক পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী নন। হব্সের শাসকের ওপর কোনো আইন প্রযোজ্য নয় কারণ তিনিই আইন তৈরি করেন। কিন্তু লকের শাসকেরা এবার সমাজের নিয়ম কার্য্যকরী করেন। আইনের বিরুদ্ধাচরণ করলে তাকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হবে। কারণ ব্যক্তিরা চুক্তিতে তাদের একটিমাত্র ক্ষমতা বর্জন করেছে এবং কখনোই তাদের অন্যান্য বিচার-বুদ্ধিকে বিসর্জন দেয়নি।

শাসক : পূর্ণ ক্ষমতা নেই

(গ) সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন হলো বিচারক তৈরি করবার জন্যে। সুতরাং মনে রাখতে হবে রাষ্ট্র কেবলমাত্র বিচারকের কাজ করবে কিন্তু কখনোই সে সমগ্র সমাজের সমার্থক নয়। সমাজের অন্যান্য অংশের সঙ্গে রাষ্ট্রের ফারাক থাকছে। তাই, রাষ্ট্র নীতি-বিগর্হিত আচরণ করলে, সমাজের অন্যান্য অংশরা তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, দাঁড়াবার পূর্ণ অধিকার থাকে। হব্স বলেছিলেন রাষ্ট্র ও সমাজ সমার্থক এবং সে কারণে রাষ্ট্রের কর্মই সমগ্র সমাজের কর্ম। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কোনো অধিকার কারো নেই। লক্ স্পষ্টতই, হব্সের বিপক্ষে, রাষ্ট্রকে জনসাধারণের সমর্থনের ওপর দাঁড় করাচ্ছেন।

রাষ্ট্র বিচারক মাত্র

(ঘ) সমাজ সংগঠিত হলেই কিন্তু লকের মতে প্রাকৃতিক পর্যায়টি মুছে যাচ্ছে না। কারণ নতুন সমাজের মধ্যেই প্রাকৃতিক অবস্থার নিয়মাদি রক্ষিত হয়। প্রাকৃতিক পর্যায়ে যে নিয়মাদির যথার্থ প্রকাশ নেই, বর্তমানে সামাজিক সংগঠনে তাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। লক্ তাই লেখেন, 'A government is not free to do as it pleases . The Law of Nature stands as an eternal rule to all men, legislators as well as others.

সমাজে প্রাকৃতিক পর্যায় থাকে

সমালোচনা—(ক) একটিমাত্র সমালোচনাই বিশেষ করে লকের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য যে, প্রাকৃতিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থার বিরোধ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। মানুষ চিরকালই সমাজবদ্ধ জীব। প্রাকৃতিক অবস্থায় যুক্তির নিয়ম কার্যকরী হলে একই যুক্তির নিয়ম মানুষ চিরকাল অনুসরণ করে। ত্রুটি বিচ্যুতি চিরকাল আছে এবং চিরকালই থাকবে শুধুমাত্র ত্রুটি বিচ্যুতির ভয়ে সামাজিক পর্যায়ের ফারাক কল্পনা করা যায় না। প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের মনুষ্যত্ব গড়ে গেলে তার জন্যে নতুনভাবে সামাজিক স্তরের বাড়তি প্রয়োজন থাকেনা।

প্রাকৃতিক অবস্থা ও সমাজের বিরোধ অযৌক্তিক

(খ) যুক্তির বক্তব্যটি সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক।

রুশো—হব্‌স ও লকের মতো ফরাসী-বিপ্লবের বিখ্যাত দার্শনিক রুশো সমাজ সংগঠনকে ব্যাখ্যা করেন যুক্তির বক্তব্য দিয়ে। তিনিও হব্‌স ও স্পিনোজার মতো ধরে নিয়েছিলেন মানুষ স্বার্থপর ও নিতান্তই আত্ম ভোগসুখবাদী। মানুষ যদি সত্যিই নিছক স্বার্থপর হয় ও স্বার্থের বাইরে পা বাড়াতে না চায় তবে সমাজ-বন্ধন সমস্যা হয়ে ওঠে। কারণ সমাজের অর্থই হলো নিয়ম, শৃঙ্খলা ও সম্পর্ক। স্বার্থপর ব্যক্তিরা নিজে থেকে ওই অবস্থা আনতে চায়না। সুতরাং তাদের বাধ্য করবার প্রসঙ্গ ওঠে এবং সমাজ শাসকদের প্রয়োজন হয়। হব্‌সের মতোই রুশো বলেন যে ব্যক্তিদের জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যে চুক্তির প্রয়োজন হয়। সমাজ তৈরি হয় ব্যক্তিদের অবদমিত কামনা বাসনা ও স্বার্থপরতাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করবার উদ্দেশ্যে। রুশোর কাছে প্রশ্ন তাই যে 'মানুষের আত্মরক্ষার অবলম্বনই যেহেতু তার অধিকার ও স্বাধীনতা তখন তারা এগুলোকে বজায় রেখে কিভাবে সমাজকে স্বীকার করবে?'

মানুষ স্বার্থপর

জবাবে রুশো জানাচ্ছেন যে সমাধান একমাত্র আছে এমন একটা সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে ব্যক্তি অন্যদের সঙ্গে মিলেও নিজের সমস্ত অধিকার ও ক্ষমতা বজায় রাখে। ওঁর ভাষায়

'find a form of association which defends, with all the common force, the person and property at every member, so that though he unites himself to all, he yet obeys nobody but himself and remains as free as before.'

রুশোর সমাধানে অবশ্য হব্‌সের মতো কোনো একজন ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তিকে ক্ষমতার অধিকারী করা হচ্ছেনা, এমনকি জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হাতেও সমস্ত অধিকার দেওয়া হচ্ছে না, যেমন ভেবেছিলেন লক। রুশো সমস্ত সমাজকেই ক্ষমতার অধিকারী করেছেন। সামাজিক চুক্তির মূল কথা তাই চুক্তির মধ্যে সমাজ অর্থাৎ যে-চুক্তিতে সমাজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। আসলে রুশো কোনো শাসক খুঁজতে তার সামাজিক চুক্তির বক্তব্য উপস্থিত করেননি। তিনি মানুষের সামাজিক জীবনের ভিত্তিটি খুঁজছিলেন। তিনি ভিত্তি খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন একাধারে ক্ষমতার তাৎপর্য বুঝতে ও গণতন্ত্র বজায় রাখতে। তিনি হব্‌সীয় শাসকের সার্বভৌম চরিত্র ও লকীয় গণতন্ত্র মিলিয়ে তৈরি করেন তাঁর 'সাধারণ সঙ্কল্প' (general will)। স্পষ্ট ভাষায় রুশো লেখেন সামাজিক চুক্তি শুধুমাত্র কয়েকটি লোকের চুক্তিতেই সীমাবদ্ধ নয়, চুক্তির মূল্য সমাজের সমগ্রতার তাৎপর্য সম্পাদনে। সামজিক চুক্তিতে তাই ওঁর মতে,

রুশো চুক্তিতে সমাজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন

'The complete submission of each member with all his rights to the whole community. For since all make this complete submission, the conditions are the same for all, and consequently none can have any interest in making them hard for the others.'

সমালোচনা—(ক) রুশোর মনস্তাত্ত্বিক ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ হব্‌স বা স্পিনোজার বক্তব্য সত্ত্বেও মানুষ শুধু স্বার্থপরতার দ্বারা পরিচালিত নয়। লক্ দেখিয়েছিলেন প্রাকৃতিক অবস্থায় ব্যক্তিরা যুক্তির

নিয়মে চলে। সুতরাং ব্যক্তির জীবনে যুক্তির স্থানকে অস্বীকার করা যায় না। কার্যত, ব্যক্তি একাধারে আবেগ ও যুক্তির সংমিশ্রণ। তার যেমন স্বার্থবোধ আছে তেমনি পরের জন্য স্বার্থত্যাগ করতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না। সুতরাং স্বৈরতন্ত্রের জন্যেই হোক আর গণতন্ত্রের জন্যেই হোক ব্যক্তির নিছক স্বার্থপরতায় সমাজকে দাঁড় করানো যায় না। রুশো চূড়ান্ত গণতন্ত্রের কথা বলেও সমাজের ভিত্তিতে দুর্বলতা রেখে দিয়েছিলেন।

ব্যক্তি স্বার্থপরতার স্তূপ নয়

(খ) চুক্তি তত্ত্ব সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক।

সামাজিক চুক্তির গুরুত্বঃ পৃথক পৃথকভাবে আলোচনায় দেখানো হয়েছে সামাজিক চুক্তি বক্তব্যটি একাধারে যেমন অনৈতিহাসিক তেমনি সমাজ চরিত্রের দ্বৈত (duality) প্রস্তুত করায় মৌলিকভাবে কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে পারছেনা। সমাজ চরিত্রের দ্বৈত বলতে আমরা বুঝি হব্‌স, লক্‌, রুশো মানুষ ও সমাজের মধ্যে বিরোধ তৈরি করেছেন। ওঁরা ধরে নিয়েছেন যে মানুষ সমাজ ছাড়াই মানুষ অথচ তাদের কোনো বিশেষ প্রয়োজনে সমাজ-সংগঠনটি তৈরি করতেই হয়। কার্যত, এই বক্তব্যের অর্থ সমাজ মানুষের স্বাভাবিক নয় সুতরাং যুক্তি বা শক্তির মাধ্যমে সমাজ-বিরোধী মানুষদের একসঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে। অথচ এই প্রশ্নটির জবাব ওঁরা দিচ্ছেন না, কেনো মানুষ তার স্বভাব বিরোধী সংগঠন প্রস্তুত করবে ও এতোদিন রক্ষা করবে?

মানুষ ও সমাজের দ্বৈত

এই প্রশ্নের জবাব নেই বলেই ওঁরা সমাজের মধ্যেও দ্বৈত তৈরি করেন। একটি প্রাকৃতিক অবস্থা ও অন্যটি 'সমাজ' (civil society)। কেনো এমন দ্বৈত থাকবে? প্রশ্নটি করলে জবাব মেলে না। আসলে ওঁরা প্রাকৃতিক অবস্থাকে মেনেছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি ব্যক্তির কল্পনায়, সমাজে যার ছবি মেলে না। সম্পূর্ণ স্বাধীন ব্যক্তির কল্পনা, কারণ গোটা য়ুরোপীয় মধ্যযুগে খৃষ্টতত্ত্বের প্রভাবে (স্টোয়াবাদও আছে) ভাবা হয়েছিলো মানুষ স্বাভাবিক নানা সুযোগ ও ক্ষমতার অধিকারী। হব্‌স-লক ঐতিহ্য পরম্পরায় বক্তব্যটি স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু স্বীকার করলেই দায়িত্ব চাপে। কারণ তখন দেখাতে হয় কেনো এত ক্ষমতা সত্ত্বেও ব্যক্তিরা সমাজে সব ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে না।

প্রাকৃতিক অবস্থা কল্পনার 'স্বাধীন' মানুষের জন্য

কেনো সর্বত্রই মানুষকে শিকল পরিয়ে রাখা হয়েছে (যেমন রুশো বলেছিলেন যে 'মানুষ জন্মায় স্বাধীন হয়ে কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলে আবদ্ধ')।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রধান গুরুত্ব হলো এই তত্ত্বটি প্রধানতই সমাজের ভিত্তি হিসেবে জনসাধারণের ভূমিকার কথা বলছে। ইতিপূর্বে বহুবার সমাজকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে মনে হবে সমাজ-সংগঠনে ব্যক্তিদের কোনো সংক্রিয় অংশ নেই। তারা বুঝি সমাজ যন্ত্রের প্রাণহীন টুকরো মাত্র। চুক্তিতত্ত্বে চুক্তির অর্থই হলো চুক্তি করে স্বাধীন ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা নিজেদের ইচ্ছা ও বিবেচনা মতো। চুক্তি করে ব্যক্তিরা। সুতরাং ব্যক্তিদের যেমন স্বাধীন ইচ্ছা ও সঙ্কল্প আছে তেমনি সেই ইচ্ছা ব্যবহারের অধিকারও থাকছে। ব্যক্তিরা কোনো অর্থেই সমাজের যান্ত্রিক অংশ নয়। তারা সক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ। সমাজ তাদের ইচ্ছাতেই নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং সমাজে শক্তির উৎস ব্যক্তি এবং নিয়ামকও ব্যক্তি। হব্‌স যদিও ব্যক্তির অধিকার কেড়ে নিয়ে স্বৈরাচারী শাসন তৈরি করেন তবুও গোড়াতে হব্‌স মানতে বাধ্য হয়েছেন যে স্বাধীন ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় তাদের ক্ষমতা বর্জন করলেই শাসকের ক্ষমতা আসে। অর্থাৎ শাসক ব্যক্তিদের ক্ষমতা পেয়েই স্বৈরাচারী ও ক্ষমতাবান। লক্ ও রুশো স্পষ্টতই জনসাধারণের ক্ষমতার কথা বলেন এবং দেখান সমাজের ভিত্তি জনসাধারণের সম্পর্কিত ইচ্ছা।

সমাজ : জনসাধারণ তার ভিত্তি

৪। জৈব মতবাদ (Organic theory)

জর্মান দার্শনিক ব্লুন্টশ্লি বলেন রাষ্ট্র বা সমাজ প্রাণবান জীবদেহের মতো। প্রাণহীন যন্ত্রের নিয়মে সমাজ চলে না। প্রাণীর জীবন ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সমাজের মিল কয়েকটি বিশেষ অর্থে নির্দিষ্ট করা যায়। (ক) প্রত্যেক জীব দেহ ও আত্মার সংযোগে গঠিত। একদিকে ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তার দেহ সংগঠিত হয়, অন্যদিকে প্রাণ তাকে পরিচালিত করে। (খ) যদিও জীবদেহটি পূর্ণ এবং পূর্ণ অংশের সমবায়েই গঠিত, অংশের নির্দিষ্ট অস্তিত্ব ও কর্ম আছে। এই কর্মের দ্বারাই তারা পূর্ণের অস্তিত্ব রক্ষা করে। যেমন হস্ত-পদাদি। হাত পায়ের নিজস্ব কর্ম ও আচরণ

জীব ও সমাজ সমার্থক

আছে। কিন্তু হাত পা তখুনি হাত এবং পা যখন তারা পূর্ণাঙ্গ দেহটির নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ দেহটির উদ্দেশ্যমূলক কর্মকে প্রকাশ করেই তারা জীবনকে রক্ষা করে। (গ) জীবদেহটি আভ্যন্তরীণ নিয়মে চলে যদিও তার ওপর বাহ্য প্রকৃতির প্রভাব আছে।

ব্লুণ্টশ্লি দেখান সমাজ ও রাষ্ট্রেরও একই রকমে যেমন দেহ থাকে তেমনি প্রাণও আছে। প্রতিটি অঙ্গের নিজস্ব কর্ম আছে, যেমন প্রতিটি মানুষ স্ব স্ব কর্ম করে, তেমনি তারা নিজেদের কর্মের মধ্যে সমাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে। কার্যত ব্যক্তি সমাজের বক্তব্য নিজের মধ্যে প্রকাশ করেই ব্যক্তি। ব্লুণ্টশ্লি এটুকু বলেই থামেন না। তিনি রাষ্ট্রকে পুরুষ বলেন, যেমন চার্চ, ওঁর মতে, নারী।

প্লেটো-এরিষ্টটল ও সন্ত পলের বক্তব্য

জীবদেহের বক্তব্যটি প্রাচীন কালে সমর্থন পায় প্লেটো-এরিস্টটলের বক্তব্য ও সন্ত পলের গীর্জা সংগঠনের বক্তব্যে। সন্ত পলের মতে জীবন সর্বত্রই পারস্পরিক ঐক্য ও সহযোগেই প্রতিষ্ঠিত। এই গভীর ঐক্যের সূত্রেই জীবনের ও সমাজের তাৎপর্য বোঝা যায়। সন্ত পল ঘোষণা করেছিলেন গীর্জা হলো একটি আধ্যাত্মিক দেহ যার মাথা হলেন যীশু। লুক্কার টলেমি লিখেছিলেন,

'For as we see that the body of an animal consists of connected and co-ordinated members, so every realm and every group consists of diverse persons connected and co-ordinated for some end.'

সমাজের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে মানুষ

জীবদেহের ক্ষেত্রে একটাই জীবনের লক্ষ্য। তাঁকে বাঁচতে হবে এবং বাঁচার জন্যে প্রতিটি অঙ্গের উদ্দেশ্যমূলক, ঐক্যবদ্ধ কর্ম চাই। তেমনি সমাজকে যদি রক্ষা করতে হয় তবে সমাজকে প্রতিটি সংগঠনের অন্তর্নিহিত চরিত্রের ওপর নির্ভর করতে হবে। এই বক্তব্য অনুযায়ী সংগঠনগুলোর নিশ্চয়ই নিজস্ব কর্ম আছে কিন্তু সংগঠনের জন্ম সমাজের মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ করবার জন্যে। সংগঠনগুলো মানুষের, মানুষ সমাজের সত্যকে জীবনে প্রকাশ করেই মানুষ। সুতরাং সমাজের অঙ্গ মানুষকে কখনোই সঠিক বোঝা যাবে না সমাজের মৌলিক উদ্দেশ্য ও কর্মের পরিমণ্ডল

এত ক্ষম

বর্তমান সভ্যতায় জীবদেহের বক্তব্যটি সর্বাধিক প্রচার করেন হব্‌স ও হর্বট স্পেনসর। হব্‌স তাঁর 'লেভায়থান' নামক গ্রন্থে রাষ্ট্রের অসুস্থতাকে জীবদেহের অসুস্থতার সঙ্গে তুলনা করেন। লেখেন

'Amongst the infirmities of a commonwealth I will reckon, in the first place, those that arise from an imperfect constitution and resemble the diseases of a natural body which proceed from a defectuous procreation.,

হর্বট স্পেনসর বলেন সমাজ স্পষ্টতই একটি জীবদেহ। প্রাণবান জীব বৃদ্ধি পায়, সম্প্রসারিত হয়; সমাজও তেমনি বৃদ্ধি পায়, সম্প্রসারিত হয়। প্রত্যেক অঙ্গ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তফাৎ হতে থাকে এবং যতোই তফাৎ হয় ততোই তার সংগঠন জটিল হতে থাকে। সমাজে প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সংগঠন ও কর্ম সরল থেকে জটিল হয়, সংশ্লিষ্ট অবস্থা থেকে বিশ্লিষ্ট হতে থাকে। কিন্তু জীবদেহের ক্ষেত্রে যেমন তফাৎ হবার অর্থ নয় যে তারা জীবদেহের সঙ্গে অসম্পর্কিত হচ্ছে তেমনি সমাজের ক্ষেত্রেও জটিল সংগঠন কখনোই সমাজের উদ্দেশ্যের বাইরে নয়। যেমন হাত বাহুর ওপর নির্ভরশীল এবং বাহু মস্তিষ্কের ওপর নির্ভরশীল তেমনি সমাজের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের ওপর নির্ভর করেই বাঁচে। জীবদেহ সম্পর্কিত ও অন্যোন্য-নির্ভর না-হলে বাঁচে না। সমাজও প্রতিটি সংগঠনের অন্তর্লীন সংযোগের সূত্রে প্রত্যক্ষ হয়।

জীবদেহ সরল থেকে জটিল, সমাজও তাই

স্পেনসর সমাজ সংগঠনের গড়নের সঙ্গে জীবদেহের গড়নের সাদৃশ্য বর্ণনা করেন। জীবদেহের পুষ্টির অঙ্গ আছে, সমাজপুষ্টির অঙ্গ হলো শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা। জীবদেহের তিনটি প্রধান রক্ষা-ব্যবস্থার কথা স্পেনসর বলেন: (ক) পুষ্টি ব্যবস্থা (Sustaining System), (খ) বণ্টন ব্যবস্থা (distributory system) ও (গ) নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা (regulating system)। সমাজের ক্ষেত্রে পুষ্টি জোগায়, আমরা আগেই বলেছি, শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা। জীব যেমন বিভিন্ন খাদ্য ইত্যাদির মারফৎ পুষ্টি সংগ্রহ করে সমাজের শিল্প ব্যবস্থা তেমনি নির্ভর করে দেশের বনজ ও খনিজ সম্পদের ওপর। বণ্টন ব্যবস্থা জীবদেহে রক্ত-সঞ্চালন পদ্ধতি আর সমাজে

জীব ও সমাজ: তিনটি মিল গড়নের

যানবাহন ব্যবস্থা। জীবদেহের নিয়ন্তা হলো মস্তিষ্ক আর সমাজের নিয়ন্তা হলো সরকার ও সামরিক বাহিনী।

সমাজকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনার একটিই প্রধান গুণ। এই মতবাদে জানি সমাজকে যন্ত্রের মতো ভাবা চলে না। যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাদের তফাৎ করে অন্য যন্ত্রের সঙ্গে সহজেই মিলিয়ে দেওয়া যায়। সমাজের অঙ্গ মানুষেরা নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র ও পৃথক কিন্তু তাদের সম্পর্ক এমনই যে তাদের মিলনে একটি ঐক্য গড়ে ওঠে। এই ঐক্য সমাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে প্রকাশ করে। উদ্দেশ্য ছাড়া ব্যক্তিকে বোঝা যায় না। এরিস্টটল বুঝিয়েছিলেন প্রতিটি ব্যক্তিই পরিণতির লক্ষ্যে চলে। তাকে শুধুমাত্র কিছু জৈবিক বৃত্তি ও ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে বিচার করা চলে না। ব্যক্তি তার অন্তর্নিহিত ঐক্য ও সাধনাকে সারা জীবন ধরে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করে। এই ঐক্য ও সাধনা সমাজের সামগ্রিক বক্তব্য অর্থাৎ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সূত্রে নির্ধারিত হয়। ব্যক্তিদের জীবন বিষয়ক বক্তব্য ও পূর্ণতার কল্পনা সেই সমাজের আদর্শের দ্বারা সংগঠিত হয়। সমাজ যন্ত্রবৎ হলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মিলনের কোনো প্রাণবান উদ্দেশ্য থাকতো না এবং জন্ম-মুহূর্তেই ব্যক্তি যন্ত্রের অংশের মতো পরিপূর্ণ থাকতো। জীবদেহের সঙ্গে তুলনায় বুঝতে পারি ব্যক্তি ও সমাজের যোগ এত গভীর ও মৌলিক যে ব্যক্তিকে সমাজ থেকে তফাৎ করে চেনা যায় না এবং ব্যক্তি ছাড়াও সমাজের কোনো তাৎপর্য থাকে না।

জীবের নজীরে সমাজ যন্ত্র নয়

এই মতবাদের একটি মারাত্মক ত্রুটি আছে। ব্যক্তি ও সমাজের মিলন থেকে এমন একটা ঝোঁক তৈরি হতে পারে যে ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ববান না-বলে কেবলমাত্র সমাজের একটি অঙ্গ বলে ধরা যায়। তখন ব্যক্তির স্বাধীনতার অর্থ থাকে না। সমাজ যেমন চালাবে তাকে তেমনিভাবেই চলতে হবে। সমাজ পরিচালকরা ব্যক্তির স্বাধীনতা সহজেই কেড়ে নিয়ে তাকে দাবার ঘুঁটির মতো চালাতে পারে। সঞ্চালকতন্ত্রে (dictatorship) ব্যক্তিকে সমাজের নামেই পদানত রাখা হয় এবং হেগেলীয় নজীরে বলা যায় সমাজ কর্তার নির্দেশ ছাড়া ব্যক্তির কোন মূল্যই নেই। ব্যক্তি কেবলমাত্র সমাজসংস্থার নির্দেশ মেনেই চলবে এবং নির্দেশ মানাতেই তার সার্থকতা। কার্যত জৈব মতবাদের ঝোঁক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে।

ব্যক্তির স্বাধীনতা বিলুপ্ত

৫। সাধারণ সঙ্কল্প (General will):

সমাজের প্রকৃতি বোঝাবার জন্যে রুশো 'সাধারণ সঙ্কল্প' নামক একটি প্রত্যয় তৈরি করেছেন। সাধারণ ভাবে আমরা জানি সমাজ স্বতন্ত্র ব্যক্তির সমষ্টি এবং তাদের প্রত্যেকের স্বাধীন ইচ্ছা ও মতামত আছে। কিন্তু রুশো বলেন ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও স্বাধীনতার দ্বারা সমাজের মৌলিক রূপটি বোঝা যায় না। ব্যক্তিদের স্বাধীনপৃথক ইচ্ছায় তাদের স্বকীয় মনোভাব বোঝা যেতে পারে, কিন্তু তাদের ইচ্ছা দিয়ে সমাজ সংহতি ও ঐক্যের রূপটি ধরা যায় না। সমাজ নিশ্চয়ই ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে কিন্তু সমাজ বিচ্ছিন্ন চিন্তা ও ইচ্ছার ফল নয়। সমাজের মৌলিক ঐক্য ও উদ্দেশ্য থাকে। ব্যক্তিদের জীবনে এই ঐক্য ও উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয় বলেই সমাজ সবার জীবনের পটভূমি হয়।

সমাজ বিচ্ছিন্ন চিন্তার ফল নয়

রুশো সমাজের সামগ্রিক রূপটি বোঝবার জন্য 'সাধারণ সঙ্কল্প' প্রত্যয়টির আশ্রয় নেন। কিন্তু 'সাধারণ সঙ্কল্প' কাকে বলা হবে? সাধারণ সঙ্কল্পকে প্রথমে প্রতিটি ব্যক্তির সঙ্কল্পের যোগফল বলা যেতে পারে। রুশো মাঝে মাঝে তাই মনে করেছেন। কিন্তু তখন তিনি কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হন। সাধারণ সঙ্কল্পকে সবার ইচ্ছার সমাহার বললে, প্রথমত, আমরা কখনোই সমাজে সবার ইচ্ছের হিসেব জানতে পারিনা। দ্বিতীয়ত, অনেকেই থাকবেন যাদের ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে মিলছে না। সুতরাং সে-ক্ষেত্রে, রুশো বোঝেন, সাধারণ সঙ্কল্প নামক প্রত্যয়টি সম্পূর্ণ অর্থহীন। সুতরাং রুশো 'সবার ইচ্ছাকে' (will of all) কে 'সাধারণ সঙ্কল্প' না-বলে অন্য সংজ্ঞা প্রস্তুত করেন।

সাধারণ সঙ্কল্প প্রতিটি ইচ্ছার যোগফল নয়

দ্বিতীয় সংজ্ঞায় সংখ্যা পরিমাণের হিসেবটি রুশো বাদ দেন। এবার তিনি নৈতিক মূল্য আরোপ করেন প্রত্যয়টিতে। স্পষ্টই ঘোষণা করেন, 'There is often a great deal of difference between the *will of all* and the *general will*; the latter takes account only of the common interest, while the former takes private interest itno account, and is no more than a sum of particular wills.' রুশোর ব্যাখ্যায় পাওয়া যাচ্ছে সর্বসাধারণের ইচ্ছা বা 'সবার ইচ্ছা' হলো ব্যক্তিবিশেষের

সবার ইচ্ছা না মঙ্গলের ইচ্ছা?

স্বতন্ত্র ইচ্ছার যোগফল আর 'সাধারণ সঙ্কল্প' হলো সবার 'সমস্বার্থ' বিষয়ক ধারণা। 'সমস্বার্থকে আমরা নৈতিক বক্তব্য বলতে পারি কারণ সমস্বার্থের বক্তব্যে ব্যক্তিদের সংখ্যা পরিমাণ থাকেনা। এমন একটা মঙ্গলের কল্পনা করা হয় যা সবার ওপরেই প্রযোজ্য, যার সার্থকতায় প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে মঙ্গলের উপস্থিতি ঘটে। 'সাধারণ সঙ্কল্প' তাই সামাজিক মঙ্গলের সঙ্কল্প।

'সাধারণ সঙ্কল্পের' রুশো বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। (ক) সাধারণ সঙ্কল্প যেহেতু সমাজের কোনো বিশেষ অংশ বা ব্যক্তির কথা নয়, এই বক্তব্যটি সমগ্র সমাজের পরিপূর্ণ লক্ষ্য ও মঙ্গলকেই প্রকাশ করে। সুতরাং সাধারণ সঙ্কল্প সর্বদাই নৈতিক ও সর্বদাই যথার্থ। রুশো লেখেন, 'Why is the general will always right, and why do all invariably will the happiness of each? Because the general will, if it is to deserve the name, must be general in its object as well as in its origin, it must come from all and apply to all.'

মঙ্গলের ইচ্ছা। সাধারণ সঙ্কল্পের যথার্থতা বিষয়ে যদিও রুশো বলেছেন ওপরের উদ্ধৃতিটিতে যে এই সঙ্কল্পটি সবার ওপরেই প্রযোজ্য নয়, সবার ইচ্ছার দ্বারাই গঠিত তবু মনে রাখতে হবে রুশো এক্ষেত্রে সমাজবদ্ধ মানুষের মাথা গুণছেন না, তাদের মঙ্গলের কথা বলছেন। অর্থাৎ সামাজিক মঙ্গলে প্রতিটি ব্যক্তির অংশ গ্রহণ করতে হয়। তাদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন ব্যতিরেকে সমাজের মঙ্গল পরিপুষ্ট ও কার্যকরী হয় না। রুশো অন্যত্র জানিয়েছেন,

'What generalizes the will is less the number of votes than the common interest which unites them.'

(খ) 'সাধারণ সঙ্কল্প' সমস্ত অবস্থাতেই সমাজে থাকে। কেউ না-জানলেও থাকে। প্রতিটি কর্তব্য বিষয়েই সাধারণ সঙ্কল্প অর্থাৎ মঙ্গলের আদর্শ সমাজে উপস্থিত। তাকে জানাটাই মানুষের কর্তব্য। ব্যক্তিরা সচেতনভাবে ইচ্ছা প্রকাশ না-করলেও তাদের সর্বদাই সাধারণ সঙ্কল্পে পৌছবার চেষ্টা করতে হয়। সাধারণ সঙ্কল্পকে ধ্বংস করা যায় না, বিকৃত করা যায় না, সর্বদাই তা স্থির ও নির্দিষ্ট। রুশো লেখেন '...it is always constant, unalterable and pure' ;।

(গ) যদিও প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকে এবং এই ইচ্ছা বহুক্ষেত্রেই সাধারণ সঙ্কল্পের বিরোধী তবু রুশোর মতে ব্যক্তিরা সাধারণ

সঙ্কল্পে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য। কারণ সাধারণ সঙ্কল্প সর্বদাই সমাজের সামগ্রিক মঙ্গলের আদর্শ সুতরাং সমাজের অংশ হিসেবে সে এই মঙ্গলের অংশভাক্।

(ঘ) রুশোর মতে সাধারণ সঙ্কল্পের কাছে প্রত্যেক ব্যক্তিকে মাথা নিচু করতে হয়। যেহেতু করা উচিত। কারণ সাধারণ সঙ্কল্প সমগ্র সমাজের সঙ্কল্প এবং তার কাছে নতি স্বীকার করলে ব্যক্তির স্বার্থ নষ্ট হয় না। রুশো তাই লিখেছেন,

'Since each surrenders himself *to the whole* and not to any individual, and since he acquires just the same rights over every man as he yields to him over himself, all gain exactly as much as they lose and also increased power to preserve their possessions.'

সাধারণ সঙ্কল্প স্বীকার করলে ব্যক্তির স্বার্থই পরিপুষ্ট হয় কারণ ব্যক্তি তখন সমগ্র সমাজের আদর্শের সঙ্গে নিজের কর্মধারাকে মেলাতে পারে।

সাধারণ সঙ্কল্পের গুরুত্ব ঃ (ক) সমাজের ভিত্তি 'সাধারণ সঙ্কল্প' বলে রুশো সমাজ ও ব্যক্তির মৌল সম্পর্ক প্রকাশ করেন। সমাজ চলে এবং সমাজের আইন কানুনাদি তৈরি হয় ব্যক্তিদের সংঘবদ্ধ সামগ্রিক ইচ্ছার সূত্রে। তাদের সক্রিয় সহযোগিতায় সমাজের পরিপূর্ণতা গড়ে। লক আইন বিষয় মাথা ঘামান নি। কারণ তিনি শুধু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের কথা তুলেছিলেন মাত্র কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক আইনানুগ ভিত্তিতে তাকে প্রতিষ্ঠা করবার ব্যবস্থা ভাবেন নি। রুশোর তত্ত্বে আইন প্রণয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ সাধারণ সঙ্কল্প বদলায় এবং এই পরিবর্তন আইনের মধ্যেই প্রকাশ করতে হয়। আইনের পশ্চাতে থাকে সঙ্কল্প। রুশো সাধারণ সঙ্কল্পকে আইনের ভিত্তি বলেছেন। (খ) সাধারণভাবেই বোঝা যায় যে সামাজিক প্রতিটি কর্তব্যের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা ভালো মন্দ থাকে। সেটি জানতে পারলেই সমাজের মঙ্গল। রুশো এই মঙ্গলামঙ্গলের ধারণাকে স্পষ্ট করেন এবং জানান একমাত্র আদর্শ ইচ্ছাতেই সাধারণ সঙ্কল্পের পূর্ণ পরিচয়। (গ) সমাজবদ্ধ গোষ্ঠীর গোষ্ঠীপ্রীতি বা আংশিক স্বার্থ থাকে। কিন্তু সমাজকল্যাণের জন্য আংশিক স্বার্থকে অবদমিত করতে হয়। রুশোর সাধারণ সঙ্কল্প সমাজ লক্ষ্যের কেন্দ্রিকতা ও চরিত্রকে নির্দিষ্ট রূপ দেয়।

(ঘ) রুশো বোঝাতে চেয়েছেন যে প্রতিটি লোকের সামগ্রিক কল্যাণের বোধে কোনো বিরোধ নেই। সুতরাং প্রত্যেকই যদি একই ভাবে সমাজের স্বার্থ বিষয়ে অবহিত হয় তবে তারা নিঃসংশয়ে সমস্বার্থের ধারণায় পৌঁছোবে। তাদের সঙ্কল্পের বিরোধ কেবলমাত্র নিজেদের ক্ষেত্রে।

সাধারণ সঙ্কল্পের ত্রুটি—(ক) রুশো মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর ধরে নিয়েছিলেন টমাস হব্‌সের মতো। তারা তাদের স্বার্থের তাড়নাতেই চলে অথচ রুশো সাধারণ সঙ্কল্প তত্ত্বে মানুষকে সামাজিক স্বার্থে আত্মস্বার্থ বিসর্জন দেবার নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বিসর্জন দেবার মতো মনোভাবকেও মেনেছেন। কিন্তু প্রশ্ন থাকেই, যদি মানুষেরা ধাতুগতভাবে স্বার্থপর হয় তবে সামাজিক সম-স্বার্থের কথা ভাববে কেনো?

(খ) সাধারণ সঙ্কল্পকে জানা সম্ভব নয়। সাধারণ সঙ্কল্পের উৎসকে রুশো একবার বলেছেন (১) ব্যক্তিগত স্বার্থ বাদ দিতে দিতেই সাধারণ সঙ্কল্প তৈরি হয়। আংশিক স্বার্থ পারস্পরিক সম্পর্কে বাতিল হলে সাধারণ সঙ্কল্প সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়। যদিও সমাজে সাধারণ সঙ্কল্প সমস্ত সময়েই উপস্থিত। রুশো আর একবার জানান (২) ব্যক্তিরা সরাসরি ভাবে ভোট দিয়ে মতামত জানিয়ে সাধারণ সঙ্কল্প তৈরি করে। এই দুটি বক্তব্য মেলে না। কারণ একটিতে মতামতের যোগফল ভাবা হচ্ছে এবং আর একটি যোগফলের উর্ধ্বে অন্য একটি প্রসঙ্গ। রুশোর বিবেচনায় দুরকম প্রস্তাবনাই আছে।

(গ) কার্যত সমাজে একটাই যে সাধারণ সঙ্কল্প থাকবে এবং প্রতিটি ব্যক্তিই তা মানবে এমন নয়। সুতরাং রুশোর মনেও সাধারণ সঙ্কল্পের নিয়ন্তা কোনো 'পুরুষ'-এর চিন্তা এসেছে। আমরা জানি সঙ্কল্প ব্যক্তির, সুতরাং সাধারণ সঙ্কল্প রাষ্ট্র নামক সত্তাবান প্রতিষ্ঠানের হতে পারে। রুশো রাষ্ট্রকে অনেকটাই এমন ব্যক্তির মতো ভেবেছেন এবং তাকেই সাধারণ সঙ্কল্প পরিচালনার ভার দিয়েছেন। এ-জন্যেই তিনি লেখেন 'সংখ্যা লঘিষ্ঠকে জবরদস্তিতে সবার কথা মানাতে হবে।'

সাধারণ সঙ্কল্পের পরিণতি : গণতান্ত্রিক দার্শনিকরা বলেন রুশোর 'সাধারণ সঙ্কল্পে'র প্রভাবেই হেগেলের রাষ্ট্রতত্ত্ব গড়েছে। তাঁদের মতে হেগেল সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রকর্তৃত্বের জনক। তিনি রুশোর সাধারণ সঙ্কল্পকে

রাষ্ট্রের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। ব্যক্তির কোনো ক্ষমতাই থাকে না ওঁর তত্ত্বে, রাষ্ট্র সর্ববিধ ক্ষমতা ও বিচার বিবেচনার ভার তুলে নেয়। রুশো যেহেতু সাধারণ সঙ্কল্পের উৎস স্পষ্ট ঘোষণা করতে পারেন নি বা সে-বিষয়ে চিরকাল সংশয়ে ভুগেছেন 'সাধারণ সঙ্কল্প' ব্যক্তিদের ইচ্ছার যোগফল না কোনো সামগ্রিক আদর্শ, হেগেল ওঁর অস্পষ্টতার সুযোগে সাধারণ সঙ্কল্পকে রাষ্ট্রনামক সত্তাবান প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছায় রূপান্তরিত করেন। রুশো প্রত্যক্ষত আরো সাহায্য করেন যখন তিনি সংখ্যা লঘিষ্ঠকে মানাবার জন্যে শক্তিপ্রয়োগকে সমর্থন করেন।

তাই রুশো থেকে হেগেলের পথ দূরবর্তী নয়। 'সাধারণ সঙ্কল্প' যদি সামগ্রিক কল্যাণের আদর্শ হয় তবে যে-কোন ব্যক্তিই জানতে চাইবে কে এই আদর্শ স্থির করবেন ও কে নিয়ন্ত্রণ করেন। রুশোর মীমাংসা অত্যন্ত দ্বিধান্বিত ছিলো। হেগেল তাঁকে স্পষ্ট রূপ দেন। হেগেল রাষ্ট্রতে একটি মৌলিক সত্তা (Social Righteousness—'Sittlichkeit') আরোপ করেন যা ব্যক্তির সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে যেতে পারে। কারণ রাষ্ট্র পূর্ণ এবং পূর্ণ সর্বদাই অংশের ক্ষুদ্রতাকে অস্বীকার করে। রাষ্ট্রই সাধারণ সঙ্কল্পের ধারক ও বাহক কারণ রাষ্ট্র এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা অন্তরে ও বাইরে, বর্তমান চিন্তা ও অতীত ঐতিহ্যের সূত্রে, ব্যক্তিদের ইচ্ছা ও সাধারণ সঙ্কল্পকে ধরে রাখে। ব্যক্তিরা যায় আসে কিন্তু সমাজের মন মঙ্গলামঙ্গলকে সর্বদাই সচেতন ইচ্ছার স্তরে প্রস্তুত রাখে। রাষ্ট্রই একমাত্র সাধারণ সঙ্কল্পের প্রতিনিধি হতে পারে।

সাধারণ সঙ্কল্প জানে বলেই রাষ্ট্র সর্বাধিক নৈতিক প্রতিষ্ঠান। জনসাধারণের জীবনকে মঙ্গলময় করবার জন্যেই রাষ্ট্র উপস্থিত। ভাববাদীরা বলেন এ-কথা ভাবতে আপত্তি নেই যে প্রতিটি ব্যক্তির ইচ্ছা বা সঙ্কল্প আছে। কিন্তু তার সঙ্কল্প কি তাকে সর্বদাই সঠিক পথে নিয়ে যায়? সাধারণতই যায় না। কারণ, ব্যক্তি জানে না তার 'সত্য সঙ্কল্প' (real will) কি। অথচ 'সত্য সঙ্কল্পের' দ্বারা পরিচালিত হলেই মঙ্গল। কে এই সত্য সঙ্কল্পকে জানাবে? একমাত্র সে-ই জানাতে পারে যার আত্মবোধ ও স্বার্থপরতা নেই। সমাজে এমন একটি প্রতিষ্ঠান হলো রাষ্ট্র। রাষ্ট্রই ব্যক্তির জীবনের পরিপূর্ণতার আদর্শ। সুতরাং রাষ্ট্রেই সাধারণ সঙ্কল্প থাকে। ব্র্যাডলী সে-জন্যেই হেগেলের ব্যাখ্যায় লেখেন, ব্যক্তি তখনই ব্যক্তি যখন সে সমাজের (রাষ্ট্রের) ইচ্ছাকে পূর্ণ করে। হেগেল ব্যক্তি

স্বাধীনতার প্রসঙ্গে জানান 'nothing short of the State is the actualisation of freedom' হেগেল শিষ্য ইংরেজ দার্শনিক বোসাঙ্কেট লেখেন 'the State is the guardian of our whole moral world and not a factor in our organized moral world' এবং সরাসরি জানান যে রাষ্ট্র সাধারণ সঙ্কল্প বা 'সত্য সঙ্কল্প'র ধারক হওয়ায় কখনো অন্যায় করতে পারে না। বোসাঙ্কেটের ভাষায় 'it is hard to see how the State can commit theft or murder in the sense in which there are moral offences.'

অনুশীলনী

1. Describe the relation of the Individual to Society. In what sense and to what extent is the analogy of an organism applicable to human society ? (B. U. 1962)

2. What, according to you, is the most satisfactory view of the relation between individual and society. (C. U. 1962)

3. Is Society an organism in the strict sense ? (B. U. 1962)

4. State the points at issue between Individualism and Socialism and suggest your own solution.

5. Critically examine the social contract theory and show its relevance in the study of social philosophy.

6. What is 'General Will' ? Elucidate Rousseau's position and the problems pertaining to it.

7. Explain the concept 'General Will' and show how it has been transformed by Hegel into state's will.

8. Is there really a gap to be bridged between individual and society ? Show reasons for your answer.

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমাজ সংগঠনের রূপ ও প্রকৃতি

১। সমাজ ও সমাজসমূহ (Society and Societies)

ইংরেজ দার্শনিক হুয়াইটহেড বলেন 'সমাজ ও 'সমাজসমূহে' তফাৎ আছে। দুটি সমাজের চরিত্রই 'শ্রেণী'র চরিত্র। শ্রেণী বলতে আমরা একটি নির্দিষ্ট সূত্রানুযায়ী সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীকে বুঝি। যেমন, বলা গেলো 'পাঁচ ফিট লম্বা লোকের শ্রেণী'। যে-কোনো পাঁচ ফিট লম্বা লোক এই শ্রেণীতে পড়বে। শ্রেণীভুক্ত লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পূর্ণই বাহ্য। অর্থাৎ সম্পর্কটি কারো চরিত্রের পরিবর্তন ঘটায় না। কিন্তু আমাদের সমাজ যদিও 'শ্রেণী',-এই শ্রেণী ভুক্ত লোকদের সম্পর্ক অন্তরের। সম্পর্কের টানে তাদের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি ও চরিত্র নিয়ত পরিবর্তিত হয়। এই সূত্রেই ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়েছি যে 'সমাজ' নামক বিমূর্ত প্রত্যয়টি প্রত্যক্ষ হয় বিভিন্ন 'সম্প্রদায়ের' সীমায়। সমাজ তো নির্বিশেষ সম্পর্ক, কিন্তু সম্প্রদায় সেই সম্পর্ক প্রকাশের নানা সংগঠন। যেমন, আমরা জানি বাঙালী একটা জাতি ও তাদের নির্দিষ্ট সমাজ আছে। কিন্তু তাদের চিনি 'পরিবার' ইত্যাদি বিভিন্ন সংগঠনে। সুতরাং মনে রাখতে হবে 'সম্প্রদায়ের' মাধ্যমেই সমাজের প্রকাশ।

সমাজের দুটি ভিত্তির কথা আমরা বলেছি। একটি স্বাভাবিক ও অন্যটি সংগঠিত। সম্প্রদায়ের ভিত্তিও তাই স্বাভাবিক কিন্তু রূপটি সংগঠিত।

সমাজের ভিত্তি স্বাভাবিক ও সংগঠন

স্বাভাবিক কারণে মানুষ সম্পর্কিত হয় কিন্তু সম্পর্কের নির্দিষ্ট প্রকাশভঙ্গি আছে. এই প্রকাশভঙ্গি প্রত্যক্ষ হয় সংগঠনের গড়ন ও চরিত্রে। একটি সম্প্রদায়ের অন্তর ও বাহির রূপ পায় এই সংগঠনের বৈশিষ্ট্যে। প্রাকৃতিক কারণে নর নারীর দৈহিক সম্পর্ক হয়, সুতরাং আমরা সম্পর্কের সূত্রে পাই স্বাভাবিক সমাজটি। কিন্তু এই সমাজ বা সম্পর্ক প্রকাশ পায় বিভিন্ন জীবনযাত্রায় বিভিন্ন বিবাহ পদ্ধতিতে। সেই জাতি ও সংস্কৃতির মন বিশিষ্ট সংগঠনটির মধ্যেই কাজ করে। যেমন পলিনেশীয় বিবাহবিধি ও ভারতীয় বিবাহ বিধিতে পার্থক্য। ভারতীয় রীতি ও য়ুরোপীয় রীতি যেমন দুটি

দেশের মানসকে প্রত্যক্ষ করে। সুতরাং সংগঠন সমাজবদ্ধ জীবনযাত্রার কেন্দ্র-বিন্দু।

২। সামাজিক সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর পরিচয় (**Nature of Social Groups or Community**)

আমরা 'শ্রেণী'র প্রসঙ্গে সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্রের কথা বলেছি। মার্কিন অধ্যাপক ম্যাকাইভর ও পেজ অনেকটা সেই ধরনের উক্তি করেন যখন তিনি লেখেন 'By a group we mean a collection of social beings who enter into distinctive social relationship with one another. A group, then as we understand it, involves reciprocity between its members.' ('সোসাইটি,' পৃষ্ঠা—৩৪।)

অধ্যাপক ম্যাকাইভর ও পেজ যদিও সমাজকে সম্পর্ক হিসেবে ধরেছেন তবু ওঁরা বড়োজোর সেই সম্পর্কের চরিত্রকে 'reciprocity' বলেন। কিন্তু একের সমর্থন অন্যতে পাওয়া না গেলেই সমাজ নষ্ট হয় না। সমাজের সম্পর্কটি এতো গভীরে ও এতো জটিল যে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তার কর্ম চলতে থাকে। আমরা নানাভাবে সেই ভাব পরিমণ্ডলে নানা রূপ নিতে থাকি। অর্থাৎ আমরা যেমন বলেছি, সমাজ সম্পর্কের টানে উভয়ত দুজন দুজনকে পালটে দিতে থাকে, শুধু দেওয়া নেওয়াতেই সবটা নিঃশেষ হয় না। এই সামাজিক গোষ্ঠীকেই আমরা 'সম্প্রদায়' বলেছি। যেমন, রাজনৈতিক দল, ধর্ম প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। সর্বত্রই দেখা যাবে এই সব প্রতিষ্ঠানে এই অধ্যাপকদ্বয় কথিত reciprocity' বা সমর্থন বা আদান-প্রদানই সব নয়, মূলত এই সম্প্রদায়গুলোর চরিত্র নিহিত থাকে সৃষ্টিশীল প্রভাবের মধ্যে। ব্যক্তিরা শুধুমাত্র মতামত বা কর্ম ও দায়িত্বই বিনিময় করে না। কখন অজান্তে বদলে যেতে থাকে। এই পরিবর্তনের সুযোগ না থাকলে সমাজ বড়োজোর দর্শনের একটি শ্রেণী হতো মাত্র, তার বেশি কিছু নয়।

সম্প্রদায় সমর্থন

আমাদের সংজ্ঞার 'সম্ভাব্য গোষ্ঠী' (quasi group)র সঙ্গে সম্প্রদায়ের পার্থক্য বোঝা যায়। সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংগঠন আছে কিন্তু সম্ভাব্য গোষ্ঠীর কোনো স্বীকৃত সংগঠন নেই। যেমন ধরা যাক, ভারত সরকারের কেরানীকুল। পেশার দিক থেকে অসংখ্য ব্যক্তির মধ্যে সাদৃশ্য আছে কিন্তু এই সাদৃশ্যানুযায়ী তাদের কোনো সংগঠন নেই। সুতরাং আমরা তাদের সম্প্রদায় বলতে পারি না

সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিতরা নানা সূত্র দিয়ে জনগোষ্ঠীকে শ্রেণীবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন। কখনো ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য, পারস্পরিক সম্পর্ক বা গোষ্ঠীর দায়িত্ব—তাঁদের বিভাজনের ভিত্তি হয়েছে। যেমন সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিত কুলীর মতে গোষ্ঠী দু'শ্রেণীর : (ক) প্রাথমিক ও (খ) মাধ্যমিক।

প্রাথমিক গোষ্ঠী : নিজেদের গড়া

প্রাথমিক গোষ্ঠীর চরিত্র নির্ভর করে গোষ্ঠীর প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পর্কে। পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি সেখানে প্রতিটি ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও আদান প্রদানে। তারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে চেনে এবং তাদের সুখে দুঃখে ও কর্মে অংশ গ্রহণ করে। যেমন, একটি ক্লাব বা সংঘ। মনে রাখতে হবে **প্রাথমিক গোষ্ঠীর অবলম্বন নিজেদের গড়া সংগঠন। স্বাভাবিক সম্পর্কের সূত্রে এই গোষ্ঠী গড়ে না, নিজেরা মনস্থির করে সংঘ বা প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করা হয়।** প্রাথমিক গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যবদ্ধতার অবলম্বন বা নীতি থাকা প্রয়োজন।

মাধ্যমিক গোষ্ঠী : ব্যক্তিগত পরিচয় নেই

প্রাথমিক গোষ্ঠীর ওপর মাধ্যমিক গোষ্ঠী তৈরি হয়। মাধ্যমিক গোষ্ঠীতেও মিলনের বা ঐক্যবদ্ধতার নীতি থাকে। কিন্তু সভ্যদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠতা ও সাক্ষাৎ পরিচয়ের কোনো প্রয়োজন থাকে না। যেমন, ছাত্রদের সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষকদের নিখিল বঙ্গ প্রতিষ্ঠান। **মাধ্যমিক গোষ্ঠীতে ব্যক্তিগত পরিচয় থাকতে পারে, কিন্তু সে পরিচয় যে থাকতেই হবে এমন কোন কথা নেই।**

প্রাথমিক গোষ্ঠী সর্বদাই তুলনায় পরিসরে সীমাবদ্ধ; কারণ বিস্তৃত পরিসর হলে ব্যক্তিগত পরিচয় ও আদান প্রদান সম্ভবপর নয়। মাধ্যমিক গোষ্ঠীর কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। প্রাথমিক গোষ্ঠীতে সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত, কিন্তু মাধ্যমিক গোষ্ঠীতে সম্পর্ক পরোক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক।

মধ্যবর্তী গোষ্ঠী

এই দুই গোষ্ঠীর মাঝামাঝি আরো একটি গোষ্ঠীর কথা সমাজতাত্ত্বিকরা বলেন। তার নাম মধ্যবর্তী গোষ্ঠী (Intermediary groups)। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যই কমবেশি এই মধ্যবর্তী গোষ্ঠীতে প্রকাশিত হয়। আর একজন মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক সামনার গোষ্ঠীকে 'অন্তঃগোষ্ঠী' ও 'বহিঃগোষ্ঠী' এই দুই ভাগে ভাগ করেন। অন্তর্নিহিত সম্পর্ক থাকলে অন্তঃগোষ্ঠী বাড়ে। বহিঃগোষ্ঠীতে সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কম। যেমন, বিবাহ ব্যবস্থায়

দেখা যায় অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহ ব্যবস্থা। পারস্পারিক ঘনিষ্ঠতার কারণে অধিকাংশ সভ্য সমাজেই অন্তর্বিবাহ অর্থাৎ একগোত্রে বিবাহ প্রথা নেই। এই প্রত্যয়টিকে অধ্যাপক বের্গসন ও বর্তমানের অধ্যাপক পপার সমাজের ক্ষেত্রে বারবার ব্যবহার করেন।

৩। সামাজিক সংগঠন (Social Institution)

আমরা বলেছি যে, সমাজকে মূর্ত দেখি সম্প্রদায়ে এবং সম্প্রদায় তার নিজস্ব চরিত্র প্রকাশ করে সংগঠনের মধ্যে। সংগঠন জীবনযাত্রা ও সম্পর্কের স্থায়ী ও প্রত্যক্ষ রূপ। সংগঠনের প্রত্যক্ষতাকে ঘিরেই মানুষের চিন্তা, ভাবনা ও মনটি প্রকাশিত হয়। যেমন সম্পর্ক, তেমনি সংগঠন। এবং যেমন সংগঠন, তেমনি সম্প্রদায়। যেমন ধরা যাক, ভারতীয় বর্ণাশ্রম প্রথা। বর্ণাশ্রম একটি তত্ত্ব এবং এই তত্ত্বকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় সমাজ অতীতে গড়ে উঠেছিলো। এই সংগঠনের মধ্যেই ভারতীয় মনের পরিচয় পাওয়া যায়। য়ুরোপে এমন সংগঠন গড়েনি, সুতরাং সমাজের আলোচনায় ভারতীয় ও য়ুরোপীয় চিন্তায় এতো প্রভেদ। য়ুরোপীয় জাতীয় মন ও চরিত্রকে কখনোই বর্ণাশ্রমের কাঠামোতে বোঝা যায় না। আমরা সংগঠনকে তাই একটা কাঠামো বলতে পারি। এই কাঠামোটি থাকে বলেই সমাজের প্রত্যক্ষ দেহটিকে আমরা পাই, যেমন প্রতিমার অঙ্গসংস্থান তখনই সম্ভব, যখন প্রতিমার কাঠ ও খড়ের কাঠামোটি তৈরি হয়। অন্য একটি উপমায় ঘটনাটা বোঝানো যায়ঃ যদি সমাজের মন ও চরিত্রকে আমরা জল বা তরল বস্তু বলি, তবে সংগঠন হলো পাত্র বা ছাঁচ। যেমন ছাঁচ তেমনি রূপ গড়বে। একবার রূপ নেবার পর আমরা সেই রূপের সাহায্যেই তার পরিচয় নির্দিষ্ট করি। অধ্যাপক বার্নস্ অনেকটা এই কথাই লেখেন সংগঠন বিষয়ে 'The social structure and machinery through which human society organizes, directs and executes the multifarious activities required to satisfy human needs.'

সংগঠন: জীবনের স্থায়ী ও প্রত্যক্ষ রূপ

সংগঠনকে সম্প্রসারিত ও সীমাবদ্ধ তাৎপর্যে বোঝা যায়। **বৃহত্তর অর্থে যে-কোনো সামাজিক সংহতিকেই সংগঠন নাম দেওয়া চলে।** যেমন, পরিবার, রাষ্ট্র ইত্যাদি। কারণ, এই সংগঠনগুলোতে মানুষের স্বাধীন সঙ্কল্প কাজ করছে এবং তারা কোনো-না-কোনো সম্পর্ককে স্থির রূপ

দিচ্ছে। কিন্তু এ-কথাও আমরা জানি যে, পরিবার রাষ্ট্র ইত্যাদি স্বাভাবিকভাবে গড়েছে, কেউ স্থির করে আলাপ-আলোচনায় গড়েনি। কাজেই সংগঠনের নিজস্ব চরিত্র বুঝবার জন্য তার পরিসরকে ছোটো করে আমাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হয়। **সংকীর্ণ অর্থে ব্যক্তিরা নিজেদের প্রয়োজনে সচেতনভাবে যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তাকেই আমরা সংগঠন বলবো।** যেমন বিবাহ পদ্ধতি, উপনয়ন পদ্ধতি ইত্যাদি। এই অর্থে পরিবার সংগঠন নয়, কিন্তু বিবাহপদ্ধতি সংগঠন।

এবার একটি প্রশ্ন ওঠে। সংগঠনের আলোচনায় দু'ভাবে তাকে দেখা যায়। সংগঠনকে আমরা আদর্শ ও আচারের অর্থে দেখতে পারি। একভাবে সংগঠন শুধুমাত্র রীতি-নীতি ও বিধি-নিষেধ। আবার অন্যভাবে বলা যায় যে এই বিধি-নিষেধাদি প্রকাশ করবার নির্দিষ্ট রূপ আছে, মাধ্যম আছে। একটি বক্তব্য ও অন্যটি বিন্যাস। যেমন বর্ণাশ্রমের প্রসঙ্গে বলা যায়—বর্ণাশ্রম প্রথা একটি তত্ত্ব এবং তত্ত্বটি নানা রীতিনীতি ও বিধি-নিষেধের মধ্যে প্রকাশিত। কিন্তু তা প্রকাশ করবার যে-ব্যবস্থা বা যে-বিশ্বাসের মধ্যে বর্ণাশ্রমকে রক্ষা করা হয় তা হলো মাধ্যম বা হাতিয়ার। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি তাই বলেন যে, বিশেষ ধরনের সমাজ-সংহতি (সংঘ) ও তার হাতিয়ারে তফাৎ করা উচিত। ("It might be well to distinguish between a *particular mode of association*, the institutions that give it definiteness and permanence and the *instruments by which these institutions are supported* and through which they act."—বাঁকা হরফ আমার)। একটি বিদ্যালয় নিশ্চয়ই একটি সংগঠন, তেমনি একে বিশেষ ধরনের একটি সংঘ বা সংহতিও বলতে পারি। কারণ, ছাত্র ও শিক্ষকের উদ্দেশ্যমূলক একটি সম্পর্কে বিদ্যালয় নামক সম্পর্কের কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছে এবং এই কেন্দ্রটি বিদ্যালয়-সংগঠন নামক বিশেষ বিন্যাস বা হাতিয়ারের মধ্যে প্রকাশিত।

অধ্যাপক ম্যাকাইভর তাঁর 'কমিউনিটি' গ্রন্থে এ-বিষয়ে আলোচনা করে দেখান যে, সমাজ, সংহতি (সংঘ) ও হাতিয়ারে বেশ তফাৎ। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সংগঠিত সম্পর্ক অর্থাৎ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যমূলক সংস্থাকে সংঘ (association) বলা হবে। সংঘের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা এবং সঙ্গে সঙ্গেই মনে রাখতে হবে এই উদ্দেশ্য স্থায়ী। সাময়িক উদ্দেশ্য বা আশু প্রয়োজন মেটাবার সংগঠনকে আমরা সংহতি বা সংঘ বলি না।

যেমন একটি সভার ‘জনতা’। তারা হয়তো বক্তৃতার সময় সমস্বরে চিৎকার করে, উত্তেজিত ও ব্যথিত হয়, এমন কি একই সঙ্গে কোনো ঘটনা ঘটিয়ে বসে ; কিন্তু তাদের মধ্যে স্থায়ী কোনো সম্পর্কের যোগসূত্র নেই। কাজেই ওই জনতাকে আমরা সংহতি বা সংঘ নামকরণ করি না। অবশ্য একযোগে কাজ করবার সময়, কোনো অফিসঘর আক্রমণ করলেও সাময়িক একটা ঐক্য নিশ্চয়ই সূচিত হয়, কিন্তু তাকে সংঘবদ্ধতা বললেও, সংঘ বলা চলে না। অর্থাৎ তাদের ওপর তখন সংঘের কোনো একটি গুণ রয়েছে মাত্র, পুরো চরিত্র প্রকাশিত হয়নি। সংঘ ও বিধিতে তাই এটুকু তফাৎ যে, বিধি-ব্যবস্থা কোনো-না-কোনো সংস্থাকে কেন্দ্র করেই প্রচলিত হয়। সংস্থাহীন কোনো রীতি বা বিধি থাকতে পারে না। যেমন আগেই বলেছি কাঠামো ছাড়া প্রতিমা নেই। সংঘ ও **বিন্যাসকে** একসঙ্গে না দেখলেই গোলোযোগ ঘটে। কারণ এরা **সাপেক্ষ-পদ**, একটি আর একটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সামাজিক সংস্থার উদ্দেশ্য যেমন তার নিজস্ব কাঠামো ও হাতিয়ার দ্বারা প্রকাশিত হয়না, তেমনি হাতিয়ার ও কাঠামোর কোনো পরিচয় নেই সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়া। শুধু বাহ্যত বিধি-ব্যবস্থা দেখে যেমন সমাজের পরিচয় পাওয়া যায় না, তার তত্ত্বকে বুঝতে হয় ; তেমনি তত্ত্বের মূল্য নির্ধারণ হয় কাঠামো ও হাতিয়ারের পূর্ণ পরিচয়ে। এ-বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিকদের প্রচুর ভ্রান্তি আছে। গ্রীসদেশে দাসপ্রথা ছিলো। ভারতবর্ষে গৃহদাসদের ব্যবহার আমরা জানি। দুই ক্ষেত্রেই ‘দাস’ শব্দটির উল্লেখ পাওয়ামাত্র অনেক পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করে ফেলেন যে, ভারতবর্ষেও প্রাচীন গ্রীসের অনুরূপ দাস প্রথা ছিলো। এক্ষেত্রে পণ্ডিতদের এই ভুল যে, তাঁরা সামাজিক ইতিহাস ও কার্যকারণ ছাড়াই শুধুমাত্র বাহ্য নজীরে বিপথে চালিত হচ্ছেন। মনস্তত্ত্বে আচরণবাদীরা যেমন শুধুমাত্র বাহ্য ব্যবহারেই মানুষের পূর্ণ পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। অধ্যাপক মরিস গিন্সবের্গ সংঘ ও সংগঠনকে তফাৎ করবার জন্যে লেখেন, সংঘ 'Consists of a group of people united for the performance of a specific function or functions' আর 'Institutions may be described as recognized and established usages governing the relations between individuals and groups'.

সংঘ ও বিন্যাস এক সঙ্গে চলে

এবার সংগঠন ও আচারে (custom) তফাৎ বোঝা দরকার। সংগঠন স্থায়ী একটি কাঠামো বা বিন্যাস—যাকে নিয়ে জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষতা পাচ্ছে।

আর আচার হলো ব্যক্তির অনুষ্ঠিত ব্যবহার। সংগঠনের সর্বদাই নির্দিষ্ট রূপ থাকে, কারণ সংগঠন একটি দৃঢ় রীতি-প্রকরণ। আচার ও রীতি-প্রকরণ কিন্তু আবার ব্যক্তিগত রুচি ও বিশ্বাস সাপেক্ষ। আচার সংগঠনের ফল মাত্র। আচার সংগঠননির্ভর হলেও ব্যক্তিগত রুচির সঙ্গে যোগ থাকায় অনেক রকমে পাল্টায়। যেমন ধরা যাক, ভারতীয় বিবাহ ব্যবস্থা একটি সংগঠন, কিন্তু এই মূল সংগঠনের সঙ্গে জড়িত নানা আচার আছে যা সর্বত্র এক নয়। এমন কি সর্বত্র যে ঐসব আচার পালন করতেই হবে তার কারণ নেই। বাঙালীর বিবাহে স্ত্রী-আচার যেমন। শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানের পর বাকি সব ইচ্ছা-নির্ভর। তবে আচার কোনোক্রমেই সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত নয়।

৪। সংগঠনের বিভিন্ন রূপ বা ছাঁচ (Various forms of Institution)

অধ্যাপক মরিস গিন্সবের্গ লিখেছেন যে, সমাজের ঝোঁকই হলো বিভিন্ন সমাজে অর্থাৎ সম্প্রদায়ে সংগঠিত হবার। সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংগঠন থাকে, কর্মের সীমা থাকে এবং সম্প্রদায়ে সংগঠিত ব্যক্তিদের সম্পর্ক চিনবার সূত্রও থাকে। মোটামুটিভাবে এই সম্পর্কটি স্থায়ী এবং সম্পর্কটিকে সাধারণ-ভাবে সংজ্ঞা দেওয়া যায়। সংগঠন তাঁর মতে 'are forms of social relationship between individuals, ways of action or behaviour which have received social sanction.' সংগঠনের চরিত্র বিষয়ে তিনি তিনটি সামাজিক নীতির কথা বলেন: (ক) নৈতিক নিয়মাবলী, (খ) আইনকানুন ও (গ) প্রচলিত রীতিনীতি। এই তিনটি সূত্রের ওপর নির্ভর করে আমরা সংগঠনকে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারি। (ক) গঠনমূলক সংগঠন (Formative institutions), (খ) অর্থনৈতিক সংগঠন (Economic institutions), (গ) রাষ্ট্রীয় সংগঠন (Administrative institutions) ও (ক) সাংস্কৃতিক সংগঠন (Cultural institutions)।

(ক) গঠনমূলক সংগঠন—সমাজ সংহতির ক্ষেত্রে দুটি প্রধান কর্মভাগ থাকে। একটির লক্ষ্য হলো সমাজকে রক্ষা করা ও অন্যটির উদ্দেশ্য হলো সমাজ-সংস্থাকে ঐক্যবদ্ধ করা। যে-সংগঠন কেবলমাত্র সমাজের ঐক্যকে সচেতনভাবে রক্ষা করে তাকে আমরা গঠনমূলক সংগঠন বলবো। সচেতন এই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অনেকটাই শিক্ষামূলক অর্থাৎ সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা সংগঠন থেকেই ঐক্যের শিক্ষা পায়। যেমন ধরা যাক—

পরিবার। জীবজগতের স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষেরা সংঘবদ্ধ হয়েছে এবং বংশ বিস্তারের মধ্য দিয়ে প্রাণধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখছে। কিন্তু শুধুমাত্র প্রাণধারা অক্ষুণ্ণ রাখলেই চলেনা। বিরোধের পরিবর্তে সহযোগিতায় এমন একটি পরিবেশ গড়তে হয় যার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো জীবনকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করা। আমরা যেমন জেনেছি মনুষ্য জীবনের প্রগতি ও মঙ্গলের জন্য বিরোধ মূল সত্য নয়, ঐক্যই 'শুভজীবনের' ভিত্তি। সুতরাং সচেতন লক্ষ্য হিসেবে এই বক্তব্যকে গ্রহণ না করলে সমাজের সমূহ ক্ষতি। পরিবার সজ্ঞানে এই ঐক্যবোধকে জিইয়ে রাখে, সম্প্রসারিত করে ও বিরোধের বীজকে নষ্ট করবার চেষ্টা করে।

(খ) **অর্থনৈতিক সংগঠন**—সমাজ-সংহতির জন্যে সচেতন সামাজিক মানুষ সংগঠন গড়ে। কিন্তু সমাজ-বিস্তার প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই বলেছি যে, প্রকৃতি মনুষ্যেতর জীবের ক্ষেত্রে যতোটা সহযোগী, মানুষের ক্ষেত্রে ততো নয়। মানুষকে বাঁচার জন্যে নিজের বুদ্ধি ও বাহুবলে প্রকৃতি থেকে উপকরণ আদায় করে নিতে হয়। এই আদায়ের সূত্রেই তার জ্ঞান বাড়ে, বাঁচার নতুন ভিত্তি স্থাপিত হয়। কাজেই বাঁচার জন্যেও মানুষকে সংগঠন তৈরি করতে হয়। এই সংগঠনকে আমরা অর্থনৈতিক সংগঠন বলি। আদি মানুষের হাতিয়ার তাকে বাঁচবার উপকরণ জুগিয়েছিলো। বর্তমানকালে উন্নত জটিল যন্ত্র ও যন্ত্রব্যবস্থা মানুষের মৌলিক প্রয়োজনটিকে রক্ষা করে চলেছে।

(গ) **রাষ্ট্রীয় সংগঠন**—আমরা বলেছি যে, সমাজ সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং আরো বলেছি যে, বিরোধে সমাজের ভিত্তিটুকুই নষ্ট হয়। অথচ দেখা যাচ্ছে নানা জাতের সংগঠন ও নানা উদ্দেশ্য সমাজে কাজ করছে। কখনো এমন ঘটতে পারে যে, সংগঠনগুলোতে ও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিরোধ দেখা দিলো। তখন সেই বিরোধ থেকে সমাজ-সংহতি রক্ষা করবে কে? হব্‌স এই কথাই তাঁর দার্শনিক আলোচনার মুখ্য বক্তব্য হিসেবে ধরেছিলেন। সমাধানে জানিয়েছিলেন যে, সমাজের শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষা করে রাষ্ট্র। প্রত্যেক সমাজেই এমন কোনো কেন্দ্রগ নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন, যা বিশৃঙ্খলা থেকে সমাজকে রক্ষা করবে। আদি সমাজে রাষ্ট্র না থাকলেও সমাজকর্তার নিয়ন্ত্রণ ছিলো। সমাজ-প্রধান বা সমাজ-কর্তা কর্মবিভাগ ও অধিকারের সীমা রক্ষা করতেন। কিন্তু বর্তমান কালে সমাজ পরিসরে এতো বৃহৎ হয়েছে এবং সমাজ-সম্পর্ক এতো

জটিল হয়েছে যে, নিছক ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও ভয়-ভক্তির মাধ্যমে সমাজবন্ধন রক্ষা করা সম্ভব নয়। কাজেই সমাজের জটিল নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্ককে পরিচালনার জন্য নৈর্ব্যক্তিক সংগঠন তৈরি করতে হয়েছে। আচারের বদলে এসেছে আইন। বৃহত্তর কর্মবিভাগের প্রয়োজনে, দায়িত্ব ও অধিকারের ন্যায্যতা রক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের জন্ম। অধ্যাপক হবহাউস রাষ্ট্র-সংগঠনের সংজ্ঞা দেন 'A State is a fabric in which the principal functions of government, the declaration of law, its execution, and the common defence, are differentiated and co-ordinated.' আর অধ্যাপক গিন্সবের্গ বলেন যে, ন্যূনপক্ষে সেই সমাজেই রাষ্ট্রের জন্ম যেখানে সভ্যদের রক্ষা ও বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে নিয়ম রক্ষার প্রয়োজন। ব্যক্তিগত সম্পর্কের আমলে প্রত্যক্ষ সমাজকর্তার প্রয়োজন থাকে কিন্তু পরোক্ষ সম্পর্কের আমলে নৈর্ব্যক্তিক সংগঠন সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্র তাই বর্তমান কালের চরিত্রানুগ সংগঠন।

(ঘ) **সাংস্কৃতিক সংগঠন**—রাষ্ট্রের প্রয়োজন হলো নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলার জন্যে ; কিন্তু মানুষের জীবনে প্রতি কর্মই শুধুমাত্র নিরাপত্তার নয়, শুধুমাত্র বাহ্য নিয়ম শৃঙ্খলার নয়। তার আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে যদিও প্রাথমিকভাবে নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা আবশ্যিক, তবু তার মানস-লোকের উপযোগী অনুকূল আবহ দরকার। এমন পরিবেশ গড়া দরকার—যেখানে সে সহজেই নিজের সুপ্ত ক্ষমতাকে প্রস্ফুটিত করতে পারে। ব্যক্তির মানসলোকের সংবাদ রাষ্ট্র রাখতে পারে না। রাষ্ট্র তার জীবনের বাহ্য সংগঠনের পরিকল্পনা করে মাত্র। সুতরাং রাষ্ট্রের এলাকার বাইরে ব্যক্তির জীবনে আরো অন্যান্য সংগঠনের প্রয়োজন থাকে।

জন্ম থেকেই মানুষ প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে অপ্রয়োজনের খেলায় মাতে। সেই কতো সহস্র বছর পূর্বে অন্ধকার গুহাগাত্রে সে ছবি এঁকে রেখেছে। প্রয়োজনীয় পাত্র যখন গড়েছে তখনো শুধুমাত্র আশু প্রয়োজন সিদ্ধ করেই খুশি থাকেনি, পাত্রটিকে সুন্দর করে গড়েছে। বহু সময় ব্যয় করেছে নিজের অপ্রয়োজনের খেয়াল চরিতার্থ করতে। নিছক আত্মপ্রকাশের জন্য এমন কোনো কষ্ট নেই যা সে গ্রহণ করেনি। পিরামিড বানিয়েছে, তাজমহল গড়েছে, কণ্ঠস্বরকে নানাভাবে ভেঙে অসামান্য সঙ্গীত সৃষ্টি করেছে। কাজেই প্রয়োজনের সংগঠনের বাইরে

তার অপ্রয়োজনের সংগঠন লাগে। এই সংগঠনগুলোকেই বলা হয় সাংস্কৃতিক সংগঠন। সাধারণভাবে খেয়ে পরে বাঁচার জন্যে এইসব সংগঠনের কোনো মূল্য নেই কিন্তু মূল্য আছে মানুষের, মানুষের মতো বাঁচার জন্যে।

ইংরেজ অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি অন্য আর একটি সংগঠনের কথা আলোচনায় তুলেছেন। ওঁর নামকরণে সেই সংগঠন হলো **'বর্বর সংগঠন'** (Barbaric institution)। আমরা মোটামুটিভাবে জীবের অস্তিত্ব, ঐক্য ও মানসিক বিস্তারের সঙ্গে মিলিয়ে সংগঠনভেদ করেছি। কিন্তু মনস্তত্ত্বের কাছে জেনেছি যে, মানুষ এখনো তার আদিম বর্বর স্মৃতি ভুলে যায়নি। সভ্যতার মধ্যবিন্দুতেও সে বর্বরতা প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনা। ইতিহাস জুড়ে অসংখ্য তার নজীর। ববরতা প্রকাশের সংগঠন এখনো আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। একটার পর একটা মহাযুদ্ধে মৃত্যুর তাণ্ডবেই তার পরিচয়। অসহায় বৃদ্ধ-নারী-শিশুদের ওপর যখন নৃশংস বোমাবর্ষণ হয়, যখন পারমাণবিক বোমায় দুইটি কর্মরত শহরকে নিঃশেষে মুছে দেওয়া হয়, যখন আরো বীভৎস বন্য মারণাস্ত্রের জন্য বৈজ্ঞানিকরা সদাই ব্যাপৃত থাকেন তখন বোঝা যায় আমাদের সভ্যতার মিহি আস্তরণের তলায় ববর মনটি এখনো সংগোপনে লুকিয়ে আছে! সমাজের প্রতি স্তরে হিংসার প্রাবল্য এই সত্যকেই প্রকট করে! রোম সাম্রাজ্যের পতনের সময় অসংখ্য অসহায় লোকদের ক্ষুধার্ত বাঘ সিংহের সামনে ছেড়ে দেওয়া হতো, আর দিনের পর দিন সভ্য রোমকরা সুরক্ষিত স্থান থেকে ওই নরহত্যা প্রত্যক্ষ করতো। 'গ্ল্যাডিয়াটোরিয়াল কমব্যাট' ছিলো সুসভ্য রোমকদের একটি বিলাস ক্রীড়া।

৫। সংগঠনের সম্পর্ক (Interactions of Institution)

সমাজ নিশ্চয়ই সম্পর্ক, কিন্তু সংগঠনে সংগঠনে বিরোধ ঘটে। অনেক সমাজতাত্ত্বিকের মতে বিরোধের মধ্যেই সমাজ প্রগতির উৎস লুকিয়ে আছে। অনেক পণ্ডিত—যেমন জর্মন দার্শনিক কার্ল মার্কস শ্রেণী-সংগ্রামকে ইতিহাসের চালকশক্তি মনে করেন। অথবা যেমন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ মনে করেছিলেন অবাধ প্রতিযোগিতায় সমাজের ও ব্যক্তির চূড়ান্ত মঙ্গল। অথচ কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই দেখা গেলো অবাধ প্রতিযোগিতার অর্থ শক্তিশালীর অবাধ ক্ষমতা। পৃথিবীব্যাপী ক্ষমতা বণ্টনের তাড়নায় একটার পর একটা মহাযুদ্ধের সূচনা হতে থাকে। এতো

রক্তপাত ও ঘৃণার মধ্যে সমাজের ঐক্যটিই নষ্ট হয়ে আছে। বর্তমানে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার কথা নিতান্তই হাস্যকর উক্তি মনে হয়। তাই সংগঠনের পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সচেতনতায় যার যার কর্তব্য যথাবিহিতভাবে নিজ নিজ সংগঠনের মধ্যে প্রকাশ করে সমাজের সংহতি ও প্রীতির বন্ধন রক্ষা করাই সকলের কর্তব্য।

অনুশীলনী

1. What is a 'Community'? Show its relation with Society and analyse how a Community functions.

2. What is an 'Institution'? How do you distinguish it from 'Association'? Why should there be any Institution?

3. What should be the proper division of Institutions and why?

4. Explain the different forms of Social group with suitable examples.

সপ্তম অধ্যায়

পরিবার

১। পরিবার কি (What is a Family)?

বাঙলায় 'পরিবার' শব্দটির সাধারণভাবে দুটি অর্থ। মোটামুটি ভাবে আধুনিক শিক্ষিত লোকেরা বোঝেন একটি সমাজসংগঠন—যার কিছুটা ভিত্তি জৈবিক ও কিছুটা মানসিক। আর প্রাচীনপন্থী ও গ্রামবাসী ভদ্রলোকেরা সাধারণতই স্ত্রীকে 'পরিবার' বলে উল্লেখ করেন। যদিও তাঁরা কিন্তু কখনোই বর্তমান য়ুরোপীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতো শুধুমাত্র স্ত্রী-কেন্দ্রিক সংগঠনকে পরিবার বলেন না। প্রচলিত এই প্রয়োগ থেকে বোঝা যায় যে আমাদের চিন্তায় যে-কোনো কারণেই হোক স্ত্রীর সঙ্গে 'পরিবার'-বোধটি জড়িয়ে আছে।

পরিবারের সংজ্ঞা-নির্দেশের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান মানসিক ঝোঁকের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। একটিকে আমরা বলবো **প্রাচ্য দেশীয় (Oriental)**

ও অন্যটিকে প্রতীচ্য দেশীয় (Occidental)। সংস্কৃতির বিভিন্নতার কারণে দুই মহাদেশে জীবনযাত্রার সংগঠন বিষয়ে নানা মৌলিক পার্থক্য দেখা দিয়েছে। বর্তমান আলোচনায় প্রাচ্যদেশের প্রসঙ্গে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের কথা বলা হবে।

ব্যক্তিবিষয়ক নতুন বক্তব্য রেনেসান্স

য়ুরোপের রেনেসান্স ('নবজাগরণ') আন্দোলনের ফলস্বরূপ ব্যক্তি ও ব্যক্তির সংগঠন বিষয়ে নতুন বক্তব্য রূপ নেয়। সুইস অধ্যাপক জাকব বুর্কহার্ট জানান প্রাক্‌-রেনেসান্স ব্যক্তি ছিলো নানা সংগঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। স্বকীয়তার বদলে তার সামাজিক চরিত্রকেই মূল্য দেওয়া হয়েছে বেশী। ব্যক্তি, সেকালের বক্তব্যে, সমাজের দাবি মিটিয়েই তাৎপর্য পেতো। আলাদা ভাবে তার স্বীকৃতি ও মূল্যের গুরুত্ব ছিলো নিছক নগণ্য। পরিবার, গিল্ড ও গোষ্ঠীতেই তার ব্যক্তিত্বের সীমা নিরূপণ করা হতো। কিন্তু রেনেসান্স আন্দোলন ব্যক্তিকে এইসব সংগঠনের বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়। স্বকীয়তা থেকেই তার পরিপূর্ণতার কথা শোনায়। সমাজ বন্ধনকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা না দিয়ে সে নিজে নিজের ব্যক্তিত্বের বাধাবন্ধহীন জগতে পরিপূর্ণ হতে চায়! রেনেসান্সের বিখ্যাত প্রবক্তা ইতালীয় পিকো দিল্লা মিরানদোলা তাই ঘোষণা করেন 'মানুষ স্বেচ্ছায় দানব বা দেবতা যা-কিছু হতে পারে। কী সে হবে তা সম্পূর্ণ তার বিচারের বিষয়।' সংগঠনের প্রভাবমুক্ত এই ব্যক্তিকেই বুর্কহার্ট বলেন 'নতুন ব্যক্তি'। নতুন এইজন্যে যে সে আর সংগঠনের দ্বারা চালিত নয়! অথচ মানুষ কোনো অর্থেই সংগঠন ছাড়া বাঁচতে পারে না, সমাজকে এড়িয়ে যাবার কোনো পথ নেই তার। ছায়ার মতো সমাজ চলে তার সঙ্গে। তাই নতুন ব্যক্তির সংগঠনগুলোও তার আধুনিক সঙ্কল্প অনুযায়ী তৈরি হয়। অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে 'পরিবারে'র ধারণা বদলে যায়।

নতুন ব্যক্তি ও নতুন পরিবার

য়ুরোপীয় মধ্যযুগের এরিস্টটলপন্থী সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক সন্ত টমাস একুইনস মানুষকে সমাজ সংগঠনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছিলেন। মানুষ পরিবারবদ্ধ জীব, কারণ পরিবারই সমাজের প্রাথমিক ও মৌলিক সংগঠন। এই পরিবার শুধুমাত্র কোনো একজন ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছার দ্বারা সংগঠিত নয়। রক্ত-সম্পর্কিত বহু ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সহবাসকেই পরিবার বলা হতো। কিন্তু 'নতুন ব্যক্তি'র উদ্ভবে পুরোনো পরিবারের কাঠামোটি ভেঙে যায়। নতুন

পরিবার গড়ে ব্যক্তি ও তার নির্ধারিত পরিজনকে অর্থাৎ পরিবারের কর্তা, তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে নিয়ে। সম্পূর্ণ এককেন্দ্রিক ব্যক্তির নিজস্ব সঙ্কীর্ণ পরিমণ্ডল। পুরোনো পরিবারের কর্তা ছিলেন 'পেট্রিআর্ক'। তাঁর অধীনে বহু আত্মীয়-স্বজন। প্রত্যেকেই যে নিকটতম রক্ত সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ তা-নয়। শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত আত্মীয়বর্গ, দূরবর্তী রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়রাও থাকতেন। কিন্তু নতুন য়ুরোপীয় পরিবার সাক্ষাৎভাবে একটিমাত্র রক্তসূত্রে গ্রথিত, একটিই ধারা তার। স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান। নবজাগরণোত্তর য়ুরোপীয় চিন্তায় এই নতুন পরিবারের কথা, এই পরিবারকে কেন্দ্র করেই যাবতীয় আলোচনার সূত্রপাত।

ভারতীয় শাস্ত্রে পরিবার সর্বদাই যৌথ সম্পর্কে সত্য। পরিবার কোনোক্রমেই একক ব্যক্তি ও তার একরৈখিক প্রত্যক্ষ রক্ত-সম্পর্কের ধারা নয়। পরিবারের কর্তার (স্ত্রী বা পুরুষ যেই হোন) নির্দেশে জীবনযাত্রা চলতো। তাঁর তলায় নানা স্তরের সম্পর্ক ও নানা জাতের আত্মীয়তা। প্রত্যেকেই এক পরিবারভুক্ত ও একই কর্তার নির্দেশে পরিচালিত। পরিবার সম্পর্কে এমন ধারণার কারণ ভারতীয় সমাজে ব্যক্তিকে কখনোই সমাজের অংশ ছাড়া অন্য কিছু ভাবা হতো না। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও পরিপূর্ণতা চিরকালই সমাজের আদর্শ ও লক্ষ্যকে প্রকাশ করে। এই বক্তব্যের চিত্র পাই ভারতীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর মহাভারত ও রামায়ণ গ্রন্থে। অর্জুন যদিও একক বীরত্বে দ্রৌপদীকে লাভ করেছিলেন তবু বিজয়ের গর্ব ও ভাগ তাঁর একার নয়। পরিবারের প্রধান ব্যক্তি মা (কুন্তী)র নির্দেশ ছাড়া যশ লাভের উপায় নেই। মাতৃ-আজ্ঞায় তাই পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী হলো। মহর্ষি নারদ তাঁদের পরিবারধর্ম শিক্ষা দেন দ্রৌপদী প্রসঙ্গে। কুচক্রী, হীন কৌরবেরাও এক পরিবারভুক্ত জন্মান্ধ পিতার নির্দেশে পরিচালিত! রামায়ণের ভরত তাই মার প্ররোচনায় সিংহাসনের ভাগ নেন না, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে রেখে চোদ্দ বছর রাজত্ব করেন। কারণ পরিবার একক ব্যক্তির নয়, পরিবারের নিয়মে জ্যেষ্ঠের অগ্রাধিকার।

পরিবারের সংজ্ঞা নির্ধারণে তাই সর্বদাই ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্পর্কের কথা থাকে। রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিবারের সীমা কতোটুকু ব্যাপ্ত বা সম্প্রসারিত হবে তা নিয়েই মতবিরোধ। বর্তমানের প্রচলিত ধারণায় পরিবারের সীমা একমাত্র পরিবারের কর্তা একক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে।

বর্তমান য়ুরোপের নজীর থেকে বক্তব্যটি পরিষ্কার হবে। য়ুরোপে প্রাপ্তবয়স্ক হবার সঙ্গে সঙ্গেই সন্তানের উপর পিতামাতার কর্তব্য শেষ হয়। যে যার নিজের পথ ও নিজের পরিবার বেছে নেয়। পিতামাতাও থাকেন তাদের দু'জনার নিজস্ব পরিবারে। প্রত্যেকেই স্বাধীন ও প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। জীবনের কোনো পর্বেই য়ুরোপীয় ছেলেমেয়েরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে পিতামাতার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করেনা। ভালো হোক বা মন্দ হোক, তারা নিজেদের জীবন ও সংগঠন নিজেদের পছন্দ মতো গড়ে।

২। পরিবার কেনো মৌলিক ও প্রাথমিক সংগঠন? (Why family is fundamental and primary to man ?)

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি 'পরিবার' মানুষের মৌলিক ও প্রাথমিক সংগঠন ; কিন্তু পৃথিবীতে বহু দার্শনিক পরিবারের এই প্রতিষ্ঠা অস্বীকার করতে চান। য়ুরোপের প্রাচীনতম দার্শনিকদের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী প্লেটো পরিবারকে মানুষের জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় মৌলিক সংগঠন মনে করতেন না। বরং, পরিবারকে তিনি অন্যায়, অবিচার ও স্বার্থ-বোধের জনক মনে করেছেন। ওঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে, তাই পরিবার বাতিল হয়েছিলো। বিশেষত, দার্শনিক-শাসক ও সামরিক বাহিনীর জীবন থেকে তিনি পরিবারকে সমূলে উৎপাটিত করতে চেয়েছেন। সম্পত্তি ও রমণীর তিনি সম্পূর্ণ সাধারণীকরণ চেয়েছিলেন। ওঁর মতে এমন সাম্যবাদ হবে যে কারো নিজস্ব সম্পত্তি ও স্ত্রী থাকবে না। স্ত্রী না থাকলে পরিবারও থাকে না। পরিবার যদি সত্যিই মানুষের মৌলিক সংগঠন হয় তবে পরিবারহীন মানুষ মানুষ হতে পারে না। কিন্তু প্লেটোর কল্পনায় পরিবারবিহীন মানুষই শ্রেষ্ঠ মানুষ, কারণ সে স্বার্থবোধহীন। প্লেটোর মতোই বর্তমানকালে জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস জানান যে মানব সভ্যতার আদিতে পরিবার নামক কোনো সংগঠন ছিলো না। পরিবার এসেছে পরবর্তী কালে ইতিহাসের ধারায়।

পরিবার বিষয়ে মার্কস এঙ্গেলস হুবহু প্লেটোর মতো কথা বলছেন। প্লেটোর দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ছাড়াই তাঁরা ভবিষ্যতের কল্পনাটি যেহেতু পরিবারহীন সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় উপস্থিত করেছেন সেহেতু তাঁদের অধিকাংশ বক্তব্যই প্লেটোর অনুরূপ। ওঁরাও পরিবার ও সম্পত্তিকে স্বার্থের কেন্দ্র মনে করেছেন। পরিবার ও সম্পত্তি বিষয়ে প্লেটোর সঙ্গে ওঁদের শুধু একটা তফাৎ—ওঁরা সম্পত্তির ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ চেয়েছেন, পরিবার

বা রমণীর ক্ষেত্রে চাননি। এমন কি প্লেটোর মতো সমস্ত পরিবারকে উচ্ছেদ করবার কথাও ওঁরা বলেননি। মার্কস এঙ্গেলস শুধু বুর্জোয়া পরিবারকে ভাঙতে চেয়েছেন।

(ক) ভবিষ্যৎ সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার কল্পনায় মার্ক্স এঙ্গেলস মনে করেছিলেন পরিবার সংগঠনটি অনাস্থন্ত নয়। ওঁদের চিন্তায় সমাজ বিবর্তনের আদি পর্যায় হলো সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা। এই সমাজ-ব্যবস্থাটি প্রায় প্লেটো কথিত পর্যায়ের মতো, কারণ এখানে সম্পত্তির যেমন বিভাগ নেই, তেমনি ব্যক্তি-নির্ভর পরিবারও অনুপস্থিত। মর্গান নামক এক মার্কিন সমাজবিজ্ঞানীর গ্রন্থ 'আদিম সমাজ'কে ভিত্তি করে এঙ্গেলস দেখাতে চান যে সমাজ-বিবর্তনের তিনটি প্রধান স্তর—বন্যতা, বর্বরতা, সভ্যতা। সভ্যতার পর্যায়ে এসে ব্যক্তিগত পরিবারের জন্ম। সমাজ তখন শ্রেণীস্বার্থে বিভক্ত ও সমাজ পরিচালক হলো অর্থনীতির নিয়ন্তারা। এঙ্গেলস পরিবারের বিরুদ্ধে প্রমাণাদি মর্গান থেকেই সংগ্রহ করেন। তিনি জানান যে, আদিম সাম্যবাদী পর্যায়ে 'গোষ্ঠী-বিবাহ' (group marriage) প্রচলিত থাকায় যেহেতু একদল পুরুষের সঙ্গে একদল মেয়েদের বিয়ে হতো, সুতরাং সন্তানদের পিতৃ-মাতৃ পরিচয় অজ্ঞাত থাকতো। সন্তানকে ঘিরে কেউ কল্পনা ও স্বার্থ গড়বার সুযোগ পেতো না। কাজেই রক্ত-সম্পর্কিত একান্তভাবে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের পরিমণ্ডল পরিবারের দরকার হয়নি।

সভ্যতা পর্যায়ে পরিবারের প্রশ্ন

(খ) সমাজ-বিবর্তনের নজীর ছাড়াও পরিবারের মৌলিকতা ও প্রাথমিকতা বিষয়ে নানা প্রমাণ দেবার চেষ্টা করা হয়। একদল ভাষা-বিজ্ঞানী বলতে চেয়েছেন যে, পরিবারের সঙ্গেই যেহেতু ব্যক্তি বা আত্ম জড়িত, পরিবার গড়বার আগে ভাষায় নিশ্চয়ই আত্ম-বোধের প্রকাশ নেই। যেমন ওঁরা বলছেন, ভাষার ইতিহাসে প্রথমে পাওয়া যাচ্ছে 'আমরা' (we); 'আমি' (I) আসছে অনেক পরে। প্রথমে গোষ্ঠীর বোধ, পরে বিশ্লেষী-করণের মধ্যে আসে ব্যক্তির কথা। 'আমরা' শব্দটির মধ্যে কোনো একটি ব্যক্তির পরিচয় নেই, আছে সমগ্র গোষ্ঠীর পরিচয়।

ভাষার নজীর: 'আমরা'

(গ) সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজ বিবর্তনের ছকে পরিবারকে দেখেন অনেক পরবর্তী ধাপ হিসেবে। ওঁদের মনে একটি নীতি কাজ করে—যা হর্বর্ট

স্পেনসর ঘোষণা করেছিলেন যে, সমাজ বিবর্তন সর্বদাই সমষ্টি থেকে ব্যষ্টিতে যায়, কারণ বিবর্তনের নিয়ম নির্ভর করে বিশ্লেষীকরণের ওপর। তাই প্রথম মানব গোষ্ঠীকে দেখি যূথবদ্ধ গোষ্ঠীতে (tribe)। গোষ্ঠী নানা জাতের ও নানা সম্পর্কের লোকদের সংগঠন। বিভিন্ন রক্ত সম্পর্কের ব্যক্তিরা থাকে এই জনসমাবেশে; অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো রক্ত-সম্পর্কের সূত্রে ব্যক্তিদের সম্পর্ক গোষ্ঠীতে জানা যায় না। বৃহত্তর এই সংগঠনের মধ্যে পরবর্তী কালে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অন্য একটি সংগঠন তৈরি হয়। তাকে বলা যায় গোত্র (clan)। গোত্র রক্ত-সম্পর্কে সংগঠিত (kinship organisation)। এই গোত্রের মধ্যেই কালক্রমে আরো ছোট এবং একান্তভাবেই নিকট ও ঘনিষ্ঠ রক্তসম্পর্কে আবদ্ধ ব্যক্তিদের যে সংগঠনটি গড়ে তার নাম পরিবার। এই ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে পরিবার সমাজের আদি প্রতিষ্ঠান নয়।

গোষ্ঠী : পরিবার

(ঘ) জীববিদ্যার নজীর থেকে অনেক বিজ্ঞানী বলেন মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে পরিবার সংগঠনটি নেই। সুতরাং উচ্চতর প্রাণীর জীবনে অর্থাৎ মানুষের জীবনে পরিবার আদিতেই থাকবার কোনো প্রাকৃতিক কারণ নেই। প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে মানুষ বিবর্তনের উচ্চতর পর্যায়ে নানা সামাজিক অর্থনৈতিক কারণে পরিবার গড়েছে।

পরিবারের বিরুদ্ধে উপরোক্ত বক্তব্যগুলোর একটিকেও স্বীকার করা যায় না।

(ঙ) মর্গান তাঁর 'আদিম সমাজ' গ্রন্থে ইরকোয়াদের সম্পর্কে গোষ্ঠী-বিবাহের কথা তুলেছেন। কিন্তু পৃথিবীতে এটাই যদি আদি সমাজ-বিবর্তনের নিয়ম হয়, তবে সর্বত্রই নিয়মটি প্রযোজ্য। অধ্যাপক রবর্ট ব্রিফল্ট মর্গান ও এঙ্গেলসের দার্শনিক বক্তব্যের ওপর দাঁড়িয়ে ওঁর বিখ্যাত 'মাদার্স' গ্রন্থে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, গোষ্ঠীবিবাহের অনিবার্য পরবর্তী স্তর হলো মাতৃতন্ত্র এবং মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্রের মধ্য দিয়েই পরিবার এসেছে। কিন্তু ব্রিফল্টের এই বক্তব্য বিখ্যাত পোল মনীষী হ্বেস্টারমার্ক স্বীকার করেন না। ব্রিফল্ট-হ্বেস্টারমার্কের বিতর্কে আমরা জেনেছি পৃথিবীতে কোনো প্রান্তেই কোনো একটি নির্দিষ্ট নিয়ম কাজ করেনি। পিতৃতন্ত্র থেকে মাতৃতন্ত্র বা মাতৃতন্ত্র থেকেই পিতৃতন্ত্র এমন লৌহ নিয়মটি কোথাও নেই। তাছাড়া আজো পর্যন্ত কোনো নৃতাত্ত্বিক বা সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিত গোষ্ঠীবিবাহ নামক

গোষ্ঠী বিবাহ সামান্য সত্য নয়

অবস্থার সন্ধান দিতে পারেননি। সুতরাং গোষ্ঠীবিবাহের কারণে পরিবার ছিলো না বলা সম্ভব নয়।

(চ) ভাষার নজীরটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের এমন অবিসম্বাদী প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে বলতে হবে সর্বত্রই 'আমি'র আগে 'আমরা' এসেছে। তাছাড়া পরিবারের সঙ্গে 'আমি'র এমন অঙ্গাঙ্গী যোগ কেউ প্রমাণ করেননি যে জানা আছে পরিবার থাকলেই 'আমি' শব্দটি থাকতে হবে। অনেক পণ্ডিত গ্রাম সুবাদে প্রচলিত 'কাকা', মেসো' ইত্যাদি সম্বোধনকে পুরোনো গোষ্ঠীজীবন অর্থাৎ পরিবারহীন সংগঠনের স্মারক বলতে চান। 'কাকা', 'মেসো' ইত্যাদি সম্বোধন যেহেতু বহু লোককে করা হচ্ছে সেহেতু বিশেষ ব্যক্তির বোধ সমাজে ছিল না। এই বক্তব্যটির তাৎপর্য এমন নয় যে পরিবার অস্বীকৃত হচ্ছে ; কারণ, যে-কোনো সম্বোধনই তো তৈরি হয় নিকটবর্তী কোনো সম্বন্ধকে প্রকাশ করবার জন্যে। সম্বন্ধ নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করেই গড়ে।

'আমি' ও পরিবারের সংযোগটি কি ?

(ছ) ইতিহাসের ধারায় সমাজ বিবর্তনের ছকটি গোষ্ঠী থেকে পরিবার হলেও যৌক্তিক বিবরণে পরিবার আদি। কারণ পণ্ডিতরা একথা প্রমাণ করেননি যে বিবর্তনের ধারায় পরিবার থাকতে নেই। বরং উল্টোটাই সত্য। সমাজ যদি সম্পর্ক হয় তবে গোষ্ঠীতেও সম্পর্ক থাকতে বাধ্য। যদি সম্পর্ক থাকে তবে জনগোষ্ঠীর মতো বিরাট ও এলোমেলো সংগঠনে সম্পার্ক কাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়? সে কি কেবল বাঁচার জন্যে যে-যেমন খুশি এসে জড়ো হয়েছে? না, একত্র বসবাসের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ নিকট সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়—যাকেই আমরা বলি পরিবার? তাছাড়া প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষকে বংশবিস্তার করতে হয়, নারীদের সন্তান ধারণ করতে হয়, সুতরং নির্দিষ্ট সম্পার্কের ক্ষেত্র প্রকৃতিই প্রস্তুত করে রেখেছেন। কাজেই গোষ্ঠীতে পরিবার থাকতে বাধ্য।

গোষ্ঠীতেও পরিবার আছে

(জ) মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যেও পারিবারিক সম্পর্ক আছে। জুকারমান প্রভৃতি পণ্ডিতরা প্রমাণ করেছেন যে, একমাত্র মানুষেই সন্তানকে কেন্দ্র করে পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে না—সন্তানকে পালনের ভিত্তিতে পরিবার নিম্নতর প্রাণীতেও আছে।

মানুষের ক্ষেত্রে পরিবারের আবশ্যিকতার অন্য একটি মৌলিক কারণ

আছে। ইতিপূর্বেই দেখানো হয়েছে যে প্রকৃতিতে মানুষই একমাত্র সম্পূর্ণ অসহায় জীব। প্রতিকূল অবস্থায় প্রকৃতি নিজে থেকে মানুষকে কিছুই দেয় না। নিম্নেতর প্রাণী প্রকৃতির প্রত্যক্ষ সাহায্যে জন্ম থেকেই সম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। দিনে দিনে যদিও তার বৃদ্ধির প্রয়োজন তবু প্রাণীর ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য তার আয়ত্তের মধ্যে থাকে। কিন্তু মানুষের সন্তান জন্ম-কালে মানবিক কোনো বৃত্তি বা গুণের প্রকাশ করতে অক্ষম। তার নির্ভরতা সম্পূর্ণই পরিবেশের ওপর। মানুষী পরিবেশ ছাড়া সে মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। পরিবার তাকে এই পরিবেশ জোগায় ও মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করে। অবশ্য কেউ বলতে পারেন যে, তাকে দেখাশুনোর জন্যে পরিবারের প্রয়োজন নেই, গোষ্ঠী নজর রাখবে। কিন্তু বক্তব্যটির কোনো গুরুত্ব নেই; যেহেতু নবজাত শিশুর ভার স্বভাবতই জননীর ওপর থাকে বা স্বভাবতই জননী নবজাত শিশুকে মাতৃস্নেহে পালন করেন। জননীর স্থান কখনোই নৈর্ব্যক্তিক ও নির্বিশেষে গোষ্ঠী গ্রহণ করতে পারে না। কাজেই পরিবার মানুষের আদি ও মৌলিক সংগঠন।

৩। পরিবারের ভিত্তি (Basis of family)

এই সূত্রেই পরিবার বিষয়ে অন্য একটি প্রশ্ন ওঠে। অনেকে বলতে চান যে মানুষের বংশবৃদ্ধি ও জীবনরক্ষার প্রয়োজন নরনারীর দৈহিক সম্পর্ক প্রকৃতি-নির্দিষ্ট ব্যবস্থা। সুতরাং পরিবারের ভিত্তি নরনারীর দৈহিক সম্পর্কমাত্র।

ইংরেজি 'ফ্যামিলি' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'famulus' শব্দ থেকে, তার অর্থ 'গৃহপালিত দাস'। আর 'familia' শব্দটির তাৎপর্য হলো গৃহের সঙ্গে সম্পর্কিত দাসগোষ্ঠী। এই বক্তব্যে পরিবার মানুষের জীবনে স্বাভাবিক নয়, কেবলমাত্র দাস-ব্যবস্থার প্রয়োজনে সংগঠনের জন্ম। কিন্তু বর্তমানকালে সাধারণতই পরিবারকে যৌন সম্পর্কের সংস্থা (sex unit) হিসাবে ভাগ করা হচ্ছে। এই যৌন সম্পর্কের ভিত্তি প্রাকৃতিক এবং সম্পর্কটির প্রয়োজন বংশরক্ষা। অর্থাৎ পরিবারের সমগ্র উদ্দেশ্যটি প্রয়োগতাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক (pragmatic)। এই প্রয়োগতাত্ত্বিক বক্তব্য স্বীকার করলে পরিবারকে আমরা স্বাভাবিক সংগঠন হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না। কারণ বংশবিস্তার এখানে এমন একটি সচেতন কর্ম—যা না থাকলে পরিবারের কোনো প্রয়োজন থাকে না, প্রয়োগ ফুরিয়ে গেলে যেমন সংগঠনের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়।

মানুষকে নিতান্ত ব্যবহারিক ও প্রয়োগবাদী ভাবলেই পরিবারের এমন সঙ্কীর্ণ ভিত্তি কল্পনা করা যায়। যৌন সম্পর্ক না বললেও ল্যাটিন ভাষাতেও যেমন দাসদের সূত্রে পরিবারকে ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাবার একটি হাতিয়ার মনে করা হয়েছে। যৌন সম্পর্কের সংগঠন বললেও পরিবারকে তেমনি একটি হাতিয়ার ভাবা হয়। অর্থাৎ এই বক্তব্য অনুযায়ী পরিবার স্বাভাবিক সংগঠন নয়, কেবলমাত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাহন। পরিবারের ভাঙন প্রসঙ্গে আমরা এই বক্তব্যটির গুরুত্ব অনুধাবন করবো।

বর্তমান সঙ্কীর্ণ প্রয়োগতত্ত্বের বাইরে অন্য কোনো বৃহত্তর উদ্দেশ্য যে পরিবারের পেছনে কাজ করে তার প্রমাণ আমরা বার বার আলোচনা করেছি। মানুষের কোনো দৈহিক প্রয়োজন মেটাবার সাময়িক মাধ্যম বা আরো কিছুটা সুদূরপ্রসারী প্রয়োজন সিদ্ধ করবার মাধ্যম হিসেবে পরিবার সংগঠিত হয়নি। 'পরিবার মানুষকে মানুষ করবার প্রয়োজনেই গোড়া থেকে বিধি-নির্দিষ্ট'—এই বক্তব্যে ভাগ্য বা ঈশ্বর বিষয়ে ভাববার প্রয়োজন নেই। প্রাকৃতিক কার্য-কারণেই মানুষ, পরিবার-বিহীনভাবে মানুষ নয়। কাজেই প্রয়োগ বা ব্যবহারিক প্রয়োজনের কথা আসে অনেক পরে যখন মানুষ পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বে অধিষ্ঠিত। মানুষ যদি মানুষই না-হবে তো তার মানবিক ব্যবহার কোথা থেকে তৈরি হবে? সুতরাং স্বামী-স্ত্রী বা নরনারীর দৈহিক মিলন বা বংশবিস্তারের প্রয়োজনেই পরিবার গড়েনি। পরিবার নিতান্তই মানুষকে মানুষ করবার জন্যে স্বাভাবিক সংগঠন। এই স্বাভাবিকতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সন্তান পালনের মধ্যে নিহিত। তাই দৈহিক সম্পর্ক বা যৌন সম্পর্কের মধ্যে নিহিত থাকে অন্য কোনো বৃহত্তর উদ্দেশ্য। ফল বা পরিণতির (অর্থাৎ সন্তান পালনের) লক্ষ্যেই পরিবার নামক সংগঠনটি বাঁধা। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি তাই সঠিক বলেন যে 'If we may treat the family as a little state, the child is its legitimate sovereign.' (Outlines of social philosophy. page 10)।

পরিবার : মানুষকে মানুষ করবার জন্য

অধ্যাপক ম্যাকাইভর যৌন-সম্পর্ক ও সন্তান পালন মিলিয়ে একটি সংজ্ঞা তৈরি করেছেন। ওঁর মতে 'The family is a group defined by a sex-relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children.' যৌন সম্পর্ককে অধ্যাপক

ম্যাকাইভর যথেষ্ট পরিমাণে স্থায়ী বলতে চাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী যৌন-সম্পর্কের বক্তব্যটি কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক কারণ প্রাণ-বিবর্তনের একটি বিশেষ ধাপ থেকেই প্রাণীরা দৈহিক মিলনের পথে বংশ বিস্তার করছে। এই দৈহিক মিলনটি প্রকৃতির দান। সুতরাং বহু উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রেই সত্য। একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ বলে কিছু নেই। কাজেই যা সবার ক্ষেত্রে সত্য তাকে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নামে মানুষের প্রসঙ্গে চালাবার কোনো মূল্য নেই। অধ্যাপক ম্যাকাইভর কেবলমাত্র 'যথেষ্ট পরিমাণ স্পষ্ট ও স্থায়ী' বিশেষণটি জুড়ছেন। কিন্তু এই বিশেষণটি আইনের কথা, সমাজতত্ত্বের নয়। যে-কোনো রকম সম্পর্ককেই আমরা সমাজতত্ত্বে স্বীকার করে নিয়েছি। আসলে অধ্যাপক ম্যাকাইভরও যৌন-সম্পর্ককে পরিবারের ভিত্তি মনে করেন, তাই লেখেন—পরিবার সংগঠনটি '*defined*' অর্থাৎ যৌন-সম্পর্ক দ্বারা সংজ্ঞা-নির্দিষ্ট। কিন্তু যেহেতু যৌন-সম্পর্কেই সন্তান সম্ভাবনা সুতরাং তিনি বংশরক্ষা ও বংশবিস্তার নামক শব্দ দুটি জুড়ে দিচ্ছেন যাকে ইতিপূর্বেই আমরা নিছক প্রয়োগতাত্ত্বিক বলেছি। কাজেই আমাদের বক্তব্য এই যে, অধ্যাপক ম্যাকাইভরের সংজ্ঞাও দার্শনিকভাবে সঙ্কীর্ণ।

পরিবারের বাহ্য চরিত্র বিষয়ে অধ্যাপক ম্যাকাইভর অবশ্য মোটামুটি-ভাবে সঠিক লেখেন—পরিবারে থাকবে (১) সহবাসের সম্পর্ক, (২) বিবাহ কিংবা কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা যার ওপর সহবাস দাঁড়িয়ে, (৩) নামকরণ ও বংশগঠন পদ্ধতি, (৪) সন্তান প্রতিপালনের অর্থকরী ব্যবস্থা ও (৫) একটি নির্দিষ্ট বাসস্থান। অধ্যাপক ম্যাকাইভর ও অধ্যাপক পেজ পরিবারের আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেন।

(ক) বিশ্বজনীনতা—সমাজ বিবর্তনের সব স্তরে, স্থানকালপাত্র নিরপেক্ষভাবে এই সংগঠনটি সর্বত্র উপস্থিত।

(খ) আবেগময়তা—ব্যক্তির জীবনের অসংখ্য আবেগ (অনুরাগ ও বিরাগ ইত্যাদি) স্বাভাবিক বৃত্তির বাইরে সমাজেই প্রকাশিত হয়। পরিবার সমাজের কেন্দ্র তাই পরিবারেই আবেগের প্রথম প্রকাশ ও শিক্ষা।

(গ) সংগঠনী প্রভাব—মানুষের জীবনকে অধ্যাপক জে. বি. এস হলডেন বলেছেন সবচেয়ে বেশি পলিমর্ফিক ও পলিটাইপিক। এই বক্তব্য দুটি দিয়ে অধ্যাপক হলডেন বোঝাচ্ছেন যে, মানুষের জীবনেই বহুরূপত্ব ও

বহুবর্গত্বের সম্ভাবনা। পরিবার এই সম্ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। অধ্যাপক হলডেনের উদাহরণে জানি একটি বেড়ালছানা তার জন্মের কিছুকাল পর পর্যন্ত ইঁদুরকে মারতে না দেখলে সে ইঁদুর মারা জানবে না! কিন্তু মানব শিশুর ক্ষেত্রে বলা যায় না সে কী করবে। তবু পরিবারের মধ্যে বৃত্তিসমূহ মোটামুটিভাবে একটা রূপ পেতে থাকে। যদিও সেই রূপটি সে পরিত্যাগ করতে পারে।

(ঘ) সীমাবদ্ধতা—পরিবার সমাজের সবচেয়ে ছোটো সংগঠন।

(ঙ) সমাজ-সংগঠনের কেন্দ্র—সমাজ কার্যত পরিবারের সমষ্টি। সুতরাং পরিবারকে সমাজ সংগঠনের কেন্দ্র বলা চলে।

(চ) দায়িত্ববোধ—পরিবারের প্রতিই ব্যক্তিদের সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব। কারণ পরিবারকে সে নিজের জীবনের অঙ্গ মনে করে।

(ছ) সামাজিক বিধি—পরিবারের মাধ্যমেই সামাজিক বিধি-নিষেধ (do's and donts) প্রকাশ পায়।

(জ) স্থায়িত্ব—পরিবার প্রাথমিক ও মৌলিক সংগঠন হলেও তাতে নিত্য পরিবর্তনের লীলা চলে। কিন্তু পরিবারের গঠনে বাহ্যত যতো পরিবর্তনই হোক, পরিবার মৌলিক সংগঠন হিসেবে সর্বত্রই উপস্থিত।

৪। **পরিবারের রূপ (Forms of Family)**

পরিবারকে নানাভাগে ভাগ করা হয়। বিবাহ সূত্রে পরিবারকে ভাগ করা হয় (ক) একবিবাহগত (monogamy) ও (খ) বহুবিবাহগত (polygamy)। এক বিবাহগত পরিবারের গঠন একজোড়া স্বামী স্ত্রীকে ঘিরে। বহু বিবাহগত পরিবারে এক স্বামীর বহু স্ত্রী থাকতে পারে বা এক স্ত্রীর বহু স্বামী থাকতে পারে। বংশানুক্রমের সূত্রে পরিবারকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। (গ) মাতৃতান্ত্রিক (matriarchy) ও পিতৃ-তান্ত্রিক (patriarchy)। যে-পরিবারে মাকে কেন্দ্র ধরে বংশাবলী মার দিক থেকে হিসেব করা হয় তাকে বলে মাতৃতন্ত্র। পিতাকে কেন্দ্র করে বংশধারার হিসেব করা হলে পাই পিতৃতন্ত্র। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত।

ভারতবর্ষে যৌথ-পরিবার (joint family) নামে আর এক ধরনের পরিবার আছে যেখানে একজন কর্তার অধীনে বহু আত্মীয়স্বজন একই সঙ্গে বসবাস করে। অনেক জোড়া স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি তাতে থাকে।

৫। পরিবারের কর্তব্য (Functions of Family)

(ক) সমাজের প্রাথমিক ও মৌলিক সংগঠন হিসেবে পরিবারের প্রধান কর্তব্য জীবনের ধারা রক্ষা করা ও মানুষের পরিণত মানুষ হবার স্থির পরিবেশের ব্যবস্থা করা। ইতিপূর্বেই আলোচনায় দেখানো হয়েছে পরিবার মানুষের জীবনে নিতান্তই স্বাভাবিক এবং পরিবার ছাড়া মানুষ কখনোই মানুষ হবে না। সুতরাং মনে রাখতে হবে পরিবারই সমাজের মৌল প্রতীক অর্থাৎ পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূত্রেই আমরা সমাজের তাৎপর্য বুঝি। কাজেই পরিবারের এই মৌলিক ও প্রধান কর্তব্যটি কোনো অর্থেই কেউ সচেতনভাবে স্থির করে না, তা স্বভাবতই পরিবার নামক সংগঠনটির স্বকীয় চরিত্রে নিহিত।

জীবনধারা রক্ষা করা

পরিবার প্রথমত তাই জীবনের পরম্পরা রক্ষা করে ও দ্বিতীয়ত প্রাকৃতিক নিয়মের ঊর্ধ্বে মনুষ্যত্বের ধারক ও বাহক হয়। মানুষ সহজেই মানুষ হয়ে ওঠে তার একান্ত দীর্ঘস্থায়ী অসহায়তা সত্ত্বেও এই কারণে যে পরিবার পরম্পরাগত জ্ঞান, চর্চা ও সংস্কৃতির বীজকে সংহত, ঐক্যবদ্ধ ও প্রাণবান রাখে। মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে নানা ধাঁধাঁর সমাধানটি তারা যদিও জানতে পারে নিছক ব্যক্তিগত প্রয়াসে অসংখ্য ভুলত্রুটির মধ্য দিয়ে তবু এই জ্ঞানটি কোনোক্রমেই পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে যেতে পারে না। অর্থাৎ মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রবাহ ও পরম্পরা নেই। অথচ মানুষ জ্ঞানকে বংশধারায় ও সংস্কৃতির প্রবহমাণ ঐতিহ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে বলেই ধাপে ধাপে উন্নতির শিখরে ওঠে ও তার চর্চায় সাধারণতই কোনো ছেদ পড়ে না। 'সেই সুদূর অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীত থেকে বর্তমানের বিচিত্র ঐশ্বর্যের মধ্যে একটা ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়, নানা সভ্যতার উত্থান পতনেও জ্ঞানের ধারায় উন্নতির ক্রম-বিবর্তিত পর্যায়টি সহজেই চলতে থাকে। এটা যে সম্ভব তার কারণ পরিবার এই জ্ঞানভাণ্ডারকে জিইয়ে রাখে ও বংশধরদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। সময়ের প্রবাহে পরিবার তাই জীবনের কেন্দ্র ও জীবনের নির্দেশক। বানর জাতীয় প্রাণীদের পেছনের পায়ে দাঁড়াতে পঞ্চাশ হাজার বছর লেগেছিলো কিন্তু নবজাত মানব শিশুকে হাঁটা শিখতে কয়েকদিনের বেশি সময় দিতে হয় না। পঞ্চাশ হাজার বছরের শিক্ষা ও দক্ষতা তার আয়ত্তে প্রায় এক লহমাতেই আসে,

মনুষ্যত্বের ধারক

কারণ পরিবার এই জ্ঞানকে ধরে রেখেছে। পরিবার তাই মানুষের প্রাণ ও জ্ঞানের পরিমণ্ডল, মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের আকর।

(খ) সার্জেণ্ট তাঁর 'সাইকোলজি অব ম্যারেজ এণ্ড দি ফ্যামিলি লাইফ' গ্রন্থে লিখেছেন—

"The very first and essential condition, then for successful family life is selfless love between parents, love which will enrich atmosphere of the home and make for the complete fulfilment of each personality within the house-hold",

সার্জেণ্ট 'আত্মত্যাগী ভালোবাসা'কে পরিবারের ভিত্তি বলছেন। পরিবার কিন্তু এই ত্যাগ ও ভালোবাসার বোধকে শেখায়।

মানবিক বৃত্তি শেখায়

পরিবারের মধ্যেই ব্যক্তিরা প্রাকৃতিক বৃত্তির বাইরে স্নেহ প্রেম মায়া মমতা ইত্যাদি গুণাবলীর পরিচয় পায় এবং নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করে। এক কথায় বলা যায়, পরিবারই ব্যক্তিকে সমাজের যোগ্য মানুষ করে তোলে। ইংরেজীতে একটি কথা প্রচলিত আছে 'charity begins at home'। জন্মেই শিশু যেহেতু পরিণত বিচার বুদ্ধির অধিকারী নয় সেহেতু সে তার চারপাশ থেকেই পাঠ গ্রহণ করতে থাকে। পরিবার যেমন পরিবেশ তৈরী করে; সন্তানরা মোটামুটিভাবে তা-ই শিখবে।

জীববিজ্ঞানী জন্ বুরিডান স্যাডার্সন হলডেন মানুষকেই সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতার অধিকারী বলেছেন। স্বাধীনতার অর্থ এই যে মানব শিশুর সম্ভাবনা অনন্ত। হলডেনের ভাষায় মানুষই সবচেয়ে বেশী 'polymorphic' অর্থাৎ বিভিন্ন রূপ নেবার ক্ষমতায় মানুষ অদ্বিতীয়। অথচ গোড়া থেকেই জানা নেই কী তার ভবিষ্যতের রূপ হবে। কিছুটা পরিমাণে যদিও মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের মতো প্রকৃতির নিয়মের অধীন কিন্তু বংশানুক্রমে সেই সবচেয়ে কম নিয়ন্ত্রিত।

এই অনন্ত সম্ভাবনাময় মানবশিশু তার চরিত্রের প্রাথমিক রূপ পায় পরিবারে। অবশ্য পরিবারের ছাঁচেই তার [illegible]সম্পূর্ণভাবে গড়েনা কিন্তু পরিবার তার বিবর্তনের ধারায় সাহায্যমাণ জীবনের কারণে সন্তানদের প্রতিকূল হলে তার অনেক বাধা এবং দিতে হচ্ছে। তারা পারিবারিক অপচয় হয়। আবার তেমনি অনুকূল [illegible]কা ও শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত হচ্ছে পরের খবর আনা যায়, এবং সে কি হবে তা

কার্যত পরিবার তাই মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় মেলে ধরে মানব শিশুর কাছে। প্রতিমুহূর্তেই তাই পরিবারকে প্রস্তুত থাকতে হয়, নিজেকে নানা শিক্ষায় প্রস্তুত করতে হয়। ভারতবর্ষে যেমন জীবনের লক্ষ্যকে চারটি অপবর্গে ভাগ করা হয়েছিলো : ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ।

সংস্কৃতি রক্ষা করে

ধর্ম ছিলো নিয়ন্ত্রক। এই চতুবর্গের সাধনায় জীবনকে চতুরাশ্রমে ভাগ করে এক একটি পর্বে এক একটি চর্চার ব্যবস্থা ছিলো। জীবনের প্রধান দুটি আশ্রম ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্যের পাঠ মিলতো পরিবারে। প্রতিটি পরিবারকে এই দায়িত্ব পালন করতে হতো। সমস্ত ক্ষেত্রেই যে পরিবার সচেতনভাবে শেখায় বা পাঠ দেয় তা-নয়। পরিবারের চিন্তা ও জলবায়ুতেই শিক্ষা লুকিয়ে থাকে। যেমন বর্তমান অবধিও আমরা দেখেছি সাধারণ হিসেব মতো 'অশিক্ষিত' আমাদের দাদু-ঠাকুরমা মাসী-পিসীরা নানা গল্প, ছড়া, ব্রত, পাঁচালী ও রামায়ণ মহাভারতের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির বক্তব্যকে কয়েক সহস্র বছর ধরে লালন করে এসেছেন এবং বংশধরদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে নিজেদের মহৎ দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্যাভলভ কুকুর নিয়ে পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন যে তাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মানুষের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের কথা উঠ্‌ছে না কিন্তু পরিবার অনেকটাই আমাদের মনকে চালিত করতে পারে। ফ্রয়ডের যুগান্তকারী আবিষ্কারেও জানি যে মানুষের ক্ষেত্রে মহৎ ভাবধারার মুল্য অসীম। পরিবার সমাজ ও প্রাণের সঞ্জীবনী শক্তিকে যেমন জিইয়ে রাখে তেমনি ব্যক্তিদের শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সে-বিষয়ে সচেতন করে তোলে। মহামতি প্লেটো এ-কারণেই শিক্ষাকে এতো বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে ছিলেন। যদিও তিনি পরিবারকে বাতিল করতে চেয়েছেন তবু শিক্ষার প্রাণোৎসারী মূল্যের সূত্রেই আমরা বলতে পারি যে পরিবার ছাড়া ব্যক্তির জীবনকে গড়বার ক্ষমতা আর কারো বেশি নেই।

বর্তমান সমাজ-[illegible], জীবনে নির্দিষ্ট স্থিতির অভাবে, পরিবারের
জাবনের কেন্দ্র ও জীবনের। [illegible]রো গুরুত্ব পাচ্ছে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে
পায়ে দাঁড়াতে পঞ্চাশ হাজার [illegible]য, শুধুই আত্মপীড়ন তখন ও গ্লানি একমাত্র
শিশুকে হাঁটা শিখতে কয়েকদি[illegible] কারণ সভ্যতার সমস্যা মুলতই মানবিক
হাজার বছরের শিক্ষা ও দক্ষতা তা[illegible] প্রথম পরীক্ষা ও স্বীকৃতি।

(গ) অনেকে, যেমন অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি, পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মের কথা বলেছেন। কিন্তু অর্থনৈতিক কর্তব্য নামে পরিবারের পৃথক কোনো কর্ম নেই। আমরা বলেছি যে পরিবার জীবনের ধারা রক্ষা করে। প্রাণের অধিষ্ঠান ছাড়া সংস্কৃতির কথা ওঠে না। প্রাণ রক্ষা করাটাই অর্থনৈতিক কর্ম। সুতরাং পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্ব আছে। কিন্তু এই কর্মটি এতোই প্রাথমিক ও সর্বজনীন যে তাকে কর্তব্য ও কর্মের তালিকায় আলোচনা করবার প্রয়োজন থাকে না।

৬। পরিবারের দুর্বলতা (Weaknesses of the Family)

পরিবার মানুষের স্বাভাবিক সংগঠন যদিও অনেকে মনে করেন পরিবারের ভিত্তিতে নানা সামাজিক অর্থনৈতিক কারণে ফাটল ধরে। পরিবার সঙ্কটের মুখে দাঁড়ায় ও কখনো কখনো ভাঙনের চাপ আসে পরিবারের ওপর। এই সঙ্কটের কারন নানাবিধ।

বাইরের আকর্ষণ

(ক) পারিবারিক সংহতি ও ঐক্যের ওপর প্রধান চাপ আসছে বাইরে থেকে। বর্তমানকালে সমাজ এতেই ব্যাপ্ত ও সুদূর প্রসারিত যে কমের জগত বিশ্বব্যাপী হয়ে পড়েছে। প্রাচীন ভারতীয় গ্রাম-সমাজ আর নেই যে তার স্বয়ং-সম্পূর্ণতার মধ্যে বিভিন্ন পরিবারের কর্মোত্তম সীমাবদ্ধ থাকবে, ঘরের ছেলে ঘরেই তার সত্তার পূর্ণতা লাভ করবে। গ্রীক নগর-রাষ্ট্রটিও আর নেই যে পরস্পরের চেনাশোনায় সহযোগিতার নিকট ও ঘনিষ্ঠ জগতটি পাওয়া যাবে কর্মের চারপাশে। বর্তমানকালে পরিবর্ধিত সমাজদেহে ব্যক্তিকে কর্মচক্রে দেশ দেশান্তরে ঘুরতে হচ্ছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন হয়েছে যে ব্যক্তিদের প্রতিনিয়ত পরিবার ছেড়ে দূর দূরান্তরে যেতে হচ্ছে। পেশার চাপে পরিবারের অন্তর্নিহিত ঐক্যটি বারবার তাই ধাক্কা খাচ্ছে। স্বয়ং-সম্পূর্ণ ঘনিষ্ঠ পরিমণ্ডলের পরিবর্তে বর্তমানে তাই পারিবারিক সংযোগ মূলতই আর্থিক লেনদেনের স্তরে এসে যাচ্ছে। পরিবারের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছেন নিঃসঙ্গ পিতামাতা। সন্তানেরা ঘুরছে নানাস্থানে তাদের পরিবার নিয়ে। এমনকি তাদেরও বহুক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ জীবনের কারণে সন্তানদের আবাসিক বিদ্যালয় ইত্যাদিতে রেখে দিতে হচ্ছে। তারা পারিবারিক স্নেহ-মমতার বদলে কঠিন দিনতালিকা ও শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত হচ্ছে পরের আশ্রয়ে।

শিল্পোন্নত দেশে এই সমস্যাটি আরো মারাত্মক চেহারা নিয়েছে। পুরোনো পারিবারিক সংগঠনে স্ত্রী বা সন্তানের জননী পরিবারের বাইরে তাঁর আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজতেন না। সংসারের রাশটি নিজের হাতে রেখে সন্তানদের মানুষ করার দিকেই নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। কিন্তু বর্তমানে মহিলারাও পুরুষদের সঙ্গে বাইরের কর্মে সহযোগী। সুতরাং দশটা পাঁচটার কর্মচক্রে তারাও বাঁধা পড়ায় পরিবারের ভার কারো হাতে থাকছে না। সন্তানেরা হয় মানুষ হচ্ছে ঝি, ইত্যাদির কাছে অথবা নার্সারি-ক্রেশ ইত্যাদিতে। শিশুরা মা-বাবার সাহায্য ও মমতা থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে। শিক্ষা শুরুতেই পরাশ্রিত হওয়ায় শিশুদের সম্পর্কের জ্ঞান দূরবর্তী হচ্ছে এবং শিক্ষা নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠেছে। আমেরিকা ও রুশদেশেই এই সমস্যাটির গভীরতা মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিয়েছে।

(খ) পরিবার ও রাষ্ট্রের বিরোধে পরিবার নিতান্ত অসহায়। সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র ব্যক্তিকে তার এলাকাধীন মনে করতে পারে। ব্যক্তির উন্নতি ও মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে তার ভাবনা পরিবারের ভাবনায় বিরোধী হতে পারে। সেক্ষেত্রে পরিবারকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মানতেই হয়। রাষ্ট্র যে প্রতিক্ষেত্রেই সাক্ষাৎভাবে পরিবারের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তা নয়। সমাজের হাওয়ায় এমন সব ধারণা ছড়িয়ে থাকে যে পরিবার ও ব্যক্তির ওপর অকথিত চাপ পড়তে থাকে। যেমন উদাহরণত বর্তমানের ভারতবর্ষ। সম্প্রতিকালের ইতিহাস থেকে জানা যাচ্ছে যে দেশজুড়ে শিক্ষাকে প্রয়োগমূল্যেই ভাবা হচ্ছে, অর্থকরী কৃতকার্যতার হাতিয়ার হিসেবে ভাবা হচ্ছে। শিক্ষা আর শিক্ষার জন্যে নয়, শিক্ষা প্রাণধারণের জন্য বা দেশ গঠনের শিল্পকর্মের জন্য। কারিগরী শিক্ষার তাই এতো মূল্য। সামাজিকভাবে তাই পণ্ডিতের চাইতে কৃতবিদ্য ব্যক্তির মূল্য অনেক বেশি। ফলত, তখন এই আবহাওয়ার চাপ পরিবারের ওপর পড়ে এবং পরিবারগুলো সেইমতো নিজেদের চরিত্র ও চিন্তা ভাবনাকে মোড় ফেরাতে চায়। পরিবারের মধ্যে বিরোধ ঘনিয়ে ওঠে। পণ্ডিতের পরিবারে কারিগরী কুশলতার দাপট পুরোনো ঐক্য, সম্প্রীতি নষ্ট করে। বিভিন্ন পরিবারে নিরাপত্তার প্রশ্নটা এতো জটিল ও বিপদজ্জনক স্তরে আসে যে পরিবারের সত্তা সঙ্কীর্ণ সুতোর ওপর ঝুলতে থাকে। এই সমস্যাটা বাড়ে যখন রাষ্ট্র এই অবস্থাকে সমর্থন করে।

রাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধ

(গ) অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি সঙ্গীলাভের আকাঙ্খা, বন্ধুত্ব ইত্যাদিকেও পরিবারের বাধা মনে করেন।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে পরিবার তখনই বিপদগ্রস্থ হয় যখন ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সঙ্গে তার স্বার্থের বিরোধ ঘটে। কিন্তু এই বিরোধের প্রকৃতি বুঝবার আগেই দেখা যাচ্ছে অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জিরা বর্তমান য়ুরোপীয় জীবনযাত্রার সঙ্কটকে পরিবারের চিরকালীন সমস্যা বলতে চাচ্ছেন। কিন্তু পরিবারের মূল দার্শনিক সমস্যা কখনোই তা নয়। এখানে বিরোধের দুটি উৎস জানা গেছে। একটি রাষ্ট্র ও অন্যটি শিল্প ব্যবস্থা। আমরা জানি শিল্পব্যবস্থা একান্তই সম্প্রতিকালের। রাষ্ট্র ও পরিবারের বিরোধটা অন্য কোন কারণের ফলমাত্র।

রাষ্ট্র ও পরিবারে বিরোধ নেই

আসলে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র, রাষ্ট্র ও পরিবারের বিরোধটা কল্পনা করেন গণতান্ত্রিক পণ্ডিতবর্গ। হবস্ ও লকের মতো দার্শনিকরা রাষ্ট্রকে চুক্তিতত্ত্বে খুঁজতে চান এ-কারণেই যে ওঁরা গোড়াতেই ধরে নেন রাষ্ট্র স্বাভাবিক নয়, বাধ্যতামূলক একটি সংগঠন মাত্র। রাষ্ট্র যদি সত্যই বাধ্যতামূলক একটি সংগঠন হয় তবে ব্যক্তির সঙ্গে তার বিরোধ থাকবেই। অথচ প্লেটো, এরিষ্টটল এবং হেগেল য়ুরোপে দেখান যে রাষ্ট্র আসলে ব্যক্তিরই পূর্ণতার প্রকাশ অর্থাৎ রাষ্ট্রেই ব্যক্তি তার সমগ্র সত্তাকে পূর্ণতায় বিকশিত করে। ব্যক্তির পূর্ণতা তখনই যখন সে পরিণত। পরিণতি কোনো মুহূর্তেই নির্দিষ্ট নয়। ব্যক্তিকে সর্বদাই তার সত্তার যুক্তি ও আকর্ষণে চলতে হয়। যেমন আম গাছের পরিণতি পরিপক্ব আমে এবং পরবর্তী সম্ভাবনার বীজে। যদি তা না হয় তবে বলা হবে তার সত্তায় বাধা পড়েছে এবং অবস্থাটা অন্যায় ও অপ্রাকৃত। রাষ্ট্র প্রকৃত সত্তায় কখনোই ব্যক্তিসত্তার বিরোধী নয় সুতরাং পরিবারেরও বিরোধী নয়। বিরোধ সত্য হলে বুঝতে হবে হয় ব্যক্তি নয়তো রাষ্ট্র সত্য নয় অর্থাৎ পরিণতির দিকে চলছে না। বর্তমানকালে সমাজ ও রাষ্ট্র যদি পরিবারের সংহতি নষ্ট করে থাকে তবে নিশ্চয়ই অন্যায়ের বীজ রয়েছে রাষ্ট্রের অপূর্ণতায়। রাষ্ট্র ও ব্যক্তিতে বিরোধ তখন দেখা দেয় যখন রাষ্ট্র অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ব্যক্তিকে কেবলমাত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার মনে করে। জর্মন দার্শনিক কাণ্টতাই বলেছিলেন, মানুষকে কখনোই হাতিয়ার মনে করবে না, পরিপূর্ণ লক্ষ্য মনে করবে। কাণ্ট বলতে চেয়েছেন যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ব্যক্তিরই জন্যে।

বর্তমান শিল্পব্যবস্থার দুর্দৈব সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিকল্পনায় দূর করা যায়। স্বয়ংসম্পূর্ণ বিকেন্দ্রিকৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নির্দিষ্টকেন্দ্র ব্যক্তিদের ছড়িয়ে দিতে পারলেই ভ্রাম্যমাণ, যাযাবরী অবস্থার অবসান ঘটবে। তখন পুরোপুরি না হলেও বহুলাংশেই বিরোধটা কেটে যাবে।

৭। পরিবার ভাঙবার কারণ (**Causes of the breakdown of family**)

ইতিহাসে আমরা দেখেছি য়ুরোপের প্রাচীন পরিবার ভাঙে মধ্যযুগের শেষে রেনেসান্সে। আর ভারতবর্ষে পরিবার ভাঙতে শুরু করেছে ইংরেজ আমল থেকে। রেনেসান্সে পরিবারের আদর্শ এসে দাঁড়ায় দুটি ব্যক্তিতে, স্বামী ও স্ত্রীর যৌন সম্পর্কে। সন্তানের কথা অবশ্য তখনো ছিলো কিন্তু কালক্রমে সন্তান বাদ পড়তে থাকে, দুটি ব্যক্তির দৈহিক সম্পর্ক ও ওই সম্পর্কের কারণে রীতিবদ্ধ সংগঠনকে পরিবার বলা হতে থাকে। অনেক পণ্ডিতের বক্তব্য এই যে নতুন পরিবার ও ব্যক্তির ধারণা আসে পণ্যোৎপাদন প্রথার সঙ্গে। এই বক্তব্যটি সম্পূর্ণ সত্যি না হলেও পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তিকে তার অবস্থান, সংস্কার ও ধর্ম-কেন্দ্রিক বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ অন্য জগতে স্থাপন করে। ব্যক্তিরা সংস্কারমুক্ত হবার ফলে নিজেদের এতোই স্বাধীন মনে করতে থাকে যে সর্বত্রই সে নিজেকে একক ও স্বতন্ত্র বলে ঘোষণা করে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতীক হন একক রবিনসন ক্রুশো। দিফোর এই বিখ্যাত উপন্যাসটির মতোই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ ঘোষণা করেন যে অর্থনৈতিক জগতটি হলো স্বাধীন একক ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বাধীন লেনদেনের সম্পর্ক। ব্যক্তির স্বাধিকার এতোই ব্যাপ্ত হয় যে পরিবার দুটি স্বাধীন ব্যক্তির স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার কারণেই পরিবার প্রায় একটি চুক্তির মতো যে, যতোদিন প্রেম ততোদিন একত্র আবাস। কেউ কারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলেই চুক্তিটি ভেঙে দিতে হবে। তারপর আবার যে যার মতো স্বাধীন হয়ে উঠবে। রাজনীতিতে এই চুক্তি প্রতিষ্ঠা করেন টমাস হব্‌স ও জন লক। রাষ্ট্র একটি অংশীদারত্ব এবং পরিবারও তাই।

পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থা

সুতরাং পরিবার ভাঙবার দুটি কারণ প্রস্তুত থাকে। একটি

আভ্যন্তরীণ ও অন্যটি বাইরের। বাইরের চাপটি হলো শিল্পব্যবস্থা, রাষ্ট্র ইত্যাদির বহির্মুখী আকর্ষণ। ভেতরকার এবং মৌলিক চাপটি তৈরি হয়েছে মধ্যযুগে যখন ব্যক্তি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ঘুরে বেড়িয়েছে। নিজের ইচ্ছে মতো যা-খুশি করবার স্বাধীনতা না-থাকায় তার মনে বাসনা তৈরি ছিলো। রেনেসাঁসে সেই সুযোগ আসে। কিন্তু বিপদ এই স্বাধীনতার বীজেই থাকে। কারণ বন্ধনহীন স্বাধীনতা একদিন নিজের বিরুদ্ধেই উদ্যত হয় যেহেতু ব্যক্তি কোনো কিছু মানবে না বলেই নবজাগরণ শুরু করেছিলো। কাজেই সে যে পরিবারের ঐকান্তিক বন্ধন মানবে না—এতে আর আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আভ্যন্তরীণ এই সঙ্কটের সঙ্গে বাইরের আকর্ষণ জোড়ায় সমস্যাটা খুব পাকিয়ে উঠেছে।

আভ্যন্তরীণ ও বাইরের

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও একই কথা। অনেকে বলেন যে আমাদের প্রাচীন পরিবার ভাঙছে অর্থনৈতিক কারণে। কিন্তু তারা নজর করছেন না যে ভারতীয় পরিবার ভাঙতে শুরু হয় য়ুরোপের চাপে, য়ুরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে। কারণ আর্থিক সচ্ছলতা সত্ত্বেও আধুনিক য়ুরোপীয় কেতায় শিক্ষিত যুবক যুবতী প্রধানতই নিজেদের (অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর) পরিবারের কথা ভাবছে। য়ুরোপীয় রীতি আমাদের মাথায় গেঁথেছে প্রাথমিকভাবে এবং পরে তাকে সম্প্রসারিত করেছে অর্থনৈতিক দুর্বিপাক। এমন যে ঘটলো তার কারণ ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরেই প্রস্তুত হয়েছে। ভারতীয়রা অনেকদিন থেকেই মনে মনে প্রস্তুত হয়েছে এবং য়ুরোপের ধাক্কাতে তখন সহজেই ওদের আদর্শটাকে মেনে নিয়েছে। ভারতীয় সমাজে প্রাচীন পরিবারের বাঁধনে যেমন মহৎ পরিকল্পনা ও সামাজিক মঙ্গলের আদর্শ কাজ করেছে তেমনি ব্যক্তিকে অনেকটাই নিজের সীমা খর্ব করতে হয়েছে। নিজের বিস্তারের সীমা ছাঁটতে ছাঁটতে তার মনে অবাধ মুক্তির অস্পষ্ট চাপ তৈরি হয়েছিলো। য়ুরোপীয় সভ্যতা এসে তা স্পষ্ট করে দেয়। একারণেই, শুধু অর্থনৈতিক সঙ্কট নয়, ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গেই য়ুরোপ আমাদের মনে আসে ও আমরা পুরোটাই তাকে গ্রহণ করে ফেলি।

পরিবার ভাঙবার প্রসঙ্গে যে-কথাটা সর্বদাই মনে রাখতে হবে তা হলো পরিবার প্রাথমিক সংগঠন হিসেবে চিরকালই থাকে, শুধু তার প্রাচীন রূপ বদলে নতুন রূপ আসছে। পরিবারের বৃহত্তর বক্তব্য বদলে

বর্তমানকাল এসে দাঁড়িয়েছে সঙ্কীর্ণ বক্তব্যে। আধুনিক মনের ব্যক্তি-কেন্দ্রিক জীবনের লক্ষ্য প্রকাশিত হচ্ছে ব্যক্তি নির্ভর পরিবারে। সমাজের ক্ষেত্রে পরিবারের গঠনটা বর্তমানে 'পারমাণবিক' অর্থাৎ মূলতই তা একটিমাত্র ব্যক্তির সংগঠন।

পরিবারের রূপ চূড়ান্তভাবে পরিবর্তিত হলেও পরিবার মানুষের চরিত্রে অন্তর্নিহিত এবং সে-কারণেই সমাজদেহেও নিহিত। কাজেই প্লেটোর কল্পনার আদর্শ রাষ্ট্র, যেখানে পরিবার থাকবে না, নিছক অসম্ভব চিন্তা। কল্পনার অংশটুকু বাদ দিলেও প্লেটো যে সমাজের সংগঠন বিষয়ে ক্রম-উদবর্তিত ছকটি বিষয়ে সঠিক চিন্তার পরিচয় দেন নি তা শ্রেষ্ঠ জর্মন দার্শনিক হেগেল ব্যাখ্যা করে দেখান। প্লেটো খেয়াল করেন নি যে পরিবার এতোই স্বাভাবিক যে সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের সঙ্গে আত্মিক যোগসূত্রেই পরিবার এসে যাচ্ছে। প্লেটোর ব্যারাকেও আসছে। শ্রীমতী বোসাঙ্কেট তাই 'ফ্যামিলি' গ্রন্থে চমৎকার লিখেছেন 'পরিবার ছাড়াই যদি জগতের চলে, তবে তার গুণাবলীকে ছাড়তে পারা যায় না। নিজে থেকে জগৎটা নিছক ভারিক্কি, তার গভীরতা, বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য দেবার মতো আবেগের কোনো মাত্রাকেই ছাড়া চলবে না। কখনো কখনো অসমর্থ হয়েছে বলেই যদি এতো সৌন্দর্য ও উত্তাপের উৎসকে বাতিল করা হয় তবে কখনো কখনো মেঘে ঢেকেছে বলে সূর্যদেবকেই আকাশ থেকে নির্বাসন দেবার মতো হবে।'

পরিবার মানুষে অন্তর্নিহিত

৮। বিবাহ (Marriage)

মানুষের প্রাণধারা বজায় রাখবার প্রকৃতি নির্দিষ্ট পদ্ধতি হলো নর-নারীর দৈহিক মিলন ও তৎপ্রসূত সন্তান। আমরাও আলোচনায় দেখেছি যে পরিবার সন্তানকে কেন্দ্র করেই গড়ে। বংশানুক্রমের জন্য সন্তান প্রয়োজন আবার সন্তানের জন্য পরিবারের আবশ্যিকতা। সুতরাং এই দুটি মৌল সম্পর্কের কেন্দ্রস্থল বিবাহ-ব্যবস্থা।

সাধারণভাবে নরনারীর মিলন প্রবৃত্তিগত। প্রকৃতির চাপেই প্রাণী-জগতে মিলন বাসনা জাগে এবং মিলনের মধ্যে প্রকৃতি তার গুপ্ত পরিকল্পনা চরিতার্থ করে। অর্থাৎ জীবনধারা অব্যাহতভাবে চলে। এবারে প্রশ্ন উঠবে যে স্বাভাবিকভাবেই যদি প্রকৃতির নিয়মে দৈহিক মিলনের পথে জীবনধারা

নরনারীর মিলন প্রবৃত্তিগত

অব্যাহত থাকে তবে 'বিবাহ-ব্যবস্থা'র প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নটির গুরুত্ব আছে। কারণ যখনই বলা হচ্ছে 'বিবাহ-ব্যবস্থা' তখনই ধরে নিতে হবে এইটি একটি সংগঠন, তার নিজস্ব রীতিনীতি ও কর্ম আছে এবং এই কর্মাদি সংগঠিত হয়েছে কোনো সামাজিক এবং আইনী ব্যবস্থায়। অর্থাৎ পরিবার এমন একটি সংগঠন যার সামাজিক ও আইনানুগ প্রকাশ ও ভিত্তি আছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক মিলনবৃত্তিকে বিবাহ-ব্যবস্থা সামাজিক একটি ছাড়পত্র দেয় মাত্র। বিবাহ সেই আদি ও মৌলিক প্রয়োজন অর্থাৎ জৈব প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই আছে কিন্তু সেই প্রয়োজনকে একটি সমাজ সম্মত অর্থাৎ রীতিবদ্ধ রূপ দেওয়া হয়েছে। মনুষ্যেতর প্রাণী-জগতে প্রকৃতির একই নিয়ম কার্যকরী কিন্তু প্রাণী জগতের বহু স্তরে জৈব-প্রকৃতি প্রকাশের কোনো রীতিবদ্ধ সামাজিকতা নেই। তাদের সমাজ অবাধ মিলনের প্রতিবাদী নয়। মিলনটুকু ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য ওই সংগঠনের নেই।

অথচ মানুষ প্রকৃতির নিয়মে যেমন সাড়া দেয় তেমনি নিজস্ব নিয়ম ও তার সমাজের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে, কাজেই প্রকৃতির খেয়ালে অবাধ, শৃঙ্খলাহীন মিলনে সে মাততে পারে না। সমাজের আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মাদি গড়ে। এমনই নিয়মের সংগঠন হলো 'বিবাহ-ব্যবস্থা'। 'বিবাহ' অংশটুকুতে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ কিন্তু 'ব্যবস্থা'টুকু মানুষের তৈরি। সুতরাং 'বিবাহ' প্রসঙ্গে সর্বদাই মনে রাখতে হবে বিবাহের সঙ্গে সংগঠন ও সামাজিক নিয়মের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। সামাজিক নিয়মাদিই আইনে প্রকাশ পায়।

এই বক্তব্যটিও গুরুত্বপূর্ণ কারণ মানুষের নিয়ন্ত্রিত সংগঠন বিষয়ে রবার্ট ব্রিফল্ট ও ওয়েস্টারমার্কের বিতর্ক পৃথিবীবিখ্যাত। ব্রিফল্ট বলতে চেয়েছিলেন মর্গানের গোষ্ঠী-বিবাহ ও অন্যান্য আদিবাসী-জীবনযাত্রার নজীরে যে আদিম পর্যায়ে বিবাহ বলতে কোনো 'ব্যবস্থা' বোঝাতো না। অবাধ যৌন সম্পর্কের স্তর বোঝাতো। অথচ ওয়েস্টারমার্ক দেখান যে পৃথিবীর এমন কোনো সমাজ নেই যেখানে কোন-না-কোন রকম নিয়ন্ত্রণ থাকছে না বা যৌন-সম্পর্কের রীতিবদ্ধ শৃঙ্খলা থাকছে না। যদি পরিবার আদি ও মৌলিক হয় তবে নিশ্চয়ই ওয়েস্টার মার্কের বক্তব্য সমর্থিত। ব্রিফল্টের মূল দার্শনিক প্রস্তাবনা একমাত্র সত্য তখনই হতে পারে যখন পরিবার পরবর্তী ইতিহাসের প্রয়োজনে সংগঠিত। কিন্তু

আমরা দেখেছি পরিবার সমাজের গোড়া থেকেই আছে, সুতরাং বিবাহ-ব্যবস্থাও সম্পর্কের একটি রূপ হিসেবে প্রতি মানব-গোষ্ঠীতেই উপস্থিত।

পণ্ডিতরা নানাভাগে ভাগ করে বিবাহ-ব্যবস্থাকে আলোচনা করেন। একটি বিভাগে স্ত্রীর সংখ্যা বিচারের শর্ত। যেমন এক স্ত্রী-ভিত্তিক ব্যবস্থা (monogamy) ও বহু স্ত্রী-ভিত্তিক ব্যবস্থা (Polygamy)। এক স্ত্রীর বহু স্বামী-ভিত্তিক ব্যবস্থা (Polyandry)-ও আছে। বিবাহ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একই গোত্রের মধ্যে হলে তাকে বলা হয় অন্তর্বিবাহ (Endogamy) আর গোত্রের বাইরে সংঘটিত হলে বলে বহির্বিবাহ (Exogamy)। আমাদের দেশে এতাবৎ কাল সবর্ণে বিবাহ প্রচলিত ছিলো। অসবর্ণ বিবাহ সমাজে স্বীকৃত ছিলো না। যেমন, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণ, কায়স্থ-কায়স্থ বিবাহ ইত্যাদি। সবর্ণ বিবাহকে আমরা অন্তর্বিবাহ বলতে পারি। কিন্তু একই বর্ণের মধ্যে গোত্রভাগ ছিলো অর্থাৎ স্বগোত্র-বিবাহ অসিদ্ধ ছিলো। একই বর্ণের মধ্যে অন্তর্বিবাহ অনুষ্ঠিত হতো কিন্তু একই গোত্রের বিবাহ নিষিদ্ধ থাকায় তাকে বহির্বিবাহও বলতে হবে।

এক স্ত্রী ও বহু স্ত্রী

৯। বিবাহ বিচ্ছেদ (Divorce)

বিবাহ বিচ্ছেদের প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন বিবাহকে রীতিবদ্ধ সংগঠন হিসেবে দেখা দেয় প্রাচীনকালে, যেমন ভারতীয় শাস্ত্র মনুসংহিতায়, নির্দিষ্টক্ষেত্রে বিবাহভঙ্গ ও পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা দেওয়া আছে। সুতরাং সামাজিক সংহতির জন্য যদিও ভারতবর্ষে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রসঙ্গ গৌণ ছিলো কিন্তু ব্যক্তির মনুষ্যত্বের স্বার্থে অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজ মঙ্গলের লক্ষ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ একেবারে অন্যায় ভাবা হয়নি। অবশ্য বিবাহ বিচ্ছেদের প্রাবল্য বর্তমান কালেও বিশেষত য়ুরোপ-আমেরিকাতেই।

বিবাহ বিচ্ছেদের আলোচনায় প্রথম তর্ক তার নৈতিকতা বিষয়ে। একদল পণ্ডিত বিশেষত প্রাচীনপন্থী দার্শনিকরা, যাঁরা বিবাহকে একমাত্র প্রাকৃতিক ঘটনা মনে করেন না এবং ব্যক্তিকেও সম্পূর্ণ একক স্বাধীন সত্তা করেন না, কোনো রকম বিচ্ছেদ মানতেই রাজি নন। ওঁদের মতে বিবাহ কেবলমাত্র দুটি নরনারীর যৌন মিলনের সামাজিক ছাড়পত্রই নয়, বিয়ের উদ্দেশ্য সমগ্র সমাজের মঙ্গল। এই মঙ্গলের প্রাথমিক ভিত্তি জৈববৃত্তি কিন্তু প্রধান ভিত্তি সন্তান। কারণ সন্তানের মাধ্যমেই বংশরক্ষা। বংশরক্ষার সূত্রে

বিচ্ছেদ নৈতিকতার প্রশ্ন

আরো বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ও আদানপ্রদান চলে। সন্তান তাই শুধুমাত্র দুটি নরনারীর নিজস্ব সম্পদ নয়, সন্তানরা সমগ্র সমাজের এক্তিয়ারে। কারণ, তাদের জীবনধারাতেই সমাজের আদর্শ ও লক্ষ্য প্রতিফলিত হবে। কাজেই বিবাহ ব্যবস্থাকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়, ধর্মের আচরণীয় অনুষ্ঠান মনে করতে হয়। জীবনে নীতির অর্থ একদিকে যেমন ব্যক্তিগত কর্মের ঔচিত্য বা অনৌচিত্য, তেমনি সেই কর্তব্যের সূত্রে বৃহত্তর সমাজের চিন্তাও নিহিত থাকে। সমাজেই কোনো একটি ব্যক্তির কর্ম আরো অসংখ্য ব্যক্তির কর্মের দ্বারা প্রভাবিত। তাই ব্যক্তির কর্মের নৈতিকতা সমাজের শ্রেয়-বোধের সঙ্গে জড়িত। বিবাহ-ব্যবস্থা নিতান্তই যদি ব্যক্তিদের খেয়াল-খুশির নিয়ন্ত্রণে থাকে তবে সমাজে যথেচ্ছাচার দেখা দেবে এবং সেই অনৈতিক বিশৃঙ্খলায় সমাজ ও ব্যক্তির চরিত্র নষ্ট হবে।

এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে দুটি আপত্তি ওঠে। একটি আপত্তিতে সব রকম নিষেধই ব্যক্তি স্বার্থের পরিপন্থী। ব্যক্তির মঙ্গলের প্রকাশ ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতায়। স্বাধীনতায় কোনোরকম বেড়ি পরালেই ব্যক্তি তার সম্ভাবনার পরিপূর্ণতা পায় না। বিবাহ ব্যবস্থা ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। জীবনে, প্রাণের লীলায়, প্রকৃতি ও পুরুষের সম্পর্কটা মৌলিক। পরস্পরের সম্পর্কে প্রথম বিশ্বাস ও আত্ম-উদ্বোধন ঘটে দেহের সূত্রে। যেহেতু দেহকে জড়িয়েই আত্মা। আত্ম-সচেতনতার বিকাশে যে-কোনো বাধাই ব্যক্তির পক্ষে অশুভ। বিবাহে ব্যক্তির যতোটুকু স্বাধীনতার প্রকাশ ততোটুকুই সে নিজের বিবেচনা মতো স্থির করে এবং স্বীকার করে। কারণ, বিবাহে একদিকে থাকে বন্ধন ও কর্তব্যের দায়। অন্যদিকে তার আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা যদিও পরিপূর্ণ সত্য তবু এই বন্ধনটিই একদিন বোঝা হয়ে উঠতে পারে। তাতে উভয়ের ক্ষতি। সমাজও কিছু লাভবান হয় না। দুটি ব্যক্তিতে যদি প্রতি মুহূর্তে বিরোধটাই সত্য হয় তবে আত্মপ্রকাশের প্রধান উৎসই শুকিয়ে যায়। শৃঙ্খলাটাই তখন একমাত্র নির্মম সত্য। যে-অবস্থায় ব্যক্তির এমন বন্ধন ভাঙার পরিপূর্ণ স্বাধীনতাটাই একমাত্র নৈতিক দাবি। সমাজের একমাত্র কর্তব্যও তাই। অভিমন্যুর চক্রব্যূহের মতো বিবাহ-ব্যবস্থায় বহির্গমনের দ্বার রুদ্ধ রাখলে ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

দুটি আপত্তি

এই বক্তব্যের মূল কথাই ব্যক্তির বিকাশ ও স্বাধীনতার প্রসঙ্গ। কোনো রকম বিধিনিষেধেই ব্যক্তির চরিত্র খর্ব হয়। অবশ্য এই সব পণ্ডিতরা কখনোই বলেন না যে ব্যক্তির কোনো দায়িত্ব নেই। তাঁরা বরং উল্টোটাই বলেন যে, স্বাধীনতার বোধ থেকেই দায়িত্ব-বোধ আসে। দায়িত্বের গুরুভার থেকে স্বাধীনতা আসে না। মার্কিন বিচারক বেন লিণ্ডসে 'রিভোল্ট অব ইয়ুথ' গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন যে মার্কিন যুবকরা অবাধ যৌন যথেচ্ছাচারে কেমন মেতেছে। কারণ সর্বত্রই তাদের ওপর বিধিনিষেধের কঠিন চাপ কাজ করেছে। বিখ্যাত মার্কিন কীন্‌সী রিপোর্টেও একই সিদ্ধান্ত। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক বেরট্রাণ্ড রাসেল বিশ্বের নীতি ও বিবাহ সমস্যাতেই চিন্তিত। তিনি 'ম্যারেজ এণ্ড মরালস' গ্রন্থে দেখিয়েছেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কতো কুসংস্কার ও অর্থহীন নিগড় কাজ করে। ফলে, মঙ্গলের বদলে অমঙ্গলই হয় বেশি। বিবাহ-ব্যবস্থাতেও একই রকম গোঁড়ামি কাজ করেছে। পুরোনো অভ্যাস ও বক্তব্যের জের টেনে সমাজ বহু-ক্ষেত্রেই নতুন জীবন ধারার প্রবাহকে বাধা দেয়। তখন এমন আবর্তের সৃষ্টি হয় যে গভীর পাঁক ও তলানি ওঠে জীবনের অপ্রকাশ্য স্তর থেকে। দুটি ব্যক্তিতে মিলছে না অথচ তাদের একসঙ্গেই কাটাতে হবে, এর চেয়ে বড়ো অত্যাচার আর নেই। স্বামী-স্ত্রী নিঃসন্তান, তাঁরা চান নতুন সংসার পেতে সন্তানের ব্যবস্থা করবেন। অথচ তা সমাজ সমর্থন করে না। রাসেল অন্তত এমন অবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদরই কথা বলেন।

কীনসী রিপোর্ট ও রাসেল

দ্বিতীয় আপত্তি যাঁরা করেন তাঁরা প্রথম দলের মতো উগ্র কথা বলেন না যে, সমস্ত অবস্থাতেই একমাত্র ব্যক্তিদের বিবেচনাতে বিবাহ বিচ্ছেদ স্থির করা হবে। সমাজকেই তাঁরা প্রাধান্য দেন। বিবাহ বা বিবাহ-বিচ্ছেদ সবটাই নির্ধারিত হবে সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের বিবেচনায়। সাধারণতই তাই বিবাহ বিচ্ছেদ সমর্থিত নয়—কারণ বিবাহের মতো সংগঠন বিচ্ছেদের স্বাধীনতায় নষ্ট হলে সমূহ ক্ষতি। বিচ্ছেদের স্বাধীনতায় সন্তানদের ওপর কারো দায়িত্ব যথোচিতভাবে তৈরি হয় না এবং সন্তান পিতামাতার স্নেহের অভাবে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী হয় না। যেমন মনুসংহিতার উদাহরণে দেখিয়েছি যে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্যেই তিনি তিনি বিবাহ বিচ্ছেদের বিধান দিয়েছেন।

সন্তানদের কষ্ট

য়ুরোপ ও আমেরিকাতে বিবাহ বিচ্ছেদের একটি দার্শনিক কারণ উপস্থিত। পরিবার প্রসঙ্গে দেখেছি যে গ্রীক ও রোমক সভ্যতার পরবর্তী য়ুরোপীয় মধ্যযুগে ধর্ম ও সমাজ বন্ধনের মধ্যে ব্যক্তির স্থান ছিলো নির্দিষ্ট, সমাজের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যেই তার পরিচয় পূর্ণ হতো। কিন্তু মধ্যযুগের পর নবজাগরণের জোয়ারে সমাজ ও ব্যক্তি বিষয়ক সমস্ত বক্তব্যই বদলে যায়। সংগঠনের মধ্যে ব্যক্তিকে উপস্থিত না করে তাকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন ভাবা হতে থাকে। এমন ব্যক্তিকে পদার্থবিদ্যার নজীরে পারমাণবিক (atomic) ব্যক্তি বলা হয়। তার কর্ম ও দায়িত্ব নিজস্ব হওয়ায় সমাজ চিত্রটি দাঁড়ায় একক ব্যক্তির সম্পর্ক। কিন্তু একক ব্যক্তির সম্পর্ক বলে কিছু হয় না, তাকে অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতেই হয়। কিন্তু এই পাতানো সম্পর্ককে ব্যক্তির ওপর সম্পূর্ণ প্রযোজ্য মনে করা হয় না, ব্যক্তি ইচ্ছে করলেই নিজের প্রয়োজনে তা ভাঙতে পারে। অর্থাৎ সমাজও একক স্বাধীন ব্যক্তির লীলাক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ব্যক্তিকে অবশ্য জীবনের প্রয়োজনেই বিবিধ সম্পর্কের সূত্র গড়তে হয়, কিন্তু এবার সম্পর্কিত দুটি ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নিজের প্রয়োজনে চলতে থাকে। নিজের কর্মের দায়িত্ব সম্পূর্ণই তার নিজের, তার আত্মপ্রকাশের বাহন হিসেবেই সম্পর্ক। এক্ষেত্রে নরনারীর সম্পর্ক অর্থাৎ পরিবার তাই দুটি স্বাধীন ব্যক্তির স্বাধীন সঙ্কল্পের প্রকাশ হয়। তাদের পারস্পরিক তাৎকালিক সম্পর্কটাই সত্য, অন্য কিছু নয়। ইতিপূর্বে বিবাহ ব্যবস্থা ও পরিবারকে ভাবা হয়েছে সামাজিক, তাই ধর্ম বা সমাজের ছাড়পত্রটাই ছিলো প্রধান। দুটি ব্যক্তির সম্পর্কেই পরিবারকে ছেড়ে না দিয়ে বৃহত্তর সামাজিক লক্ষ্যের বাহন মনে করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বিবাহ ব্যবস্থা বা পরিবার দুটি ব্যক্তির চুক্তির মতো। চুক্তি কারণ যতোক্ষণ পরিবার ও বিবাহ নামক সংগঠনটি তাদের পারস্পরিক উন্নতি ও বিকাশের বাধা নয় ততোক্ষণ তারা একসঙ্গে থাকবে কিন্তু যে-মুহূর্তে কোনো এক প্রান্তে বিরোধ দেখা দেবে, তাদের আত্মপ্রকাশ ব্যাহত হবে, অমনি তারা যে যার স্বার্থে সংগঠনটি ভেঙে নতুন মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের কথা ভাববে। য়ুরোপে নতুন ব্যক্তির চিত্র আছে মহাকবি শেক্‌সপীয়রে এবং নতুন পরিবার ও বিবাহ বিষয়ক সমস্যাবলীর চিত্র পাই নরওয়েজীয় নাট্যকার ইবসেন ও ষ্ট্রিণ্ডবের্গে। পারমাণবিক ব্যক্তির স্বার্থেই তাই এতো বিবাহ বিচ্ছেদের উদাহরণ।

নরনারীর চুক্তি বিষয়ক বক্তব্য যে অত্যন্ত সত্য তার প্রমাণ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক লক দেখিয়েছিলেন যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি ব্যক্তিদের চুক্তি, ব্যক্তি ও সরকারের চুক্তি। উপযোগিতাবাদী দার্শনিকরা, যেমন জেরেমি বেন্টাম, জেমস মিল ও জন ষ্টুঅর্ট মিল প্রমাণ করেন পৃথিবী পৃথক পৃথক স্বতন্ত্র ব্যক্তির সমাহার। ব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থে, উপযোগিতার লক্ষ্যে দুঃখকে তফাতে সরিয়ে কেবল সুখই চাইবে এবং সমস্ত সুখের হিসেবটি যোগ দিলেই একটি মহত্তম সুখী সমাজ গড়ে উঠবে। ওঁদের ধারণায় ছিলো ব্যক্তিদের নিয়েই যেহেতু সমাজ, ব্যক্তিরা নিজের নিজের স্বার্থরক্ষা করলেই সমাজকে পাওয়া যায়, সমাজ সত্তা বলে আলাদা কিছু নেই। এই সমস্ত দার্শনিক বক্তব্যের প্রভাবেই যুরোপ ও আমেরিকার পরিবার সংক্রান্ত সমস্যা ও বিবাহ বিচ্ছেদের প্রাদুর্ভাব বোঝা যায়। বিবাহে সন্তানের কথা থাকলে সমাজটা অর্থাৎ প্রতিটি লোকের প্রতিটি কর্মের দায়িত্বের কথা আসে আর বিবাহকে শুধু মাত্র চুক্তি ভাবলে সমাজ দুটি নরনারীর দৈহিক সম্পর্ক ও প্রেমের বাইরে নয়। প্রেম নিঃশেষ হলেই তারা সরে যাবে, সমাজ বলে কিছু থাকবে না। সন্তানেরা কখনো পিতা, কখনো মাতাকে পাবে বটে, কিন্তু কোনো সংগঠিত সামাজিক পরিবেশ পাবে না যেহেতু তাদের পিতা-মাতা একসঙ্গে জোটে না বা বহুক্ষেত্রেই থাকেন না।

১০। সুপ্রজননবিদ্যা (Eugenics)

সন্তানকে সংসারের কেন্দ্র বললে সুস্থ সবল সন্তান অর্থাৎ নীরোগ, সুখী পরিবারের কথা ওঠে। বর্তমান কালে জীববিদ্যাতেই সুপ্রজনন বিদ্যা নামে একটি নতুন শাখা গড়ে উঠেছে। প্রাচীন গ্রীসদেশে সুস্থ সবল শিশুর মূল্যকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিলো। গল্প আছে যে স্পার্টা নগরে নবজাত শিশুকে রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে পোক্ত করে তোলার জন্যে খোলা প্রকৃতির মধ্যে রাখা হতো। মা বা বাবার স্নেহচ্ছায়ায় আড়াল করার উপায় ছিলো না। অসুস্থ, রুগ্ন শিশুকে তারা নষ্ট করে ফেলতো কারণ তাদের প্রভাবে সমাজের ক্ষতি হতে পারে। স্পার্টা বাসীদের বক্তব্য অনুযায়ী বোঝা যাচ্ছে যে তারা মানুষকেও পরিকল্পনা মতো গড়ে নিতে চেয়েছে। সব মানুষই তাদের পছন্দ মতো, প্রয়োজন মতো হবে। স্পার্টায় সমাজটা ছিলো শস্ত্রবিদ্যা ও যুদ্ধের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাই প্রতিটি ব্যক্তিকে দেহে ও মনে সবল ও দৃঢ় হয়ে উঠতে হতো। সমাজের

চাহিদা অনুযায়ী শিশুর জোগানকে তারা নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছে। বর্তমান কালে যেমন ফ্যাসীবাদী হিটলারের জর্মানীতে মেয়েদের সন্তান জন্ম দিতেই আবদ্ধ করা হয়েছিলো এবং চেষ্টা চলেছিলো যাতে ভয় ইত্যাদি মানবিক বৃত্তি মুছে যায় এবং সমস্ত জর্মন জাতি ঘৃণা ও হিংসার দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

একথা নিশ্চয়ই ঠিক যে প্রত্যেক সভ্যতা ও সমাজ তার সন্তানদের সুস্থ সবল দেখতে চায় কিন্তু প্রশ্ন ওঠে কতোদূর পর্যন্ত তাদের প্রয়োজনের মাপে তৈরি করা হবে। প্রয়োজন অনুসারে গড়ে নেবার দুটি পথ আছে। একটি সামাজিক চাপ অর্থাৎ জন্মাবার পর শিশুদের সমাজ তার জীবন-যাত্রার নির্দিষ্ট আদর্শ অনুযায়ী গড়ে নেবে। আর একটা পথ হলো জীববিদ্যার পথ অর্থাৎ জন্মাবার পূর্বেই জীববিজ্ঞানীরা যদি সম্ভাব্য শিশুদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

বর্তমানে বহু জীববিজ্ঞানী নিয়ন্ত্রণের কথা ভাবছেন। এই নিয়ন্ত্রণকে কোনো যুক্তিতেই সমর্থন করা যায় না কারণ, প্রতি নিয়ন্ত্রণেরই একটা লক্ষ্য থাকে। মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো লক্ষ্য স্থির করা যায় না। তাছাড়া নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যটিই যে কল্যাণকর, চিরকালীন মঙ্গলের পথ, তা জানবার কোনো ব্যবস্থা মানুষের নেই। এমন হতেই পারে যে বর্তমানে যাকে মঙ্গলময়, শ্রেয় মনে হচ্ছে তা কিছুকাল পর পরিত্যক্ত হলো—তখন? মানুষের পক্ষে ভুল করা সোজা কিন্তু পিছু হঠা এতো সহজ নয়। ফলে পৃথিবীর সমূহ ক্ষতি ঘটে যাবে। পরিকল্পনার বক্তব্যে আরো একটা কথা থাকছে যে পরিকল্পনাকারী ছাড়া অন্য সবাই যন্ত্র, শুধুমাত্র তার খেয়ালখুশি মেটাবার কাঁচামাল মাত্র। পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন নেই যাকে এই অধিকার দেওয়া যায়।

নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন

বিশ্ববিখ্যাত জীববিজ্ঞানী হলডেন তাই জীববিদ্যায় এই ধরণের নিয়ন্ত্রণ প্রয়াসকে কঠোর সমালোচনা করেন। ওঁর মতে প্রাণী জগতে একমাত্র মানুষই অনন্ত সম্ভাবনাময়। তার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণই পরিপূর্ণভাবে কার্যকরী হয় না। সে যে কী হবে তা কেউ বলে দিতে পারে না। সুতরাং তার স্বাধীনতার অর্থই হলো যা-খুশি হবার অধিকার। এই অধিকারের জোরেই সে নতুন স্বভাব গড়ে ও তার স্বাধীন স্বভাবের সূত্রে সংস্কৃতি তৈরি হয়।

হলডেন নিয়ন্ত্রণ আপত্তি করেন

হলডেন তাই বার বার ঘোষণা করেন যে কোনো সভ্যতাতেই মানুষের আত্মপ্রকাশের কোনো একটি নির্দিষ্ট পথ থাকতে পারে না। সমাজের ভিত্তি মেনে নিয়েই তারা যে যার মতো নিজেদের পথ বেছে নেয়। সভ্যতার যেমন তেমনি জীবনেরও প্রকাশ বৈচিত্র্যে।

সুপ্রজননবিদ্যার লক্ষ্য তাই মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা নয়।

অনুশীলনী

1. What is the natural basis of the family ? (B. U. 1962)

2. Discuss the nature of family as social institution.

3. Explain briefly educational functions of the family. (B. U. 1962)

4. What part does family life play in the development of the individual ? (C. U. 1962)

5. What is family ? Do you think that the family is detrimental to the cultural progress of man ? (B. U. 1962)

6. What are the weaknesses of the family ?

7. Define family and relate its major functions.

8. "If we may treat the family as a little state, the child is its legitimate sovereign."—Elucidate the statement.

9. Explain the nature of marriage as a social institution.

10. Is divorce a social evil ?

11. What is Eugenics ? Do accept the need of planned control the human beings ?

অষ্টম অধ্যায়

রাষ্ট্র

১। বর্তমান জগতে রাজনীতি ও সমাজতত্ত্বের প্রাধান্যের ফলে রাষ্ট্র শব্দটি সর্বাধিক প্রচলিত। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ধারণ ফলে অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্র শব্দটির সঙ্গে সর্বদাই এমন কয়েকটি বিশেষণ ব্যবহৃত হয় যে রাষ্ট্রের কোনো একটি সংজ্ঞাই যথোপযুক্ত কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে। যেমন, সাধারণতই আমরা শুনে থাকি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, কল্যাণকামী রাষ্ট্র, ফ্যাসাবাদী রাষ্ট্র ও সাম্যবাদী রাষ্ট্র ইত্যাদি। দার্শনিকভাবে বিশেষণগুলোতে এতোই মৌলিক তফাৎ যে, যে-কোন একটি বিশেষণ রাষ্ট্রের চরিত্রকে অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ তফাৎ করে দিতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গণতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর সাম্যবাদী রাষ্ট্র দাঁড়ায় সাম্যবাদের তাত্ত্বিক বক্তব্যের ওপর। দুটিই রাষ্ট্র, কিন্তু সাম্যবাদ ও গণতন্ত্রে মূলতই এতো বিরোধ যে 'রাষ্ট্র' শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য কোন্‌টির ক্ষেত্রে কি, সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ ঘটতে পারে। সুদীর্ঘকালের বিতর্কে দার্শনিকরা মোটামুটিভাবে এটুকু স্থির করেছেন যে রাষ্ট্রকে দুরকমে ব্যাখ্যা করা যায়। চরিত্রের দিক থেকে দেখলে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে নিশ্চয়ই প্রচুর পার্থক্য কিন্তু মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রের বাহ্যরূপ দেখে একটি আইনানুগ সংজ্ঞা তৈরি করা যায় যা হয়তো প্রত্যেকটি সংগঠনের ক্ষেত্রে খাটে। কারণ, রাষ্ট্র মানুষেরই সংগঠন এবং সমাজের গোড়া থেকেই আধুনিক রাষ্ট্রের মতো কোনো সংগঠন প্রত্যেক জনগোষ্ঠীতে ছিলো না। এর প্রমাণ মেলে বিভিন্ন আদিম কৌম সংগঠনের ইতিহাসে। এখনো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বহু আদিবাসীদের সমাজ আছে যাদের মধ্যে রাষ্ট্র নামক বা বর্তমানের রাষ্ট্রের অনুরূপ কোনো সংগঠন নেই। এই নজীর থেকে সমাজ-তত্ত্ববিদরা বলেন রাষ্ট্র সংগঠনটি সামাজিক বিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে তৈরি হয়েছে এবং তা সর্বব্যাপী নয়। এমন কি কলিংউড প্রমুখ বিখ্যাত দার্শনিকরা বলেন যে গ্রীক রাষ্ট্রকে বর্তমান য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের নজীরে বোঝা যাবে না। যেহেতু বিভিন্ন সভ্যতার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে এবং সেই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়েই রাষ্ট্রকে বুঝতে হয়।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বাহ্য রূপের

সুতরাং রাষ্ট্র বিষয়ে আমরা জানছি যে **রাষ্ট্র মানুষেরই সংগঠন এবং রাষ্ট্র অনাদ্যন্ত নয়।** সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারছি যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। তবুও বাইরের আকারে মোটামুটিভাবে হয়তো এমন কিছু নিদর্শন আছে যা মিলিয়ে গ্রহণযোগ্য একটি সংজ্ঞা তৈরি করা যায়। সংজ্ঞাটি বুঝবার জন্যে আরো কয়েকটি প্রত্যয়ের সঙ্গে রাষ্ট্রকে মিলিয়ে দেখতে হয়।

(ক) **সমাজ**—সমাজকে আমরা সম্পর্কের সংগঠন বলেছি, যে-সংগঠনটি প্রাথমিক ও যা মানুষেরা সঙ্কল্প করে তৈরি করে নি। সমাজ যদিও মানুষের জীবনে একান্তভাবেই স্বাভাবিক তবু সমাজের একটি নিহিত লক্ষ্য থাকে কারণ মানুষের জীবন উদ্দেশ্যমূলক। মনুষ্যত্বের প্রত্যয়ে এক একটি সংস্কৃতি নিজেদের বক্তব্য স্থির করে এবং সেই মনুষ্যত্বের সঙ্গে মিলিয়েই সমাজ ব্যক্তির জীবনকে পরিচালিত করে।

(খ) **সম্প্রদায়**—সমাজ সর্বব্যাপী সম্পর্ক এবং বহু স্তরের সম্পর্ক বলেই তা সম্পূর্ণ বিমূর্ত। সম্পর্কের প্রত্যয় হিসেবে সমাজ একটি সামান্য ধারণা এবং কোনো সামান্য ধারণাকেই বিমূর্তভাবে ছাড়া বোঝা যায় না। এরিস্টটল আমাদের জানিয়েছিলেন যে তাঁর গুরু প্লেটো সামান্য ধারণা ও প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকে তফাৎ করে জ্ঞানের চরিত্র ও সম্ভাবনাকেই নষ্ট করেছেন। তাই ওঁর নির্দেশেই জানা যাচ্ছে বিমূর্ত ধারণা যদিও নিজস্ব সামান্য সত্তায় সত্য তবু প্রতি মুহূর্তেই তাকে নির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ সত্তায় উপস্থিত হতে হয়। মানুষ প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, স্পষ্ট ও আয়ত্তাধীন বস্তু বা দ্রব্যের মধ্যেই সামান্য সত্যকে উপলব্ধি করে। অরূপ রূপের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। তাই বিমূর্ত সমাজ সম্প্রদায়ের সংগঠনেই আমাদের জ্ঞানের গোচরে আসে। আমরা ছাত্র সম্প্রদায়, নারী সম্প্রদায়, কিশোর সম্প্রদায়, বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় ইত্যাদি সংগঠনের মধ্যে সমাজের পরিচয় পাই। প্রথম অধ্যায়ে সম্প্রদায় ও সমাজ বিষয়ে একথাটাই আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছি।

(গ) **জনসাধারণ**—জনসাধারণ বলতে সাধারণভাবে আমরা আবার একটি বিমূর্ত প্রত্যয় বুঝি। এই প্রত্যয়টির কোনো স্পষ্ট নির্দেশ নেই। এই জনসাধারণকে বোঝাতে পিপ্‌ল, ফোক, ম্যাস ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার হয়। যেমন দার্শনিক বা সমাজতাত্ত্বিক এই প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন, তেমনি শব্দটির তাৎপর্য। কারণ, এক এক জনের কাছে এক এক

রকম চেহারা জনসাধারণের। যখনই দার্শনিকরা 'জনসাধারণ' শব্দটি ব্যবহার করেন তখনই বোঝা যায় তাঁরা নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে বোঝাতে চাচ্ছেন না।

অথচ জনসাধারণ বলতে কখনো কখনো নির্দিষ্টতাও থাকে। যেমন যখন বলি ইংরেজ জনসাধারণ তখন ইংরেজদের মধ্যে একটি যোগসূত্র আমরা ধরে নিই যা অন্যত্র অর্থাৎ বাঙালীদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। এই যোগসূত্রের পরিচয় আছে তাদের পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার ভাষা ইত্যাদিতে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জনসাধারণ প্রত্যয়টির স্পষ্ট নির্দেশ কিছু নেই। যেমন আমরা অনেক সময় বলি জনসাধারণ এই আচরণটি সমর্থন করবে না। এই বক্তব্যে কিন্তু আমরা সংখ্যার হিসেবে প্রতিটি লোককে বোঝাতে চাই না। আমাদের মনে একটি বাছাই থাকে যে এই অজ্ঞাত অনির্দিষ্ট জনসমাজের কোনো একটি অংশ, যাদের বিষয়ে আমাদের কিছুকিছু ধারণা ইতিপূর্বেই হয়েছে। মার্কসবাদীরা অনেক সময় বলতে চান যে জনসাধারণের স্বার্থকেই তাঁরা প্রকাশ করেন এবং জনসাধারণ তাঁদের সমর্থন করে। কিন্তু তাঁদের এই উক্তি থেকে আমাদের বুঝে নিতে হয় জনসাধারণের একটি নির্দিষ্ট অংশ তাঁদের সমর্থন করছে, এবং সেই অংশটিকেই সমগ্র জনসাধারণের সমার্থক ভাবা হচ্ছে।

জনসাধারণ রাষ্ট্রের উপাদান

আসলে জনসাধারণ নামক প্রত্যয়টি নিছক অস্পষ্ট এবং সম্পর্কের সূত্রে তাদের যদিও সংযোগ থাকে তবু বিশেষ প্রসঙ্গ ছাড়া এই সম্পর্কের তাৎপর্য বোঝা যায় না।

(ঘ) **দেশ**—দেশ একটি ভৌগলিক স্থানবাচক প্রত্যয়। তবু দেশ শব্দটি বা জমির সঙ্গে মানুষের মন গভীর ভাবে জড়িয়ে থাকে। জনসাধারণ প্রত্যয়টি যতো অস্পষ্ট দেশ ততো নয়। কারণ সমগ্র ভূখণ্ডটি যেমন দেশ, তেমনি নিজের বাস্তুভিটার অঞ্চলটিও দেশ। বরং সেই ছোট্ট স্থানটুকু ঘিরেই দেশ বিষয়ে মমতা তৈরি হয়। বাস্তুভিটাকে কেন্দ্র করে মন ক্রমশ বৃত্তাকারে সমস্ত দেশের সঙ্গে জড়িত হয়। বাঙালীর বাঙলা দেশ। সমগ্র দেশটি বিষয়ে তাদের যতোটুকু আবেগ ও মমতা তা তৈরি হয়েছে সমভাষা ও সংস্কৃতির জন্যে। কিন্তু এমন কথা বলা যায় না যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাঙালীর মন সমগ্র বাঙলাদেশের জন্য চিন্তিত। যেমন বাঙলাদেশের ক্ষেত্রেই দেখা গেলো বঙ্গ বিভাগ কেমন সহজে সম্ভব হলো। বাঙালীর মন নিজের জাতি ও দেশের প্রতি মমতায় উদ্বেলিত হলো না। বাঙালী

জনসাধারণ কখনো এমন সম্পর্কের টান বোধ করলো না যে দু টুকরো হলে সম্পর্কের যোগটা নষ্ট হয়। তাদের বাঙালিত্বের বোধটা নষ্ট হয়। অথচ দেশ ও জনসাধারণ প্রত্যয়টি এমন আশ্চর্যভাবে কাজ করে যে ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগে দেখা গিয়েছিলো বাঙালী প্রতিবাদ করলো এবং প্রতিবাদে সরকারী স্থিরীকৃত ঘটনাকে পালটে দিলো। অথচ ১৯৪৭ সালে তার আর পুনরাবৃত্তি ঘটলো না। একাত্মবোধ নামক সংযোগসূত্রটি একবারের জন্যেও প্রত্যক্ষ হলো না। তেমনি ধর্মের তাড়নায় পাকিস্তানের জিগীরে বাঙালী বাঙলাদেশকে টুকরো করলো, দেশের অখণ্ডতার কথা মনে রইলো না। অথচ নিজের বাস্তুভিটা রক্ষা করবার জন্যে লোকেরা সত্যি সত্যিই ছটফট করে, দুঃখ বহন করে। কখনো কখনো এমন কথাও শোনা গেছে, যেমন লিখেছিলেন ইংরেজ কবি রূপার্ট ব্রুক, পৃথিবীর যে কোনো অংশে তাঁর মৃত্যু হবে এবং তাঁর দেহকে কবর দেওয়া হবে, সেই টুকরোটাও ইংল্যাণ্ড। দেশাত্মবোধক সঙ্গীতে, ছড়াতে কখনো কখনো দেশের মন সাড়া দেয় এবং দেশের জন্যেও লোকেরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকে।

(ঙ) **জাতিরূপ (Race):** পণ্ডিতরা সারা পৃথিবীর জনসমাজকে কয়েকটি মূল জাতিরূপে ভাগ করেছেন। এই মূল জাতিরূপ থেকেই বিভিন্ন রক্তের মিশ্রণে বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্ম। তাদের কেউ সাদা, কেউ গোলাপী, হলদে বা কালো। প্রতিটি রঙ ও আরো অন্যান্য শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণ হিসেবে পণ্ডিতরা এক একটি মূল জাতিরূপ (racial bio-type) ধরেন। যেমন নেগ্রিটো, অষ্ট্রালয়েড, ককেশীয়, মেডিটারেনীয় ইত্যাদি। অবশ্য এই বিভাগের কোনো সর্ববাদী সম্মত রূপ নেই। প্রত্যেক পণ্ডিতের নিজস্ব এক একটি তালিকা ও ছক আছে।

অবশ্য বর্তমানে এটুকু স্বীকার করা হয়েছে যে সারা পৃথিবীতে 'শুদ্ধ' জাতিরূপ বলে কিছু নেই। সর্বত্রই রক্ত কিছু না কিছু মিশ্রিত হয়েছে। একথা বলার প্রধান তাৎপর্য এই যে কিছুকাল আগেও কিছু জর্মান পণ্ডিতরা সারা পৃথিবীতে রটিয়েছিলেন যে তারাই হলেন নর্ডিক জাতি, খাঁটি আর্য রক্ত তাঁদের ধমনীতে বইছে। পৃথিবীর বাকি সব লোক অনার্য অর্থাৎ হীন জাতি। এই তত্ত্বের ফলে চিন্তার জগতে অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। কারণ এই শ্রেষ্ঠ জাতিতত্ত্বে মানুষে মানুষে রক্তের তারতম্য ভেদে ক্ষমতার দাপটের কথা থাকে। জর্মানরা যেহেতু আর্য এবং শ্রেষ্ঠ জাতি সুতরাং পৃথিবী তাদের দখলে থাকা উচিত।

বিভিন্ন রক্তের মিশ্রণে পৃথিবীর সংস্কৃতি বিচিত্র খাতে বয়েছে এবং সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী পুষ্টি ঘটেছে। বাঙালীরাই যেমন নানা রক্তের সংমিশ্রণ। এই তথ্যটি জানা থাকলে জাতির শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে অনেক কুসংস্কার দূর হয়। যেমন কুসংস্কার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি উচ্চ-বর্ণ বিষয়ে মনের তলায় তলায় থাকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীহারানচন্দ্র চাকলাদার দেখিয়েছেন যে বাঙালী ব্রাহ্মণ ও বাঙালী শূদ্রে জাতিগতভাবে কোনো তফাৎ নেই।

জাতিরূপের আলোচনায় আরো অন্ধতা দেখা যায়। যেমন সারা পৃথিবীতে 'আর্য' বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা। আর্যরা সত্যই জনগোষ্ঠী না ভাষা না জাতিরূপ এ-বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। এই বিতর্কের সংবাদ যে-যেমন খুশি ব্যবহার করেন। জাতিরূপের আলোচনা এ-কারণেই প্রয়োজনীয় যে আমাদের জানতে হয় মনুষ্য জীবনে কেনো কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য স্থায়ী এবং বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত। পণ্ডিতরা এই স্থায়ী ও প্রবাহিত পরম্পরার জন্য জাতিরূপ প্রত্যয়টি তৈরী করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে জাতিরূপের সঙ্গে রক্তের কোনো সংযোগ নেই অর্থাৎ আমাদের রক্ত নিগ্রোদের রক্তে কোনো তফাৎ নেই।

(চ) জাতি ও জাতীয়তা (Nation and Nationality)—বর্তমানে রাষ্ট্রনীতি ও সমাজতত্ত্বের সবচেয়ে আলোচ্য প্রত্যয়টি হলো জাতি ও জাতীয়তা। জাতি বলতে প্রথমেই আমরা বুঝি একটি নির্দিষ্ট জনসাধারণ যারা একটি নির্দিষ্ট দেশে বসবাস করছে। আগেই আমরা বলেছি যে জনসাধারণ প্রত্যয়টি বিমূর্ত যদিও দেশ বাস্তুভিটাকে কেন্দ্র করে তা প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশে অস্পষ্ট প্রত্যয় 'জনসাধারণ' একত্রিত জীবনের কারণে কিছুটা স্পষ্ট একটা সম্পর্ক রূপ নিতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র নির্দিষ্ট জনসাধারণ ও নির্দিষ্ট দেশ থাকলেই চলে না। একটি দেশে তো নানা-জাতের লোক বসবাস করতে পারে। যেমন কলকাতাতেই থাকে। এইসব বিহারী, ওড়িয়া, দক্ষিণ ভারতীয় ইত্যাদিরা নিশ্চয়ই বসবাসের কারণে বাঙালী হয়ে যায় না। সুতরাং দরকার ভাষার। ভাষা তাদের সম্পর্ককে আরো স্পষ্ট করে। অথচ এক ভাষা হলেই চলে না। কারণ, ইংরেজী যেমন ইংরেজদের ভাষা, তেমনি আমেরিকাবাসী, অস্ট্রেলিয়াবাসী, কানাডাবাসীর ভাষাও ইংরেজী। তারা সবাই নিশ্চয়ই ইংরেজ নয়। তখন বলতে হয় যে পূর্বোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যের

সঙ্গে প্রয়োজন একটি ঐক্যবদ্ধ মনোভাব অর্থাৎ সংস্কৃতি। সংস্কৃতিই জাতি গড়ে। সংস্কৃতির সূত্রেই এমন একটি মন তৈরি হয় যা ব্যক্তিগত অপরিচয়ের বাধা কাটিয়ে সমগ্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং জাতি হলো একই ভূখণ্ডে বসবাসকারী ও সম-সংস্কৃতিবান একটি জনগোষ্ঠী।

বর্তমানে রাষ্ট্রনীতিবিদরা জাতীয়তা বলতে জাতির বোধ বা আত্ম-প্রকাশ বুঝেছেন না শুধু। তাঁরা বলছেন যে জাতীয়তা যদিও একটি বিশেষ জাতির নিজেকে প্রকাশ করবার ধরণ তবু একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রযন্ত্রের অভাবে জাতীয়তার প্রকাশ নেই। কারণ রাষ্ট্রই একমাত্র তাদের প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয় এবং পথ তৈরি করে। রাষ্ট্র থাকলেই বিশ্বের অন্যান্য জাতি তাদের স্বীকার করবে এবং তারাও যথোপযুক্ত সুযোগ পাবে নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে প্রকাশ করবার। নইলে পদানত জাতিকে কেই বা সুযোগ দেয়। কেউ বা তাদের আত্মপ্রকাশের ব্যবস্থা করে। বিশ্ব জুড়ে ইহুদীদের যা হয়েছিলো। কয়েক সহস্র বছর ধরে তারা তাদের কল্পনার রাজ্যটি খুঁজেছে। বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছড়িয়ে থেকেছে কিন্তু বহুক্ষেত্রেই মনে মনে স্বস্তি পায়নি। প্যালেস্টাইনে রাষ্ট্র পাবার পর তাদের মনে স্থিতি এসেছে। তারা নিজেদের একত্রিত, সংঘবদ্ধ ও একটি আদর্শে সমর্পিত প্রাণমন মনে করতে পারছে।

(ছ) **সরকার**—সংঘবদ্ধ জীবনের জন্যে শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। মানুষ স্বাধীনতাতেই তার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করে। কিন্তু নির্বিশেষ স্বাধীনতা বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। যেমন প্রকৃতির নিয়ম থাকে জীবনে, তেমনি মানুষও পদে পদে নিজের বন্ধন তৈরি করে। সভ্যতার লক্ষণই হলো তা, যেমন মানুষ নতুন স্বাধীনতা গড়ে তেমনি পুরোনো কিছুকে ত্যাগ করে। স্পিনোজা দেখিয়েছেন যে যতো খুশি ও যেমন খুশি স্বাধীনতার সুযোগ মানুষের জীবনে নেই। রাষ্ট্র মানুষের একটি সংগঠন কিন্তু সমাজের মতোই তা বিমূর্ত। সমাজের রাজনৈতিক কর্ম প্রকাশের জন্যেই এই সংগঠনটির প্রয়োজন। কিন্তু সংগঠন হলেই চলে না তাকে চালাবার ব্যবস্থা থাকা চাই। রাষ্ট্র সংগঠনটিকে চালাবার জন্যে সরকার তৈরি করা হয়েছে। সরকার সমাজে ব্যক্তিদের জীবনকে নিজ আদর্শ অনুযায়ী শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিক সংহতি যদিও সমাজের মনে ও সংস্কৃতির ধারায় চলে তবু সেই সংহতিকে বাহ্য আকার দেয় সরকার। যখন রাষ্ট্র ছিলো না তখনো কোনো না কোনো ভাবে

আদিম সমাজ তার সংহতি রক্ষা করেছে। শ্রদ্ধেয়কে মেনে, ধর্মের নীতি অনুসরণ করে, তারা জীবনে বিশৃঙ্খলা দূর করেছে। কিন্তু বুঝতে হবে যে রাষ্ট্র না থাকলেও সরকার সেখানে ছিলো। কারণ সরকার হলো সংহতির নিয়ন্ত্রক মাত্র। আদিম সংগঠনে মুখ্য ব্যক্তিই ছিলেন সেখানকার সরকার।

সুতরাং সরকার ও রাষ্ট্রে অনেক তফাৎ আছে। অনেক দার্শনিক রাষ্ট্র ও সরকারকে এক করে ভেবেছেন। ভাববার ফলে এই হয়েছে যে ব্যক্তির স্বাধীনতা যখন খর্ব হয়েছে তখন ব্যক্তিরা সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেনি যেহেতু সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অর্থ ই হবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। অথচ সরকার তো রাষ্ট্রের একটি মাধ্যম। নির্দিষ্ট কর্মের একটি হাতিয়ার মাত্র। কর্মটি ফুরোলেই হাতিয়ারেরও প্রয়োজন ফুরোবে। সরকার ও রাষ্ট্রের তফাৎ এভাবেও বোঝা যায় যে রাষ্ট্র সমগ্র জনসমাজের কিন্তু সরকার কয়েকজন ব্যক্তির সংগঠন।

(জ) **সার্বভৌমত্ব**—রাষ্ট্রনীতিবিদেরা বলেন সার্বভৌমতাই রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমাজের অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে যদিও রাষ্ট্র একটি তবু তুলনায় রাষ্ট্রের ক্ষমতা সর্বাধিক। ন্যায় শাস্ত্রের ভাষায় বলা যায় সার্বভৌমতা রাষ্ট্রের অবচ্ছেদক গুণ। সার্বভৌমতাকে দুভাবে বোঝা যায়। (ক) বহিঃশক্তি সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা, (খ) দেশাভ্যন্তরে রাষ্ট্রের অপ্রতিহত ক্ষমতা। আন্তর্জাতিক সমাজে অন্যের অধিকার মানলে সার্বভৌমতা থাকে না। দেশের অভ্যন্তরে অন্যান্য সংগঠনের ওপর রাষ্ট্রের প্রভুত্ব কার্যকরী কিনা জানা গেলেই রাষ্ট্রের চরিত্র বোঝা যায়। অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি অবশ্য দেখিয়েছিলেন যে, বহির্বিশ্বের আন্তর্জাতিক সমাজে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে কিছু হয় না। প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই কিছু কিছু খর্বতা স্বীকার করতে হয়।

২। রাষ্ট্র ও সমাজ (State and Society)

রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্ক বিষয়ে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। ভাববাদীরা রাষ্ট্র ও সমাজকে প্রায় অভিন্ন মনে করেন বা বলা চলে তাঁরা রাষ্ট্র ও সমাজের পার্থক্য বিষয়ে চিন্তিত নন। আবার গণতান্ত্রিক পণ্ডিতরা শুরুতেই রাষ্ট্র ও সমাজের মৌলিক তফাতের কথা বলেন। গণতান্ত্রিক

বক্তব্য দুভাগে বিভক্ত। প্রথমত, তাঁরা বলেন যে রাষ্ট্র সমাজের একটি অংশ মাত্র। সমাজ পূর্ণ ও রাষ্ট্র সেই পূর্ণের প্রকাশক। সুতরাং কোনো অর্থেই রাষ্ট্র সমাজের সমব্যাপক হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, তাঁরা অনেকে আরো বলেন যে সমাজের অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে রাষ্ট্র মোটেই প্রধান সংগঠন নয়। গণতান্ত্রিক বক্তব্যের প্রধান ঝোঁকটাই হলো রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান হতে না-দেওয়া। কারণ, তাতে ওঁদের ভয় ব্যক্তির অধিকার সম্পূর্ণ খর্ব হবে। রাষ্ট্র সমাজের নামে ব্যক্তিকে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করবে। সমাজ ও রাষ্ট্র সমব্যাপক হলে রাষ্ট্রই সমাজের মতো ব্যক্তির জীবনে স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। সুতরাং রাষ্ট্রের স্বৈরাচারকেও তখন ব্যক্তির স্বভাবজ বলে মানতে হয় এবং ব্যক্তি আর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থাৎ নিজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না।

রাষ্ট্র ও সমাজের ব্যাপকতার আলোচনায় গণতান্ত্রিক পণ্ডিতরা মার্কস-বাদের সমর্থন পান। হেগেল শিষ্য কার্ল মার্কস বিপ্লব ও শ্রমিক শ্রেণীর রাজত্বের লক্ষ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রকে পৃথক করে দেখান এবং জানান যে রাষ্ট্র কখনোই সমাজের পুরো ক্ষমতা পেতে পারে না। যদিও মার্কস রাষ্ট্রকে ক্ষমতার আধার মনে করেছেন।

ভাববাদী বক্তব্যের বিরুদ্ধে যদিও বলা হচ্ছে যে ভাববাদ সমাজ ও রাষ্ট্রকে সমার্থক মনে করে তবু একথায় সত্য খুব কম। ভাববাদীরা চিরকালই সমাজকে মূল ও আদি অবস্থা বলেন। জানান যে একমাত্র সমাজই মানুষের সামগ্রিকতার পটভূমিকা। রাষ্ট্র তার নানা সংগঠনের মধ্যে একটি। ভাববাদীরা এই প্রসঙ্গে যে কথা জানাতে চান তা হলো প্রতিটি সংগঠন। এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত যে ব্যক্তি ধাপে ধাপে বিবর্তনের উন্নতিতে একটা সংগঠন থেকে আর একটা সংগঠনে পৌঁছোয়। রাষ্ট্র পরিবারেরর মতোই গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন এবং রাষ্ট্র ও ব্যক্তিতে কোনো বিরোধ নেই। রাষ্ট্রই ব্যক্তির চূড়ান্ত প্রকাশ।

গণতান্ত্রিক পণ্ডিতরা রাষ্ট্র ও সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিতে যে বিরোধ তৈরি করেছেন তার উদ্দেশ্য আগেই বলেছি যে ব্যক্তির স্বার্থকে রাষ্ট্রের হাত থেকে রক্ষার জন্যে। রাষ্ট্র ও সমাজ এবং রাষ্ট্র ও ব্যক্তিতে ফারাক থাকলে ব্যক্তি সহজেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে। বিদ্রোহের অধিকারকে সুদৃঢ় করবার জন্যেই সমাজকে প্রধান ও রাষ্ট্রকে অপ্রধান সংগঠন বলতে হয়।

৩। রাষ্ট্রের স্বাভাবিকতা (The Naturalness of the State)

সমাজ প্রসঙ্গে আলোচনায় আমরা এই প্রশ্নটি তুলেছিলুম যে সমাজ মানুষের জীবনে কৃত্রিম না স্বাভাবিক। কৃত্রিমতার অর্থ যা মৌলিক প্রয়োজনে লাগে না। আর তা-ই স্বাভাবিক যা না-হলে আমি যা তা হতে পারি না। আলোচনায় দেখেছি যে সমাজ ছাড়া মানুষ মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। সমাজেই মনুষ্যত্ব এবং মনুষ্যত্বেই সামাজিকতার সূত্রপাত।

রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতার প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্নটা তুলেছেন ভাববাদী পণ্ডিতরা। ওঁরা বলতে চাচ্ছেন যে রাষ্ট্র যদিও পরবর্তী সংগঠন তবু রাষ্ট্র না-হলে ব্যক্তির চলেনা। কাজেই গণতান্ত্রিক পণ্ডিতদের মতো ব্যক্তি ও রাষ্ট্রে কোনো বিরোধ তৈরি করা যায় না। গণতান্ত্রিক পণ্ডিতদের বিরোধটা বর্তমানকালে সর্বাধিক স্পষ্ট 'কল্যাণকামী', (welfare) রাষ্ট্রের কল্পনায়। এই মতবাদ আবার দাঁড়িয়ে আছে গণতান্ত্রিক উদারনৈতিক বক্তব্যের ওপর। কবডেন, ব্রাইট, জেফার্সন, পেইনদের আলোচনায় গণতান্ত্রিকতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তৈরি হয়েছে উপযোগিতাবাদের দ্বারা। প্রধানতই জেরেমি বেণ্টাম ও জন ষ্টুঅর্ট মিল গণতান্ত্রিক বক্তব্যে রাষ্ট্রের ও ব্যক্তির মধ্যে দূরপনেয় বিরোধ দেখতে পান এবং ঘোষণা করেন যে, যে যার স্থানে থাকুক। একজন যেনো আর একজনের এলাকায় পা না বাড়ায়। রাষ্ট্র থাক তার পুলিশী কাজ নিয়ে, আর ব্যক্তি চলুক তার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের লক্ষ্যে। মিলের 'আত্ম-সম্পর্কিত' কাজ ও 'পর-সম্পর্কিত কাজের' বিখ্যাত বিভাগটি এই বিরোধকে প্রকাশ করে। উপযোগিতাবাদের উৎস দার্শনিক জন লকের চিন্তায়। লক গোড়াতেই হবসের মতো রাষ্ট্র ও ব্যক্তিকে তফাৎ করে নিয়ে চুক্তির মধ্য দিয়ে তাদের মিলবার একটা ব্যবস্থা করেছিলেন। চুক্তি যদিও লকের মতে ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করবার জন্যে তবু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে চুক্তিতত্ত্বে দুই পক্ষকে স্বীকার করে নিতে হয়। যখন দুপক্ষ থাকে তখন স্বার্থের দুটো ভাগ উপস্থিত অর্থাৎ বিরোধ স্বতই স্বীকৃত। এই বিরোধ এতোই মৌলিক যে চিরকাল চুক্তিটা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককে প্রকাশ করবে এবং যতোবার রাষ্ট্র বেতাল হবে, চুক্তির বিরুদ্ধে যাবে ততোবারই ব্যক্তি রাষ্ট্রকে শুধরে নেবে প্রতিবাদে, বিদ্রোহে।

চুক্তিতত্ত্বে রাষ্ট্র স্বাভাবিক নয়

এই বক্তব্যটির শিকড় এতো গভীর যে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ববাদী হবস্ রাষ্ট্রকে ব্যক্তির চুক্তির ওপর দাঁড় করান। অর্থাৎ হবস্‌ও ধরে নিয়েছেন রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবনে স্বাভাবিক নয়, প্রয়োজনের একটি কৃত্রিম সংগঠন মাত্র। প্রয়োজনটাও হবস্ স্পষ্ট করে বলেছেন। প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য ব্যক্তিরা সমাজ গড়ে। সমস্ত উদারনৈতিক বক্তব্যে এই চুক্তিতত্ত্ব উপস্থিত। রাষ্ট্রকে এই তত্ত্বে কেবলমাত্র একটি হাতিয়ার মনে করা হচ্ছে। রাষ্ট্র হয় হাতিয়ার হিসেবে ব্যক্তির জীবনে মঙ্গল আনবে অথবা আনবে না। যদি আনে তো ভালো, না আনলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

অথচ ভাববাদীরা, যেমন প্লেটো এরিস্টটল থেকে হেগেল ব্র্যাডলী বোসাঙ্কেট ইস্তক সবাই বলেছেন যে, স্বাভাবিক না মনে করবার কোনো কারণ নেই। প্লেটো এরিস্টটল জীবনের উদ্দেশ্যতত্ত্ব তৈরি করে জানিয়েছিলেন যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি একমাত্র শ্রেষ্ঠ সমাজেই সম্ভবপর। সুতরাং ব্যক্তির মতোই রাষ্ট্রেরও মঙ্গলামঙ্গল আছে। ব্যক্তি যেমন তার পূর্ণতার দিকে চলে, রাষ্ট্রও তেমনি চলবে। রাষ্ট্রের পরিণতি জীবনের পরিপূর্ণ শুভ লক্ষ্যে। ব্যক্তির জীবনে নানা কারণে বাধা আসতে পারে। সেই ব্যক্তিকে আমরা বলি অপরিণত। তেমনি রাষ্ট্রও তার আদর্শ পূর্ণ করতে না-পারে। সেক্ষেত্রে বলতে হবে রাষ্ট্র নিজস্ব পরিণতিতে পৌছোয় নি। তখন চেষ্টা হবে কেমন করে অপূর্ণতা দূর করে তাকে পূর্ণতায় অধিষ্ঠিত করা যায়। হেগেল এ-কথাই বোঝাতে চেয়েছেন রাষ্ট্রের 'সত্তাতত্ত্বে' যে রাষ্ট্রই ব্যক্তির পূর্ণতার আধার কারণ রাষ্ট্রই পূর্ণতা। ব্যক্তিকে পরিবার ইত্যাদি সংগঠনের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে প্রস্তুত হয়ে পৌছোতে হয় তার পূর্ণতায়। হেগেলের বক্তব্যকেই ইংরেজ ভাববাদীরা ব্যাখ্যা করে দেখান যে প্রয়োজনে ব্যক্তি নিশ্চয় বিদ্রোহ করতে পারে কিন্তু তার দ্বারা প্রমাণ হয় না যে রাষ্ট্র ও ব্যক্তি পরস্পর বিরোধী। বরং একমাত্র রাষ্ট্রই ব্যক্তির 'প্রকৃত সঙ্কল্প' জানে ও প্রকাশ করে। রাষ্ট্র অপরিণত হলে 'প্রকৃত সঙ্কল্প' চাপা পড়ে তখন তাই বিদ্রোহকে সহজেই সমর্থন করা যায়। তখনকার বিদ্রোহের অর্থ ব্যক্তির নিজের পরিণতির প্রয়োজনেই অপূর্ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

ভাববাদ: রাষ্ট্র স্বাভাবিক

রাষ্ট্রকে তাই বেণ্টাম মিলদের মতো হাতিয়ার ভেবে কৃত্রিম মনে

করবার কোনো কারণ নেই, পরিণত রাষ্ট্র পরিণত ব্যক্তির জীবনে মূলগত কারণেই স্বাভাবিক। মার্কসবাদীরা অবশ্য বলেন যে সাম্যবাদী পর্যায়ে সমাজে রাষ্ট্র 'ঝরে যাবে' তবু এ-কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায় নি যে সমাজে নিয়ন্ত্রণ বলে কিছু থাকবে না। সমাজে নিয়ন্ত্রণ থাকলে তার নাম ও চরিত্র কি হবে সে বিষয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাষ্ট্র তখন বর্তমান অবস্থায় না-থেকে হয়তো নতুন রূপ নেবে।

৪। রাষ্ট্রই শক্তি (The State as force)

কৃত্রিম হোক বা স্বাভাবিক হোক সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্রের বিধিবদ্ধ স্পষ্ট কাঠামো ও রূপ আছে। টমাস হব্‌স চুক্তির মধ্যে রাষ্ট্র গড়ে রাষ্ট্রের চরিত্রকে এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ দিয়েছিলেন যা বুঝতে সার্বভৌমতার তিনটি চরিত্র বিষয়ে অবহিত হতে হয়। হব্‌সের ভাষ্যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অখণ্ড, অপরিবর্তনীয় ও চূড়ান্ত। রাষ্ট্র ক্ষমতার জোরেই এই তিনটি বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এই ক্ষমতাই রাষ্ট্রের প্রাণ, কারণ শক্তির দ্বারাই রাষ্ট্র দুর্বিনীত, স্বৈরাচারী ব্যক্তিদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনবে। শক্তির সামান্যতম অভাবে সমাজ বন্ধনের বাধ্যবাধকতা নষ্ট হবে এবং আবার প্রকৃতির রাজত্ব ফিরে আসবে। হবস্ রাষ্ট্রকে শক্তির আধার নামে পরিচিত করবার পর জন লকের মতো উদারনৈতিক গণতন্ত্রবাদীকেও স্বীকার করতে হয়েছে। লকও বুঝেছিলেন যে রাষ্ট্র যারই হোক, রাষ্ট্রের ভিত্তি ক্ষমতা ও শক্তি। ব্যক্তিরা যদি রাষ্ট্রের মতোই একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয় তবে চুক্তির মধ্য দিয়ে সিভিল সোসাইটিতে আসবার কোনো দরকার ছিলো না। এমনকি ফরাসী বিপ্লবের দার্শনিক রুশোও স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছিলেন যে দরকার হলে সংখ্যালঘিষ্ঠদের জোর করে 'সাধারণ সঙ্কল্প' মানাতে হবে! রাষ্ট্রের যদি শক্তিই না থাকবে তবে জোর করে মানাবার কথা ওঠে না।

রাষ্ট্রে যে শক্তি জমা থাকে তার বাহ্য প্রমাণ হলো সামরিক বাহিনী, আরক্ষা বাহিনী, কয়েদখানা, আইনকানুন ইত্যাদি। বাহ্যরূপ ও চরিত্র মিলিয়ে অনেক পণ্ডিত ঘোষণা করেন যে রাষ্ট্রের জন্ম যেমন শক্তির মধ্যে বা শক্তির কারণে, তেমনি রাষ্ট্রের ভিত্তিও শক্তি। শক্তিতেই রাষ্ট্রের জন্ম কথাটার অর্থ বলশালীরা দুর্বলদের পদানত করেই রাষ্ট্র গড়েছে। মানব

সভ্যতার আদিতে জোর যার মুলুক তার নীতিটি কার্যকরী ছিলো। সুতরাং বলশালীর সেই স্বর্গে পারস্পরিক স্বার্থের কারণেই একটি ঐক্যবদ্ধ অথচ শক্তিশালী সংগঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। যাতে বলশালীরা সংঘবদ্ধভাবে সমস্ত দুর্বলদের দাবিয়ে রাখতে পারে। অবশ্য মনে রাখতে হবে ক্ষমতার এই প্রয়োগ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ছিলোনা, ছিলো গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে।

মধ্যযুগে চর্চের কর্তারা অনেক সময় রাষ্ট্রকে হেয় প্রমাণ করবার জন্যে বলেছেন যে রাষ্ট্র পশুশক্তির বাহন। অর্থনীতির 'লেসেফেয়ার' বাদীরা তাদের অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করবার জন্য অনেক সময় রাষ্ট্রকে শক্তির আধার বলেছেন। এ কথায় তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন যে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করলে তাদের স্বাধীন কর্মকাণ্ডটি নষ্ট হবে এবং তারই ফলে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণটি ব্যাহত হবে। মার্কসবাদীরা কিন্তু রাষ্ট্রকে সমালোচনার জন্যে শক্তির আধার বলেন না। তাঁরা বলেন যে, যে-কোনো রাষ্ট্রের স্বরূপই শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কারণ রাষ্ট্র শ্রেণী স্বার্থের বাহন। শ্রেণী স্বার্থের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রকে ক্ষমতার ব্যবহার করতে হয়, প্রতিবাদী জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখতে হয়। বর্তমানে যেমন সামন্ততন্ত্র ভেঙে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। এই রাষ্ট্রটি তার ভিত্তি রক্ষা করছে শক্তির দাপটে।

অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হব্‌স লকের বক্তব্য বা মার্কসবাদী বক্তব্যে উভয়তই গোড়ায় বলা হচ্ছে শক্তির মধ্যে রাষ্ট্রের জন্ম। হব্‌স বলেছেন বিশৃঙ্খলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ব্যক্তিদের শক্তি রাষ্ট্রের হাতে এলো আর মার্কস বলছেন অর্থনীতিতে প্রধান শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে শক্তি কায়েম করলো। দ্বিতীয়ত, ওঁদের উভয়েরই বক্তব্য যে রাষ্ট্রের অধিষ্ঠান অর্থাৎ সৃষ্টির পরবর্তী জীবনও শক্তির ওপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্র কোনো এক মুহূর্তেও শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। হব্‌স বলছেন শক্তিহীন রাষ্ট্র শৃঙ্খলা রক্ষা করতে অক্ষম সুতরাং একমাত্র শক্তিই তার অবলম্বন। মার্কসও বলছেন যে শ্রেণীস্বার্থকে রক্ষা করবার জন্য পূর্ণপ্রভুত্ব না-থাকলে শ্রেণীর অস্তিত্বই বিপদজনক। এ-কারণেই তিনি শ্রমিক শ্রেণীর রাজত্ব গড়বার অবস্থাকে নাম দিয়েছেন 'dictatorship'। বুর্জোআ যুগে সর্বময় প্রভুত্ব থাকে বুর্জোআদের। সামন্ততন্ত্রে সামন্তদের। তেমনি শ্রমিক পর্বে শক্তির প্রতিভূ রাষ্ট্র হবে শ্রমিক রাষ্ট্র।

বিখ্যাত প্রুশীয় ঐতিহাসিক ট্রিট্‌শকে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দেন 'The State is the public power of offence and defence, the first task of which is the making of war and the administration of justice.' প্রুশীয় ঐতিহাসিকের বক্তব্যে তবু 'ন্যায় সংগঠনে'র কথা থাকে কিন্তু ফন বার্ণহার্ডি স্পষ্টই ঘোষণা করেন যে যুদ্ধই জীবনের মৌলিক সত্য এবং রাষ্ট্রকে এই সত্যই প্রকাশ করতে হয়। ওঁর ভাষায় 'The first and paramount law is the assertion of one's own independent existence'. এই স্বাধীন অস্তিত্বের প্রমাণ সে রাখে তার সংগ্রামী আত্মপ্রতিষ্ঠায়। বার্ণহার্ডি তাই জানান যে 'Might is the supreme right, and the dispute as to what is right is decided by the arbitrament of war. War gives biologically just decision, since its decisions rest on the nature of things'. এই প্রসঙ্গেই জর্মান দার্শনিক ফিকটের বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করা যায় 'Preserve peace that you may begin war with an advantage in your favour'.

সমালোচনায় শুরুতেই স্বীকার করা দরকার যে রাষ্ট্র শক্তির প্রকাশ করে। যে-কোনো চরিত্রের রাষ্ট্রই হোক না কেনো, গণতান্ত্রিক গান্ধীবাদী বা সাম্যবাদী, শক্তির সরঞ্জাম রাষ্ট্রকে রাখতেই হয়। এই শক্তির প্রয়োজন বাইরের শত্রু ও ভেতরের শত্রুর জন্য। অর্থাৎ সংগঠনটির আত্মরক্ষা ও অস্তিত্বের প্রয়োজনে শক্তি অবশ্য প্রয়োজনীয়। বিখ্যাত ইতালীয় রাষ্ট্রনীতিবিদ মাকিয়াভেলী ঘোষণা করেছিলেন 'When the safety of the country is at stake no consideration of justice, or injustice, of honour and dishonour can find a place. Every scruple must be set aside.' শ্রেষ্ঠ জার্মান দার্শনিক হেগেল একবার লিখেছিলেন যে যুদ্ধের অবস্থাতেই রাষ্ট্রের শক্তির চূড়ান্ত পরিচয়। ওঁর ভাষায় 'The state of war shows the omnipotence of the state in its individuality; country and fatherland are then the power which convicts of nullity the independence of individuals.' এই সব বক্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে যে শক্তিহীন রাষ্ট্র নামে কোনো সংগঠনই সম্ভব নয়। সাধারণ-ভাবেই বোঝা যায় যে, যে কোনো সংগঠনই কিছু পরিমাণ শক্তির আধার। কারণ, সংগঠনের নির্দিষ্ট কর্ম থাকে। কর্মের প্রয়োজনেই শক্তির কথা

রাষ্ট্র শক্তির প্রকাশ করে

আসে। সুতরাং প্রধান সংগঠন রাষ্ট্রের কেন্দ্রে শক্তি যে থাকবেই তাতে আর আশ্চর্য কি। অহিংসার প্রধান পুরোহিত স্বয়ং গান্ধীজীকেও মানতে হয়েছিলো যে রাষ্ট্রে ন্যূনতম শক্তি রাখতেই হয়। সংগঠনের অন্তর্নিহিত বিরোধকে থামবার জন্যে যে-শক্তির প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য। কিন্তু প্রথম সমস্যাই হলো শক্তির মতবাদ যাঁরা সমর্থন করেন তাঁরা শুধু রাষ্ট্রের জন্ম বৃত্তান্তই বলতে চান না, রাষ্ট্রের শক্তিমূলক কাজকর্মকেও সমর্থন করতে চান।

শক্তির উপস্থিতি মানা ও সর্বত্রই শক্তির প্রয়োগ সমর্থন করা এক কথা নয়। সামাজিক চুক্তি মতবাদের গুরুরা রাষ্ট্রজন্ম বৃত্তান্তের নামে স্বৈরাচারী ক্ষমতাবান রাষ্ট্রকেও মানিয়ে নিতে চান। শক্তিকে দুভাবে দেখা যায়। একটি হলো পাশবিক দৈহিক শক্তি আর অন্যটি নৈতিক শক্তি। রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে দৈহিক শক্তিকেই স্থায়ী বলে মানবার কোনো কারণ নেই। মানলে গোড়াতেই স্বীকার করতে হয় যে রাষ্ট্র মানুষের স্বাভাবিক নয় এবং গ্লকন ও এডিম্যানটাসের বক্তব্য একশো ভাগ সত্য যে মানুষ হয় ভয়ে অথবা লোভে রাষ্ট্রকে সমর্থন করছে। অথচ আমরা জানি শক্তি অধিকার তৈরি করে না। অধিকার, রাষ্ট্রের মতোই জনসাধারণের স্বীকৃতিতে গড়ে। শক্তিকেই রাষ্ট্রের উৎস ও ভিত্তি মনে করলে প্রতিমুহূর্তে শক্তির লীলাকে উপস্থিত করতে হয় কারণ সেক্ষেত্রে শক্তির দাপট ছাড়া কোনো ব্যক্তি সমাজ বা রাষ্ট্রের বন্ধনকে মেনে নিতে রাজি হবে না। অথচ আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাতেই জানি যে রাষ্ট্র প্রতিপদে শক্তি নিয়ে আমাদের জীবনে উপস্থিত হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরোক্ষভাবে উপস্থিত থাকে আমাদের চিন্তায়, আমাদের সম্মতিতে। আমরা নিজেরাই সম্পর্ক গড়ি এবং সম্পর্কের সূত্রে জীবনকে পরিচালনা করি। রাষ্ট্রকে শক্তির মুখোস ছাড়াই আমরা মেনে নিয়েছি জীবনের কল্যাণের জন্য। রাষ্ট্র শুধুই শক্তি হলে ব্যক্তিদের সম্পর্ক ও সম্মতি নিছক মিথ্যা হয়ে যেতো।

শক্তির প্রয়োজন, শক্তির অপব্যবহার এক নয়

সঙ্গে সঙ্গেই একটি প্রশ্ন তোলা যায়ঃ বেশ রাষ্ট্র না হয় শক্তিতে জন্মালো এবং শক্তিকেই ভিত্তি করলো কিন্তু শক্তিকে পাচ্ছে কোথা থেকে? মার্কস বলবেন অর্থনীতিতে শক্তিশালী শ্রেণীর কাছ থেকে। কিন্তু তারাই বা পেলেন কোথায়? জনসাধারণ দিয়েছেন বলে। জনসাধারণ না দিলে শক্তির প্রসঙ্গই ওঠে না। জনসাধারণের সম্মতি রাষ্ট্রকে আদায়

করতেই হয়, ভয় দেখিয়ে কিম্বা রাজি করিয়ে। উভয়তই জনসাধারণের সমর্থন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তারা কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণীকে ভয়ে মানতে পারে কিন্তু সংঘবদ্ধতায় পরে তাদের অস্বীকার করতে পারে। সুতরাং শক্তির উৎস জনসাধারণ। জনসাধারণের সম্মতিতেই রাষ্ট্রের ভিত্তি।

এই প্রসঙ্গে বার্ণহাডি ও স্যর হেনরী মেইনের একটি বক্তব্য বিষয়ে অবহিত থাকতে হয়। বার্ণহাডি ঘোষণা করেছেন যে প্রকৃতির নিয়মই হলো অবিরাম সংগ্রাম, যে যেমন করে পারে বাঁচার লড়াই। একমাত্র শক্তিশালীই এই লড়াইয়ে বাঁচে। মেইনও প্রায় এই বক্তব্যের সমর্থনে লেখেন 'beneficent private war, which make one man strive to climb on the shoulders of another and remain there through the law of the survival of the fittest.' হর্বার্ট স্পেনসরও একইভাবে জীবনযুদ্ধে শক্তিশালীর বেঁচে থাকার কথা ('Survival of the fittest) বলেন। এমনকি তিনি সমাজে দুর্বলদের রক্ষা করা বিষয়ক আইন প্রণয়নেরও বিরোধী।

এই বক্তব্যের প্রধান ত্রুটি এই যে এখানে প্রাকৃতিক নিয়মকে মানুষের সমাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রকৃতির নিয়ম ও মানুষের নিয়ম এক খাতে বয় না। দ্বিতীয়ত, জীবনযুদ্ধে 'যোগ্যতম' ব্যক্তির ব্যাখ্যা নানাভাবে সম্ভব। সমাজে যোগ্যতম ব্যক্তি তিনিই নন যার গায়ে জোর বেশি। বরং উল্টোটাই সত্যি যে, মানুষ তার চেয়ে শতগুণ বলশালী জন্তু জানোয়ারদের ছাড়িয়ে বুদ্ধি বিবেচনার বলেই প্রকৃতিতে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। মানুষের যোগ্যতা তাই কেবলমাত্র মাংসপেশীর শক্তি নয়, সংঘবদ্ধতা ও বুদ্ধির জোর। সুতরাং 'শক্তির ভিত্তি' প্রসঙ্গটিই আমাদের ব্যাখ্যা মতো সম্পূর্ণ সত্য নয়।

সমাজে 'জীবন সংগ্রাম' কথাটির অর্থও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে লড়াই নয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিরোধ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সমাজে বিরোধ প্রধানতই গোষ্ঠীতে ও শ্রেণীতে। আর সমাজে বিরোধ মূলত শারীরিক নয়, ভাবনাগত। বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনার সূত্রেই ব্যক্তিদের আদর্শ, কল্পনা ও বিশ্বাস তৈরি হয়। সংঘর্ষ তাই প্রতিপদে নানা মত ও বিশ্বাসে। আর মত ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই আমরা মানুষের বৈশিষ্ট্যে এসে দাঁড়াই। মানুষ প্রাণী-জগৎ থেকে তফাৎ হয়েছে তার বুদ্ধি বিবেচনায় এবং বুদ্ধির সাহায্যেই ক্রমশ

জীবন সংগ্রাম ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে লড়াই নয়

সভ্যতার শিখরে উঠেছে। সুতরাং মানুষ কেবলমাত্র পশুর মতো শক্তির দাপট প্রকাশ করবে ও শক্তিকেই মানবে এমন কথা ভাবার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া মানুষের স্বাভাবিক সংগঠন সমাজই তো সম্পর্ক। সম্পর্কের টানটা যদি সত্যি হয় তবে সমাজ জীবনে শুধুমাত্র শক্তির লীলা চলতে পারে না। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও হৃদ্যতাও একই রকমে সত্যি হতে বাধ্য। শক্তি রাষ্ট্রের একটি প্রকরণ হতে পারে কিন্তু প্রতিমুহূর্তেই শক্তির ব্যবহার বর্বরতা মাত্র। অধ্যাপক লাস্কি এ-বিষয়ে বেশ বলেছেন যে, রাষ্ট্র 'possesses power because it has duties. It exists to enable man, at least potentially, to realize the best that is in themselves' লাস্কির এই বক্তব্য সত্য হলে ভাববাদীদের মতোই প্রায় বলতে হয় যে, রাষ্ট্র ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যম। কাজেই আত্মবিরোধী শক্তিতত্ত্বের কথা অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন। রাষ্ট্র প্রয়োজনে শক্তি ব্যবহার করে মাত্র। শক্তি তার প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। এ-কথাই ইংরেজ ভাববাদী দার্শনিক টি. এইচ. গ্রীণ চমৎকার বলেছেন 'Will, not force, is the basis of the state.'

শক্তিতত্ত্বের প্রসঙ্গে আরো একটি প্রশ্ন ওঠে যে, শক্তি প্রয়োগের সীমা কি? রাষ্ট্র যেমন খুশি ও যতোদূর খুশি তার সীমা বাড়িয়ে নিতে পারে না। 'বহুত্ববাদী' দার্শনিকরা বলতে চেয়েছেন রাষ্ট্র যেহেতু অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে একটি সুতরাং তাকেও নিজের মাত্রা জানতে হয়, সঠিক ভাবে সমাজে চলতে হয়। সে যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। অন্যান্য সংগঠনের সম্পর্কে তাকে নিজের অধিকারের মাত্রা স্থির করতে হয়। 'বহুত্ববাদী'দের বিরুদ্ধে যদিও ঘোষণা করা হয় যে রাষ্ট্র অন্যান্য সংগঠনের অন্যতম হলেও সর্বপ্রধান, তবু এ-কথা রাষ্ট্রকর্তৃত্ববাদীরা দাবি করতে পারবে না যে জনসাধারণকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্র স্বৈরাচার চালাবে। রাষ্ট্র কর্ণধারদের জনসাধারণের সমর্থন সর্বদাই দরকার করে এবং কথনোই তারা সমগ্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। নিজেদের স্বপক্ষে কোনো কোনো গোষ্ঠী বা শ্রেণীর সাহায্য তাদের প্রয়োজন হয়। শক্তি প্রয়োগের সীমা কার্যত নির্ভর করে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের স্বার্থের ওপর। অর্থাৎ এমন যদি হয় যে রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগ করলে তার ভিত্তি নষ্ট হবে তবে সে নিশ্চয়ই তা করবে না।

দু'একজন সমাজতত্ত্ববিদ বলতে চেয়েছেন যে, শক্তি না থাকলেও রাষ্ট্র 'রাষ্ট্রই' থাকতো। কারণ তাঁদের মতে 'বলপ্রয়োগের ভূমিকা হলো পরিপূরক এবং মাধ্যমস্বরূপ'। কিন্তু কথাটা যুক্তিসংগত নয়। যে-কোনো সংগঠনের পেছনে যেমন জন সমর্থন বা সহযোগিতা থাকে তেমনি সহযোগিতার অর্থই হলো সঞ্চিত শক্তি। সংগঠন গড়া হয় কর্মের জন্য এবং কর্ম কখনোই বাধাহীন ভাবে সম্ভব নয়। বাধা এলে সংগঠনকে নিজের সত্তা ও অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়। স্বভাবতই তখন প্রয়োজনে শক্তি ব্যবহারের কথা থাকে। যেহেতু রাষ্ট্র সমাজের রাজনৈতিক কর্ম সম্পাদনের জন্য গড়েছে, রাষ্ট্রকে শক্তির অধিকারী হতেই হবে। ব্যবহার হলো কি হলো না তা নির্ভর করে অবস্থার ওপর। কিন্তু শক্তিহীন সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্রের কোনো সত্তাই নেই। রাষ্ট্র রাজনৈতিক কর্মের সংগঠন হিসেবে, ব্যক্তির পরিপূর্ণতার লক্ষ্য হিসেবে শক্তির নিশ্চিত অধিকারী।

৫। রাষ্ট্রের কাজ (Function of the State)

সাধারণভাবে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে প্রত্যক্ষত রাষ্ট্রের তিনটি প্রধান কাজ। (ক) আইন প্রণয়ন করা, (খ) শাসন করা ও (গ) বিচার করা। এই প্রধান তিনটে মোটা কর্তব্য বিভাগের পর রাষ্ট্রের চরিত্রানুযায়ী কর্ম বিষয়ে দার্শনিকদের নানা ধরনের বক্তব্য আছে।

ইংরেজ উপযোগিতাবাদীদের গুরু জেরেমি বেণ্টাম রাষ্ট্রের কর্তব্যকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন আইনের মারফত রাষ্ট্র সমস্ত রকম সামাজিক মঙ্গল আনবে। তিনি আরও ভেবেছিলেন যে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা নির্ভর করে সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর এবং এই সংখ্যাগরিষ্ঠের মনোভাব সহজেই জানা যায় কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠরা আদর্শ সম্প্রদায়ে আত্মপ্রকাশ করে গীর্জা, সংবাদপত্র ও সরকারের মধ্যে। বেণ্টামের মনে কখনো কখনো সন্দেহ দেখা দিলেও তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের চরিত্র ও রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিষয়ে প্রশ্ন তোলেননি। কিন্তু প্রশ্নটি তোলেন জেমস মিলের পুত্র জন স্টুয়ার্ট মিল।

মিল জেরেমি বেণ্টামের মতোই গোড়ায় বলেন যে মানব কল্যাণ ও ব্যক্তির কল্যাণ নির্ভর করে উপযোগিতায়। উপযোগিতা বলতে বোঝা যাবে, মিলের ভাষায়, 'utility, in the largest sense, grounded on the permanent interests of man as a progressive being'. এই বক্তব্য থেকে মিল সিদ্ধান্ত করেন—শ্রেষ্ঠ

মানব কল্যাণ

রাষ্ট্রের কর্তব্য ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করা। শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি বিবেচনায় ব্যক্তি মুছে যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠের ঝোঁকই হবে নিজেদের বক্তব্য মানিয়ে নেবার জন্যে, তা সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক। সে ক্ষেত্রে দুটি পথ খোলা থাকে। হয় ব্যক্তি তা মেনে নেবে, নয়তো প্রতিবাদ করবে। মিল বলছেন, রাষ্ট্রে প্রতিবাদ করবার পূর্ণ অধিকার ব্যক্তির থাকা উচিত। ওঁর মতে 'Complete liberty of contradicting and disproving our opinion is the very condition which justifies us in assuming its truth for purposes of actions : and on no other terms can a being with human faculties have any rational assurance of being right.' সুতরাং মিল রাষ্ট্রের ব্যক্তির অধিকার ও সীমা বিষয়ে চিন্তিত হন। তিনি জানান রাষ্ট্রের সীমা দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে তাই তিনি প্রথমেই বলে নিচ্ছেন যে বৈচিত্র্যই সভ্যতার মূল কথা। রাষ্ট্র এই বৈচিত্র্যের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। **মিল 'হস্তক্ষেপহীনতা'কেই রাষ্ট্রের মূল কর্তব্য** হিসেবে প্রচার করছেন। রাষ্ট্র বৈচিত্র্য রক্ষা করবে, ব্যক্তির জীবনে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবে। তার বেশি এগোতে পারবে না ব্যক্তির জীবনে। মিল অবশ্য একটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে অধিকার দিয়েছেন অন্যান্য ব্যক্তির জীবনে হস্তক্ষেপ করবার এবং তা হলো 'the sole end for which mankind are warranted, individually or collectively, in interfering with the liberty of action of any of their member, is self protection...... the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others.' দুটো শর্ত পাওয়া গেলো হস্তক্ষেপের। প্রথমত, আমি আত্মরক্ষার জন্য অন্যের স্বাধীনতা খর্ব করতে পারবো ও দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র অন্যের জীবনে ক্ষতিকারক ব্যক্তিদের ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা দিতে পারবে।

এই বক্তব্য থেকেই মিল রাষ্ট্রের কর্তব্যকে প্রধানতই নঞর্থক ভাবছেন। রাষ্ট্র নিজে থেকে কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করবে না, কেবলমাত্র ব্যক্তিদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার-বাধাকে অপসারিত করবে। মিল তাই বলেন যে প্রতিনিধিদের সভা শাসন করবে না—তাদের কাজ হবে 'to watch and control the govt.'

মিলের পরবর্তী ক্যাণ্টপন্থী ভাববাদী দার্শনিক গ্রীন বলেন যে ব্যক্তির নৈতিক উদ্‌বর্তনের পথে প্রচুর বাধা। রাষ্ট্রের কাজ হবে এই বাধাগুলো দূর করা। বাধা নানা ধরনের আছে। শারীরিক, মানসিক ইত্যাদি। গ্রীন অবশ্য বলেন না যে মানুষ হিসেবে বাঁচার মধ্যে অর্থনীতি একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেয়। কারণ, নিছক বাঁচার পরেই প্রশ্ন ওঠে ভালোভাবে বাঁচার। গ্রীনের কাছে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ততো মূল্যবান না-হলেও বোঝা যাচ্ছে তিনি রাষ্ট্রকে প্রধানতই বাধা অপসারণের কাজ দিচ্ছেন। ওঁর ভাষায় জানতে পারছি 'The function of government is to maintain conditions of life in which morality shall be possible, and morality consists in the disinterested performance of self-imposed duties.' রাষ্ট্রের প্রধান কাজ তাই নৈতিক জীবনের ন্যূনতম শর্তগুলো পূরণ করা অর্থাৎ যা না হলে নৈতিক-জীবন যাপন করা একান্ত অসম্ভব। এই কর্তব্যটাকেই গ্রীন কাণ্টের অনুসরণে বলেন যে সমাজের কাজ 'বাধার বাধাস্বরূপ'। অর্থাৎ জীবনে যে সব নানাবিধ বাধা মানুষকে নৈতিক ব্যক্তি হতে দিচ্ছে না রাষ্ট্র তার বাধাস্বরূপ কাজ করবে। অর্থাৎ রাষ্ট্র বাধাগুলো দূর করবে। এ পর্যন্ত গ্রীনের বক্তব্যও নঞর্থক। কিন্তু ভাববাদী দর্শনের প্রভাবে গ্রীন বলেন যে মানুষের প্রধান কর্তব্য হলো নিজেদের স্বভাবকে জানা, রাষ্ট্র তাতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে; কারণ রাষ্ট্র এক অর্থে ব্যক্তির পূর্ণতার আদর্শ।

সুইস পণ্ডিত ব্লুণ্টশ্লি বলেন, রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য স্বাজাত্যমূলক। ওঁর আলোচনায় পাচ্ছি রাষ্ট্রের কাজ হবে 'the development of the national capacity, the perfecting of the national life and finally, its completion.' অবশ্য এই সঙ্গে তিনি একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে 'provided, of course, the process of moral and political development shall not be opposed to the destiny of humanity.' ব্লুণ্টশ্লি বলতে চাচ্ছেন, যদিও রাষ্ট্রের কর্তব্য জাতীয়তামূলক তবু মানবতার লক্ষ্য সে অস্বীকার করতে পারেনা। ব্লুণ্টশ্লি রাষ্ট্রের এমন কর্ম নির্দেশ করেছেন কারণ তিনি ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের চরিত্রের মধ্যে মিল দেখতে পান। ব্যক্তি যেমন তার চরিত্রের পূর্ণতা খোঁজে, রাষ্ট্রকেও তেমন খুঁজতে হয়। ব্যক্তির কর্তব্য অন্তর্নিহিত সুপ্ত ক্ষমতাকে জাগ্রত করা আর রাষ্ট্র জাগ্রত করবে সমগ্র জাতির সম্ভাব্য

কর্ম স্বাজাত্যমূলক

ক্ষমতা। রাষ্ট্রের কর্তব্য দুটি; (১) জাতীয় শক্তিকে রক্ষা করা ও (খ) জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করা। ব্লুণ্টশ্লি সরাসরি ঘোষণা করছেন 'it must secure the conquest of the past, and it must extend them in future.'

সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে রাষ্ট্রের কর্তব্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের বক্তব্য মতো পরোক্ষ নয়। রাষ্ট্র তার চরিত্র অনুযায়ী প্রতিটি কর্মে অংশ গ্রহণ করে। সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠাতেও রাষ্ট্র তার নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে রাষ্ট্র জীবনের সমস্ত স্তর ব্যেপে থাকে। রাষ্ট্র যে-কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কর্মে বাধা দিতে পারে, এবং তাদের পরিচালিত করতে পারে। রুশোর বক্তব্য মতো রাষ্ট্র সংখ্যালঘিষ্ঠকে তার বক্তব্য মানাতে বাধ্য করতে পারে; অর্থাৎ এক কথায় রাষ্ট্র দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সমাজতন্ত্রবাদীরা শুধু রাষ্ট্রকে এই সঙ্গে একটি লক্ষ্য বা আদর্শ দিয়েছেন। রাষ্ট্র তার পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য।

অধ্যাপক বার্জেস রাষ্ট্রের লক্ষ্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও চূড়ান্ত। অধ্যাপক বার্জেস বলেছেন যে, রাষ্ট্রের কোনো **একটিমাত্র** লক্ষ্য নেই। প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে চূড়ান্ত লক্ষ্যের প্রাথমিক শর্তকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভ করাই ব্যক্তি ও সমাজের লক্ষ্য। রাষ্ট্র প্রাথমিকভাবে এই লক্ষ্য সাধনের অবস্থা তৈরি করবে। তার জন্যে প্রয়োজন স্থায়ী শান্তি, নিরাপত্তা ও অন্তর্লীন ভারসাম্য। এই ভিত্তির ওপর রাষ্ট্র ধাপে ধাপে প্রয়োজনীয় কর্ম করবে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের তালিকায় রাষ্ট্রের কর্মের হিসেব পাওয়া যায়:

(ক) বহির্শক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষার ব্যবস্থা।

(খ) পরস্পরের হাত থেকে ব্যক্তিদের রক্ষার ব্যবস্থা।

(গ) সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা।

(ঘ) চুক্তি ভঙ্গের শাস্তি ও চুক্তি রক্ষার ব্যবস্থা।

(ঙ) অক্ষমের রক্ষার ব্যবস্থা।

(চ) রোগের হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা।

রাষ্ট্রপতি হ্বিলসন (Wilson) রাষ্ট্রের কর্তব্যকে **মৌলিক** ও **করণীয়**—এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। মৌলিক বিভাগে তিনি তালিকাবদ্ধ করেন—

(ক) শৃঙ্খলা রক্ষা ও সম্পত্তি ও জীবনকে হিংসার হাত থেকে রক্ষা করা।

(খ) স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে বৈধ সম্পর্কের সীমা নির্ধারণ করা।

(গ) সম্পত্তি গ্রহণ ও বিনিময়ের ব্যবস্থা, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের ব্যবস্থা করা।

(ঘ) ব্যক্তিদের মধ্যে চুক্তির অধিকার রক্ষা করা।

(ঙ) অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা করা।

(চ) সামাজিক সুবিচারের ব্যবস্থা করা।

(ছ) নাগরিকদের রাজনৈতিক কর্তব্য, অধিকার ও সম্পর্ক নির্ধারণের ব্যবস্থা করা।

'করণীয়' বিভাগের কোনো নির্দিষ্টতা নেই। মূল কর্তব্যের সঙ্গে কোনো কোনো রাষ্ট্র বাড়তি কিছু কাজ করতে পারেন। বর্তমানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের বক্তব্য মিলিয়ে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের একটি কর্ম-তালিকা তৈরি হয়েছে। এই তালিকায় একদিকে যেমন থাকে নঞর্থক কর্ম, তেমনি থাকে প্রত্যক্ষ সমাজতান্ত্রিক কর্তব্য। এই রাষ্ট্র একদিকে যেমন সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নয়, তেমনি পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিকও নয়।

রাষ্ট্রের কর্তব্য বিষয়ে এতো দ্বিধার কারণ সমাজে রাষ্ট্রের স্থান বিষয়ে পণ্ডিতদের প্রচুর মতভেদ! আমাদের আগেই মনস্থির করতে হয় যে, রাষ্ট্রকে স্বাভাবিক মনে করবো, না মোটামুটিভাবে প্রয়োজনীয় একটি সংগঠন মনে করবো। ইতিপূর্বেই আলোচনায় দেখিয়েছি যে উদার-নৈতিক গণতান্ত্রিক পণ্ডিতরাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী; কারণ ওঁরা রাষ্ট্রকে ব্যক্তির বিরোধী মনে করেন। রাষ্ট্র বড়োজোর ওঁদের কাছে প্রয়োজন সিদ্ধির হাতিয়ার মাত্র। ভাববাদী প্লেটো ও হেগেলের মতে রাষ্ট্রকে ব্যক্তির পরিণতির আদর্শ মনে করলে এতো নঞর্থক ও সদর্থক কর্ম বিভাগের প্রয়োজন হয় না। রাষ্ট্র তখন জীবনের সামগ্রিক প্রয়োজনকেই সিদ্ধ করবে।

৬। রাষ্ট্র ও নৈতিকতা (State and Morality)

নৈতিক বিচার করি আমরা কাজের উচিত-অনুচিতের সঙ্গে মিলিয়ে। উচিত-অনুচিত আবার স্থির করা হয় একটি সংস্কৃতির নিজস্ব পরিমণ্ডলে। সংস্কৃতি জীবনের লক্ষ্য স্থির করে। জীবনের কর্ম এই লক্ষ্যের দ্বারা

নির্দিষ্ট হয় ; সুতরাং কাজের পরিমাপ হয় এই লক্ষ্যের চরিত্রে—আমরা কতোটুকু লক্ষ্যকে পালন করতে পারলাম বা পারলাম না। নৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে আবার মনে রাখতে হবে যে, নৈতিক কর্ম সর্বদাই স্বেচ্ছামূলক। বাধ্যতামূলক কর্মে যেহেতু বিচার বিবেচনার স্থান নেই, নৈতিকতার প্রসঙ্গ সেখানে অবান্তর।

নৈতিকতা সংস্কৃতির সঙ্গে

রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নৈতিকতা দু'ভাগে বিচার করা যায়। রাষ্ট্র যদি ব্যক্তির মতো নিজেই স্বেচ্ছামূলক কর্মে নিযুক্ত থাকে, তবে একান্তভাবে সেই কর্মের নৈতিকতার প্রশ্ন তোলা যায়। অন্যভাবে আমরা প্রশ্ন করতে পারি রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবনে নৈতিকতাকে কতোটুকু সাহায্য করেছে বা বাধা দিচ্ছে। প্রথম প্রশ্নটির সঙ্গে ভাববাদীদের বক্তব্য জড়িত কারণ একমাত্র তাঁরাই রাষ্ট্রকে সত্তাবান বলেন এবং তার স্বকীয় কর্মের প্রসঙ্গ তুলেছেন। দ্বিতীয়ত, প্রশ্নটির সঙ্গে সংযোগ আছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের কারণ তাঁরাই রাষ্ট্রকে ব্যক্তিরউদ্দেশ্যসিদ্ধির বাহন বা হাতিয়ার মনে করেন।

রাষ্ট্রের নিজস্ব নৈতিকতা ও ব্যক্তির নীতিতে সাহায্য

প্রথম প্রশ্নটির প্রসঙ্গে বলা যায়—যাঁরা রাষ্ট্রকে শক্তির প্রতিভূ মনে করেন তাঁরা নৈতিকতার সীমার বাইরে রাষ্ট্রকে বসান। যদি রাষ্ট্রের চরিত্র একমাত্র শক্তিই হয়, তবে শক্তির ব্যবহারই তার কর্তব্য। এই ব্যবহারের উচিত বা অনুচিত কিছু নেই। হব্‌স যেমন দেখিয়েছিলেন যে, নিজের শক্তি রক্ষা করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য কারণ তার শক্তিতেই সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা। রাষ্ট্র শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য যা-খুশি করতে পারে, যেহেতু এটাই তার স্বীকৃত কর্ম।

হব্‌স রাষ্ট্রের নৈতিকতা বিচারের মানদণ্ড ধরেছিলেন শক্তির স্থায়িত্বকে। বোঝাতে চেয়েছিলেন শক্তিই নৈতিক, কারণ প্রাকৃতিক অবস্থায় সবার অবাধ শক্তির ফলে যে অনৈতিকতার জন্ম (অর্থাৎ ধন ও প্রাণের বিপদ) তা একমাত্র রাষ্ট্র বা সিভিল সোসাইটির নির্দিষ্ট স্থির কেন্দ্রে এসে নৈতিকতা লাভ করলো। যেহেতু রাষ্ট্রের শক্তিতেই বর্তমানে সমাজের শৃঙ্খলা, শান্তি ও নিরাপত্তা। সে-কারণেই হব্‌স স্পষ্ট লেখেন 'He that carrieth that person is called sovereign and hath sovereign powers ; and everyone besides his subject' এবং 'Covenants without the sword

হবস : নৈতিকতা শান্তি

are but words, and have no strength to secure a man at all.' সুতরাং একটি লোককে নিরাপত্তা দেবার জন্যেও 'তরবারি' অর্থাৎ শক্তির প্রয়োজন। হব্‌সের এই নৈতিক তত্ত্বের ফলে রাষ্ট্রের কর্মের কোনো বিচার নেই। শক্তির প্রতিভূ রাষ্ট্রের যে-কোনো কর্মই যেহেতু নৈতিক, ব্যক্তির অধিকারকে পদদলিত করলেও সে চরিত্রভ্রষ্ট হবে না। স্পষ্টতই তিনি ঘোষণা করেছেন 'বাকি আর সবাই তার প্রজামাত্র'।

এমন বক্তব্য যে একমাত্র স্বৈরাচারের নামান্তর, তা জন্‌ লকের মনে হয়েছিল এবং রুশোও হব্‌সকে সমর্থন করেননি। লক স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন, ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য। অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রতিটি কর্মকেই নৈতিক হতে হবে। রাষ্ট্র স্বভাবতই নৈতিক কর্ম করেনা। নৈতিকতার বিচার প্রতিমুহূর্তে ব্যক্তির মঙ্গলামঙ্গলের মাত্রায়। লক্‌ সেজন্যে চমৎকার বলেন যে 'no one ought to harm another in his life, health, liberty and possessions;' রাষ্ট্র তাই এই তালিকার কোনো একটির বিরুদ্ধে গেলে বা এদের রক্ষা করতে না পারলে অনৈতিক হয়ে যাবে। লকের বিচারে নৈতিকতার কষ্টিপাথর জনসাধারণ।

রুশো এবং ভাববাদীরা রাষ্ট্রকে প্রাধান্য দেন নিশ্চয়ই; কিন্তু তাঁরা ব্যাখ্যা করে দেখান যে, ব্যক্তির পরিণত রূপই হলো রাষ্ট্র। রাষ্ট্র ও ব্যক্তিতে কোনো বিরোধ নেই। ব্যক্তি তার পরিণতির লক্ষ্যে চলতে চলতে রাষ্ট্রেই পরিপূর্ণতা পায়। কারণ একমাত্র রাষ্ট্রই তার মৌলিক সত্তায় 'সাধারণ সঙ্কল্প'কে জানে। ব্যক্তি নিজের স্বার্থের দ্বারা চালিত হওয়ায় 'সাধারণ সঙ্কল্প' থেকে বিচ্যুত হতে পারে, রাষ্ট্র কখনোই তা নয়। রাষ্ট্রই একমাত্র ব্যক্তির প্রকৃত সঙ্কল্প'কে জানে। সুতরাং নৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবনকে পরিপূর্ণ নৈতিকতায় নিয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে একটিমাত্র প্রসঙ্গ উঠতে পারে যে, রাষ্ট্র তো কখনো কখনো অন্যায় করে অর্থাৎ অপূর্ণ থাকে, তখন ব্যক্তিরা কি করবে? ইংরেজ ভাববাদী দার্শনিকরা স্পষ্টতই জানিয়েছেন যে, সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিদের বিদ্রোহের অধিকার আছে।

দ্বিতীয় বক্তব্য প্রসঙ্গে যাঁরা বলেন যে রাষ্ট্রের নৈতিকতা বিচার হবে এই দেখে যে রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবনে কতোটুকু নৈতিকতা আনতে পেরেছে, তাঁরা কার্যত রাষ্ট্রকে একটি হাতিয়ার হিসেবে দেখেছেন। হাতিয়ার হিসেবে দেখলেও তার কর্মের নৈতিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। কারণ

রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবনকে ছেয়ে রেখেছে। রাষ্ট্রের কর্মের সঙ্গে ব্যক্তির কর্ম জড়িত। রাষ্ট্র অনৈতিক হলে ব্যক্তির জীবনেও তার ছাপ পড়বে। যেমন মার্কসবাদীরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। ওঁদের মতে রাষ্ট্রকে নৈতিক হতেই হয় যদিও রাষ্ট্র একমাত্র শক্তিশালী অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর নীতিকে রক্ষা করে। রাষ্ট্র সর্বদাই নীতি বিষয়ে বড়োবড়ো কথা বলে কিন্তু জীবনের সর্বত্র শোষণ ও অন্যায়ের দুর্নীতিকে রক্ষা করে; রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বলেই ব্যক্তিদের জীবনে অন্যায়ের অবসানের জন্য, বিদ্রোহের প্রয়োজন। এঙ্গেলস বিশদ করে লিখেছেন 'A society without social contradiction will naturally be a society without lies and violence……The revolution itself is a product of class society and of necessity bears its traits. From the point of view of 'eternal truth' revolution is of course anti-moral. But this merely means that idealist morality is counter revolutionary, that is, in the service of the exploiters'. এমন কি ফ্যাসীবাদী মুসোলিনীও মানতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, তাঁদের রাষ্ট্র অন্তত 'জাতি'কে মানবে, তার স্বার্থকে দেখবে। সুতরাং রাষ্ট্র স্পষ্টতই একটি উদ্দেশ্যের বাহন হিসেবে নৈতিক কর্ম করে। এখানে নৈতিকতার অর্থ জাতীয় স্বার্থ। মুসোলিনীর বক্তৃতায় পাচ্ছি 'We Fascists have always expressed our complete indifference toward all theories……It is sufficient to have a single fixed point : the nation.'

নৈতিকতা ব্যক্তি বা জাতির স্বার্থ

রাষ্ট্র নানাভাবে ব্যক্তিকে নৈতিকতার পথে নিয়ে যেতে পারে। শিক্ষা সেক্ষেত্রে তার প্রধান মাধ্যম। শিক্ষার মধ্য দিয়ে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে ব্যক্তি কিছু 'হ্যাঁ' ও কিছু 'না' অর্থাৎ কিছু বিধি (যা তাকে মানতে হবে) ও কিছু নিষেধ (যা সে করতে পারবে না) শেখে, তার মনে সামাজিক কল্যাণ, প্রেয় ও শ্রেয়র আদর্শ গেঁথে যায়। এমনিভাবে একটি ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি, পরিবার থেকে পরিবারে শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে নীতির প্রবাহ চলে। সবাই যে তা মানে বা মেনে জীবনে প্রয়োগ করে তা নয়, কিন্তু জীবনের চারপাশে এমন একটা চাপ তৈরি হয় যে অধিকাংশ ব্যক্তিই তাকে স্বীকার করে। রাষ্ট্র আইন করেও অনেক অকল্যাণ দূর করতে পারে। সামাজিক বৈষম্য, শোষণ

ইত্যাদিকে অন্তত অনেকটাই দূর করে রাষ্ট্রনৈতিক আবহাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে। অবশ্য আইনের ক্ষমতাকে জেরেমি বেন্টাম যতোটা বাড়িয়ে ভেবেছিলেন যে, পুশপিন থেকে কবিতা পর্যন্ত তার আওতায় পড়ে, এমন নয়। আইন করে যেমন কবিতা লেখানো যায় না, তেমনি লোককে নৈতিকও করা যায় না। কারণ নৈতিকতার প্রকাশ হয় স্বেচ্ছামূলক কর্মে। বাধ্যবাধকতায় সাময়িক ফল পাওয়া যেতে পারে কিন্তু কখনোই তা স্থায়ী হয় না। রাষ্ট্র এবং তার আইন ব্যক্তির মনের মধ্যে ঢুকতে পারে না, সুতরাং তারা কেনো কতোটুকু নৈতিক হবে জানবার কোনো পথ নেই। রাষ্ট্র শুধু বাধাগুলো সরিয়ে (যেমন গ্রীণ বলেছেন) তাদের নৈতিক হবার সম্ভাবনাকে প্রসারিত করতে পারে।

সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করবো যে, রাষ্ট্র সম্পূর্ণই নৈতিক সংগঠন। তার নৈতিকতার বিচার হবে কর্মে। তাকে নৈতিক হতেই হয়, যেহেতু স্বাধীন ব্যক্তিরা নৈতিক লক্ষ্যেই জীবনকে গড়ে।

৭। রাষ্ট্র বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ (Different Theories about the State)

রাষ্ট্রের চরিত্র বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের ভিড় থেকে তিনটি প্রধান বক্তব্য তৈরি করা যায়। (ক) মার্কসবাদী বক্তব্য, (খ) গণতান্ত্রিক বক্তব্য ও (গ) ভাববাদী বক্তব্য।

(ক) মার্কসবাদী বক্তব্য—মার্কসবাদী বক্তব্যের স্রষ্টা জার্মান পণ্ডিত কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস। রুশ বিপ্লবের জনক লেনিন এই বক্তব্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন তার 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থে। মার্কসবাদ পৃথিবী-বিখ্যাত দার্শনিক হেগেলের প্রত্যক্ষ প্রভাবে গড়ে ওঠে। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মার্কস-এঙ্গেলস হেগেলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন যে, রাষ্ট্র ব্যক্তির পূর্ণতার প্রতীক নয়—রাষ্ট্র বরং সামাজিক শক্তির প্রতিভূ। সামাজিক শক্তির উৎস যদিও সমাজের সমগ্র জনসাধারণ, তবু অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী শ্রেণীই রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে এবং অন্যান্য শ্রেণীদের পদানত করে রাখে।

মার্কসবাদে রাষ্ট্র বিষয়ে প্রধান কথাই তাই এই যে, রাষ্ট্র ও সমাজ সমার্থক নয়। রাষ্ট্র সমাজের একটি প্রয়োজনীয় সংগঠন মাত্র। সমাজের এই প্রয়োজনটি হলো উৎপাদন যন্ত্রের অধিকারীদের প্রয়োজন। তারা

নিজেদের স্বার্থে, তাদের ক্ষমতাকে সর্বব্যাপী এবং চিরস্থায়ী করবার জন্য রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে। রাষ্ট্র তাই একটি হাতিয়ার, যে হাতিয়ারটি তারা চিরকাল শ্রেণী-স্বার্থ স্বজায় রাখবার জন্য প্রয়োগ করছে সমাজের সংখ্যাধিক কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন শ্রেণীর ওপর। ক্ষমতাবান শ্রেণীর চেষ্টাই তাই রাষ্ট্রকে অনাদি এবং অনন্ত হিসেবে প্রচার করার দিকে। রাষ্ট্রকে তারা অনাদি বলতে চায়—কারণ সেক্ষেত্রে বর্তমান ক্ষমতাবান শ্রেণীকেই সবাই চিরকালীনভাবে ক্ষমতাবান মনে করবে এবং ইতিহাসের প্রমাণ বিষয়ে মাথা ঘামাবো না। আবার যে সংগঠনটি অনাদি তা নিশ্চয়ই অনন্ত বলে দাবি করা যায়। মার্কস তাই দেখান রাষ্ট্র অনাদি নয়, একমাত্র সমাজই অনাদি হতে পারে। সমাজ ও রাষ্ট্রের পার্থক্য থাকলে আমরা ইতিহাসের কাছে জানতে চাইবো রাষ্ট্র কি চিরকালই আছে? রাষ্ট্র যদি চিরকালীন না হয় তবে রাষ্ট্রকে বদলানো যাবে এবং বর্তমান ক্ষমতাবান শ্রেণীর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া যাবে।

রাষ্ট্র ও সমাজ সমার্থক নয়

মার্কস তখন ইতিহাস থেকে প্রমাণ করেন যে, আদিম সমাজে রাষ্ট্র নামক কোনো সংগঠনের অস্তিত্ব নেই। আদিম সমাজকে তিনি নাম দেন 'আদিম সাম্যবাদী' অবস্থা। সমাজের গোড়ায় যদি রাষ্ট্রের চিহ্ন না থাকে তবে প্রশ্ন হবে রাষ্ট্রের প্রয়োজন কেনো এবং কবে থেকে? মার্কস তার জবাবে জানান যে, আদিম সাম্যবাদী-সমাজ ভেঙে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয় তখন সেই সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য একটি শক্তিশালী সংগঠনের প্রয়োজন হয়। এই সংগঠনটিই রাষ্ট্র। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে রাষ্ট্রের কাজ হলো সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্ষমতাবান শ্রেণীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখা। জন্মের পর থেকেই রাষ্ট্র তার যথা-বিহিত কর্ম করে আসছে। এক-একটি সামাজিক পর্যায়ে এক-একটি শ্রেণী ক্ষমতায় এসেছে এবং তাদের চরিত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রের গড়ন ও কর্ম বদলেছে। যেমন, প্রাচীন সভ্যতায় শ্রেণীভেদ ছিলো দাস ও প্রভুতে সুতরাং তখন রাষ্ট্র দাসদের দমিয়ে রেখেছে যদিও কিন্তু সামাজিক উৎপাদন তারাই করেছে। পরবর্তী-ধাপে শ্রেণীভেদ জমির মালিক ও কৃষকদের মধ্যে এবং বর্তমানকালে শ্রমিক ও বুর্জোয়া শ্রেণীতে। মার্কস্ পরবর্তী দু'টি ধাপের কথাও বলেছেন। ওঁর মতে ধনিক শ্রেণীর রাষ্ট্র শ্রমিক শ্রেণী

আদিতে রাষ্ট্র নেই : শ্রেণীর সঙ্গে জড়িত :

বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কেড়ে নেবে এবং প্রতিষ্ঠা করবে শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র। সামাজিক ধনবৈষম্যের শিকড় উপড়ে ফেলবার পর যেহেতু সমাজে আর শ্রেণীভেদ থাকবে না, রাষ্ট্রের প্রয়োজনও তখন ফুরিয়ে যাবে। সুতরাং রাষ্ট্র একদিকে যেমন অনাদি নয় তেমনি অনন্তও নয়।

এঙ্গেলস সেইজন্যে লেখেন, 'The state is therefore by no means a power imposed on society from the outside; just as little is it 'the reality of the moral idea,' 'the image and reality of reason', as Hegal asserts. Rather, it is a product of society at a certain stage of development; it is the admission that this society has become entangled in an insoluble contradiction with itself, that it is cleft into irreconcilable antagonisms, which it is powerless to dispel. But in order that these antagonisms, classes with conflicting economic interests, might not consume themselves and society in sterile struggle, a power standing above society became necessary for the purpose of moderating the coflict and keeping it within the bounds of 'order'; and this power, arising out of society, but keeping itself above it, and increasingly alienating itsolf from it, is the state.'

এঙ্গেলসের এই বক্তব্যে দু'টি প্রধান দাবি অস্বীকৃত হয়েছে। একটি দাবি ভাববাদী হেগেলের যে, রাষ্ট্রের একটি অতি-মানবীয় সত্তা আছে এবং এই সত্তাতেই ব্যক্তির পরিপূর্ণতা। মার্কসবাদ জানাচ্ছে রাষ্ট্র কখনোই অতি-মানবীয় কিছু নয়, সাধারণ পার্থিব মানুষেরই একটি উদ্দেশ্যমূলক সংগঠন মাত্র। সুতরাং রাষ্ট্র কখনোই হেগেল কথিত 'যুক্তি'র প্রকাশ নয়, যে-যুক্তিতে হেগেল ঈশ্বরের প্রকাশ দেখেছিলেন। রাষ্ট্র বরং ইতিহাসে ক্ষমতাবানদের (অর্থনীতিতে) শোষণের যুক্তিকেই প্রতিষ্ঠা করে, কখনোই এতোকাল সর্বমানবের উপকারের কথা ভাবেনি। দ্বিতীয় বক্তব্যটি গণতান্ত্রিক পণ্ডিতদের। মার্কস বলেন যে, গণতন্ত্র কার্যত শ্রেণী-শোষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যতোই গণতন্ত্রে ব্যক্তির রাজনৈতিক অধিকারের কথা থাক, অর্থনৈতিক অধিকার ব্যতীত রাজনৈতিক অধিকারের কোনো মূল্য নেই। ব্যক্তি নিশ্চয়ই তার প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে কিন্তু সমাজের আর্থিক সমস্যা মেটাতে পারে না। গণতন্ত্র তাকে মানুষের মতো বাঁচবার অধিকার দেয়নি এবং রাজনৈতিক অধিকারের নামে

রাষ্ট্রের অতিমানবীয় সত্তা নেই।

পুঁজিপতিদের রাষ্ট্রকেই কায়েম রেখেছে। সমাজে ধনবৈষম্য ও শোষণ প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে থাকছে। কল্যাণকামী রাষ্ট্রের নামে যতোই জনতার মঙ্গলের কথা বলা হোক না কেনো, তারা কখনোই রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে না। ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের কোনো বক্তব্যই সমর্থিত হয় না এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। তার জন্যে প্রয়োজন বিপ্লবের। মার্কসের ভাষায় '......the contemporary representative state is an instrument of exploitation of wage labour by capital.'। শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা দখল করবার পরের অবস্থার ছবি পাওয়া যায় এঙ্গেলসে '*The proletariat seizes the state power* and *transforms the means of production in the first instance into state property.* But in doing this, it puts an end to itself as the proletariat, it puts an end to all class differences and class antagonisms, it puts an end also to the state as the state......The government of persons is replaced by the administration of things and the direction of the powers of production. The state is not abolished, '*it withers away.*' (বাঁকা হরফ মূলের।)

মার্কসবাদের ঐতিহাসিক বক্তব্য বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এমন কি রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র বিষয়েও আপত্তি করার কোনো কারণ বর্তমান পৃথিবীতে নেই। কিন্তু পণ্ডিতরা দুটি কারণে মার্কসবাদের বক্তব্য বিষয়ে আপত্তি তোলেন। একটি হলো এই যে, রাষ্ট্র সংগঠনটি

রাষ্ট্র ও ব্যক্তিতে বিরোধ নেই

যদিও শোষণকে বজায় রেখেছে তবু রাষ্ট্র একমাত্র শ্রেণী-শোষণের হাতিয়ার, এমন কথা মনে করবার বিশেষ যুক্তি নেই। সংগঠনটিকে নিশ্চয়ই অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু সংগঠনটির নিজস্ব চরিত্র অন্যায়ের নয়। মার্কস্-বাদীরা আপত্তি জানাতে পারেন যে, তবে রাষ্ট্রের প্রয়োজন হলো কেনো? এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে সমাজের শান্তিশৃঙ্খলা, ব্যক্তিদের নিরাপত্তা ও ক্রম-বর্ধিত জনসংখ্যাকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিকল্পনার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রকে ব্যক্তি-স্বার্থ বিরোধী মনে করবার কারণ নেই। রাষ্ট্র নায্যত ব্যবহৃত হলে ব্যক্তির স্বার্থকেই রক্ষা করবে—যেহেতু তার জন্যেই রাষ্ট্রের জন্ম। তাছাড়া রাষ্ট্রের নিঃশেষে বিলুপ্ত হবার কোনো যুক্তি নেই। সমাজে যদি শোষণ না-থাকে, যদি

বস্তু সন্তানের নিয়মেই সমাজ চলে, তবু বর্তমান জনসংখ্যার হিসেবে সমাজে চিরকালই সংগঠনের প্রয়োজন হবে। আমরা রাষ্ট্রকে সেই সংগঠন মনে করতে পারি। কার্যত, রাষ্ট্র তাই ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গল রক্ষণাবেক্ষণ করে ; রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবনে প্রয়োজনীয় একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান।

৯। ভাববাদী বক্তব্য—

ইতিপূর্বেই 'ব্যক্তি ও সমাজ' অধ্যায়ে রাষ্ট্র বিষয়ে ভাববাদী বক্তব্যের দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রধান কয়েকটি সূত্র জানানো হচ্ছে—

রাষ্ট্র বিষয়ে ভাববাদী বক্তব্যের মৌলিক কথাই হলো ব্যক্তি ও রাষ্ট্রে কোনো বিরোধ নেই। ব্যক্তির জীবনে যেমন একমুহূর্তেই পরিণতি আসে না, তাকে ধাপেধাপে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগোতে হয়, তেমনি রাষ্ট্রেরও পরিণতি আছে। ব্যক্তির পরিণতি তার পূর্ণতার বোধে, সুপ্ত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশে, রাষ্ট্রেরও পরিণতি তার মহত্তম রাষ্ট্র চরিত্রে। মহত্তম রাষ্ট্র চরিত্রের প্রকাশ তখনই হবে যখন রাষ্ট্র সঠিকভাবে সমাজের 'সাধারণ সঙ্কল্প'কে জানবে ও তাকে নির্দিষ্ট নৈতিক রূপ দেবে। 'সাধারণ সঙ্কল্পে'র মধ্যেই প্রতিটি ব্যক্তির পূর্ণ-পরিণতির 'প্রকৃত সঙ্কল্প' সুপ্ত থাকে। সুতরাং যদিও সাধারণভাবে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রে বিরোধ আছে মনে হয়, দার্শনিকভাবে সত্যিই কোনো বিরোধ নেই। রাষ্ট্রই একমাত্র 'সাধারণ সঙ্কল্প' জানে সুতরাং রাষ্ট্র ব্যক্তির 'প্রকৃত সঙ্কল্প' জানে। রাষ্ট্র তার পরিণতিতে 'সাধারণ সঙ্কল্পের' ধারক ও বাহক, সুতরাং ব্যক্তি তার পূর্ণতা রাষ্ট্রেই লাভ করে। মনে রাখা দরকার যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তেই তা পরিপূর্ণভাবে জানা যাচ্ছে না। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের এই গভীর সম্পর্কটি থাকছে।

এই বক্তব্য থেকেই মনে হয় রাষ্ট্রের যেন একটি অতি-মানবিক যুক্তির সত্তা আছে। এই সত্তার পরিচয় আমরা বুঝতে পারি সামাজিক মনে। সামাজিক মন অজ্ঞাতে আমাদের প্রভাবান্বিত করে। আমরা যদিও মনে করি যে আমরা স্বাধীন, স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের প্রকাশ করি তবু আমাদের বিভিন্ন কর্ম সহস্র অদৃশ্য বন্ধনে ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। এই ঐতিহ্যই যেনো একটা সত্তা এবং তার মধ্য দিয়েই একটি জাতির বিবেক ও যুক্তি কাজ করে।

ভাববাদী বক্তব্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একভাগে কাণ্টের প্রভাব ও ইংরেজ দার্শনিক গ্রীনের বক্তব্য ও অন্যভাগে হেগেল ও হেগেল

প্রভাবান্বিত ইংরেজ দার্শনিক বোসাঙ্কেট ও ব্র্যাডলী। গ্রীন কাণ্টের প্রভাবে রাষ্ট্রকে 'বাধার বাধা' বলেন ও জানাতে চান যে রাষ্ট্র বাইরে থেকে ব্যক্তির জীবনে কিছু কর্তব্য সম্পাদন করে। ওঁর বক্তব্যে তাই পাই 'সমাজ-প্রদত্ত কতোগুলো ক্ষমতার জন্য ব্যক্তিদের যে দাবি ও অধিকার এবং ব্যক্তিদের ওপর কিছু ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য সমাজের যে অনুরূপ দাবি তা দাঁড়িয়ে আছে এই বক্তব্যের ওপর যে, নৈতিক মানুষ হিসেবে কর্তব্য কর্মকে পূর্ণ করার জন্যে, নিজের এবং অন্যদের পূর্ণ চরিত্রের উদ্বর্তনের জন্যে কার্যকরী আত্ম-নিষ্ঠার প্রয়োজনেই এই ক্ষমতা।' গ্রীনের লক্ষ্যে তাই ব্যক্তি ও রাষ্ট্রে বেশ কিছুটা ফারাক থাকে। কিন্তু হেগেলের মতে রাষ্ট্র ও ব্যক্তি মূলত একই সত্তা, তাদের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন নাম মাত্র। পরিবারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি রাষ্ট্রে এসে তার পূর্ণতা পায়। রাষ্ট্রের বাইরে থেকে তার জন্যে আলাদাভাবে কিছুই করবার থাকে না। সেজন্যেই ব্র্যাডলী ও বোসাঙ্কেট বলেন যে, ব্যক্তি রাষ্ট্রেই তার ব্যক্তিত্ব খুঁজে পায় এবং রাষ্ট্র কখনোই অন্যায় করতে পারে না।

অবশ্য রাষ্ট্রের অপূর্ণতা থাকতে পারে যেমন ব্যক্তিও তার পরিণতিতে বাধা পেতে পারে। তখন একটিমাত্র কর্তব্যই থাকে যে, বাধাগুলো সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে। অর্থাৎ অন্যায়কারী রাষ্ট্র নিঃসন্দেহে অপূর্ণ রাষ্ট্র।

ভাববাদী এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধ্যাপক হবহাউস, লাস্কি, পপার, হাএক প্রমুখরা অনেক প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁদের প্রধান আপত্তি এই যে, ভাববাদীরা প্রথমত সমাজ ও রাষ্ট্রকে এক ভেবেছেন এবং দ্বিতীয়ত ব্যক্তিকে পৃথক, স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে বুঝতে পারেননি।

বহু সংগঠনের একটি রাষ্ট্র

লাস্কি লিখেছেন ভাববাদ রাষ্ট্রের আদর্শ ও বাস্তবের বিরোধ মিটাতে পারেনি ("...the idealist theory of the state has not satisfactorily solved......the essential problem of the relation between the idea and the real.) অধ্যাপক লাস্কি বলতে চেয়েছেন যে, ভাববাদের বক্তব্যে যদিও অনেক ভালো কথা আছে কিন্তু বাস্তব পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তার কোনো প্রমাণ নেই। বরং উল্টোটাই সত্য যে হেগেল স্বয়ং একবার অশ্বারূঢ় নেপোলিঅনে ব্রহ্মের ছবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং আর একবার জর্মন রাষ্ট্রতেই বিশ্বের সর্ব রাষ্ট্রের প্রতিভূকে দেখেছেন। লাস্কি আরো

জানিয়েছেন ভাববাদ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং তার সঙ্কল্পের চরিত্রকে মোটেই বুঝতে পারেনি। অধ্যাপক পপার প্রমুখরা বলেছেন ভাববাদ ব্যক্তির প্রকৃত সত্তার নামে রাষ্ট্রযন্ত্রটি ডিক্টেটরদের হাতে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিচ্ছে।

কিন্তু এই বক্তব্যগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য মোটেই হেগেলের বিরুদ্ধে কার্যকরী নয়। হেগেল কখনোই ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের দাস বা ডিক্টেটরদের দাস হ'তে বলেননি। তিনি শুধু ব্যক্তিদের পরিপূর্ণতার প্রকৃত পরিবেশটির কথা বলেছেন। রাষ্ট্র অপূর্ণ হলে অনৈতিক, সুতরাং তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সম্ভব। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিতে মূলতই কোনো বিরোধ আছে বা রাষ্ট্রকে কেবলমাত্র একটি হাতিয়ার বলে মানতে হবে। লাস্কিদের বক্তব্য যে হেগেল ব্যক্তির লক্ষণ বোঝেননি কথাটিও সঠিক নয়। হেগেল নিশ্চয়ই শূন্যচারী কোনো একক, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তির কথা জানতেন না। কারণ তিনি মানুষকে সমাজবদ্ধ ভাবতেন এবং জানতেন সমাজ ছাড়া মানুষ আদৌ মানুষ হতে পারে না। ব্যক্তির স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে তিনি পরিপূর্ণ মূল্যই দিয়েছেন কিন্তু জানিয়েছেন ব্যক্তিকে তার প্রকৃত সত্তা জানতে হবে। তাছাড়া তার সঙ্কল্পের কোনো অর্থ নেই। ব্যক্তি নিশ্চয়ই যা-খুশি হতে পারে, হেগেল শুধু বলবেন যা-খুশিতে তার মনুষ্যত্বের পরিচয় নেই।

ভাববাদী এরিস্টটেলীয় হেগেলীয় বক্তব্যের বিরুদ্ধে তাই গণতন্ত্রের আপত্তি নিতান্তই প্রসঙ্গহীন।

(গ) গণতান্ত্রিক বক্তব্য—গণতান্ত্রিক বক্তব্যের ভিত্তি ব্যক্তির স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্বে। প্রতিটি ব্যক্তিই এই বক্তব্যে তুল্য মূল্য। আইনের চোখে বা সমাজে, জীবনের কোনো স্তরেই ব্যক্তিদের মূল্যায়নে একজনকে আর একজনের ওপর স্থান দেওয়া হয় না। ব্যক্তির মূল্য তার স্বকীয় কর্মে, বংশ, অর্থ বা সামাজিক প্রতিপত্তির হিসেবে নয়। ব্যক্তির এই স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জানা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক বক্তব্যে রাষ্ট্রকে স্বীকার করা হয়েছে। মার্কসবাদীদের মতো রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার মনে করা হয়নি বা এমন কথাও ভাবা হয়নি মার্কসবাদ বা প্রিন্স ক্রপটকিনের নৈরাজ্যবাদের মতো যে, রাষ্ট্রের প্রয়োজন একদিন সম্পূর্ণ ফুরিয়ে যাবে। গণতান্ত্রিক বক্তব্যের প্রধান আপত্তি ভাববাদের

(ক) স্বাধীন স্বতন্ত্র ব্যক্তি
(খ) সবাই সমান

বিরুদ্ধে, যে বক্তব্যে রাষ্ট্রকে ব্যক্তিসত্তার ধারক ও বাহক বলা হচ্ছে। হেগেল যদিও ভেবেছিলেন 'The State is the spirt that dwells in the world and realizes itself in the world through consciousness ...It is the course of God through the world that constitutes the world.' মিল তাঁর বিরুদ্ধে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে বলেন এমন রাষ্ট্রে সমস্ত ব্যক্তিকে একটিমাত্র ছাঁচে ফেলা হচ্ছে। মিল তার নাম দিয়েছিলেন 'enforced assimilation'।

সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের নির্দেশিত পথে ব্যক্তিদের জীবনযাত্রা তৈরি করতে হবে—এমন একটা বক্তব্যের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদকে লোএস ডিকিন্‌সন তাঁর 'আফটার টু থাউজেণ্ড ইয়াস' গ্রন্থে চমৎকার উপস্থিত করেছেন প্লেটোর সঙ্গে ফিললেথিস নামক এক তরুণের কাল্পনিক কথোপকথনে।

ফিললেথিস—(আপনার) কথা মেনে নিয়েই বলছি যে না-হয় দার্শনিক-রাজাদের হাতে শাসনভার দেওয়া গেলো, না-হয় তাঁরা মঙ্গলকে সঠিকভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে জানেন, তাকে অপাপবিদ্ধ রাখবার জন্যে না-হয় তাঁরা পাহারাদির ব্যবস্থা করলেন, তবু আমি বলবো যে, নিজেদের বা আমার উদ্দেশ্যকেই তাঁরা নষ্ট করলেন। আমি যা তৈরি করতে চাই তা আসলে মূর্তির মতো মানুষ নয়, অন্যদের ভাববার জন্যে চমৎকার আকৃতি যাদের; চাই জ্যান্ত মানুষ যারা অমঙ্গলকে জেনেছে বলেই মঙ্গলকে বেছে নিচ্ছে। যদি এ-কথা তাদের জানতে হয় তবে তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া চলবে না। আপনি যেমন আপনার সৈনিকদের শিক্ষা দিতে চান নিয়ত বিপদের মধ্যে, তেমনি আমি আমার নাগরিকদের তৈরি করতে চাই অমঙ্গলকে সর্বদাই ডেকে।

প্লেটো—তারা যদি অমঙ্গলের কাছে মাথা পেতে দেয়?

ফিল—যদি আপনার সৈন্যরা শত্রুর কাছে মাথা পাতে? তারা মাথা নিচু করবে, এদেরও অনেকেই নিঃসন্দেহে করবে। কেউ কেউ পালাবে, নিজেদের আবার সামলে নেবে। কিন্তু কয়েকজন কখনো হারবে না। মঙ্গলকে সমস্ত সময় পরীক্ষা দিয়ে নেওয়া হবে, স্বাধীন সমাজে যেমন সত্যকে নেওয়া হয়, হারজিতের পদ্ধতিতে।'

এই কথোপকথন থেকে জানা যাচ্ছে যে কারো কোনো নির্দেশ নয়, ব্যক্তিরই নিজের বাঁচামরার কথা। রাষ্ট্রকেও তেমনি হতে হবে অর্থাৎ

রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবনে হস্তক্ষেপ করবে না। অথচ রাষ্ট্র থাকবে। কিন্তু থাকবে কিসের জন্য? লক বলেছিলেন ধনপ্রাণ সম্পত্তি রক্ষার জন্য। মিলও প্রায় সে-কথাই বলেন। এডাম স্মিথ মনে করেছেন রাষ্ট্রের কাজ হবে ত্রিবিধ। ব্যক্তিদের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করা, সামাজিক অত্যাচার ও অন্যায় থেকে রক্ষা করা ও ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় এমন সব কাজ করা। এই আলোচনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে গণতান্ত্রিক তত্ত্বে রাষ্ট্রের কর্ম-পরিধি সংকীর্ণ এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য প্রধানতই নঞর্থক। সক্রিয়ভাবে এবং সদর্থকভাবে রাষ্ট্র বিশেষতই কিছু করবে না, নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছাড়া। রাষ্ট্র বড়ো জোর এমন একটি কাঠামো বা প্রাচীর হবে, যে ব্যক্তিকে আশ্রয় দেবে মাত্র, তার জীবনে অনুপ্রবেশ করবে না। এই তত্ত্বটিকে প্রমাণ করবার জন্যেই চুক্তির বক্তব্য উঠেছে। কারণ, চুক্তি মানলেই বলা যাবে চুক্তি যেহেতু হয় দুই তরফের মধ্যে সেহেতু ব্যক্তিরা গোড়াতেই রাষ্ট্রের কর্তব্য বেঁধে দিতে পারবে। তাদের নির্দেশ মতোই রাষ্ট্র নামক সংগঠনটি চলবে।

রাষ্ট্র হাতিয়ার

কার্যত রাষ্ট্র নিছক একটি হাতিয়ার যার নির্দিষ্ট কর্ম আছে। এই কর্মের বাইরে তার যেমন কোনো প্রয়োজন নেই তেমনি মূল্যও নেই। হাতিয়ারের কাজ এক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে বা নঞর্থক অর্থে ব্যক্তির জীবনকে রক্ষা করা। অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি যেমন আধুনিক বহুত্ববাদী ধারার প্রতিভূ হিসেবে রাষ্ট্রকে অনেক সংগঠনের একটি সংগঠন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। ওঁর মতে 'রাষ্ট্র জনসাধারণের সর্বাধিক মঙ্গল করার সংগঠন। তার কার্যাবলী মানুষের আচরণের ঐক্যসাধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পরীক্ষা অনুযায়ী-ফলাফলের সূত্রে তার সীমার সংকোচন বা প্রসারণ হবে। কাজেই, মানুষের সমগ্র কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্র উদ্ভূত হয়নি। রাষ্ট্র সমাজ-সংস্থার মূল সুর বাজাতে পারে, কিন্তু সমাজের সঙ্গে তা অভিন্ন নয়।' লাস্কি অবশ্য সমাজতন্ত্রবাদের চাপে বহুত্ববাদের মধ্যে এই কথাটুকু ঢুকিয়েছেন যে 'রাষ্ট্র' মূল সুর বাজাতে পারে' এবং এই প্রবাহের সূত্রেই বর্তমান কালে সমাজ কল্যাণকামী রাষ্ট্রের প্রসঙ্গ উঠেছে। একদল পণ্ডিত সমাজতন্ত্রবাদ থেকে অর্থনৈতিক সংস্কার ও প্রগতির পরিকল্পনার অংশটুকু নিয়ে রাষ্ট্রের অবশ্য-স্বীকার্য কার্যাবলীর তালিকা বানিয়েছেন। লাস্কি, কোল প্রমুখ সমাজতন্ত্রবাদী গণতান্ত্রিক পণ্ডিতদের চিন্তায় অর্থনৈতিক শোষণ ও একক

ব্যক্তির অনৈতিক স্বাধীনতার চিন্তা কাজ করায় ওঁরা পরিকল্পনার দ্বারা সমাজিক অনৈক্য ও বিরোধকে দূর করতে চাচ্ছেন। অথচ সমাজতান্ত্রিক সামগ্রিক পরিকল্পনা সত্ত্বেও কিন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পূর্ণ রক্ষা করতে হবে এবং রাষ্ট্রের চরিত্র ভাববাদ বা মার্কসবাদ-সম্মত হতে পারবে না। লাস্কি কোল প্রমুখদের আলোচনায় বোঝা যাচ্ছে বর্তমান কালে গণতান্ত্রিক চিন্তায় একটা মস্তো বড়ো পরিবর্তন ঘটে গেছে। প্রাচীন গণতান্ত্রিক বক্তব্যে পাই, রাষ্ট্র থাকবে কিন্তু রাষ্ট্রের কাজ পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ থাকবে ব্যক্তির বিচারবুদ্ধি, বিবেচনা ও কর্ম। যেমন বলেন গ্রীণ। উপযোগিতাবাদী জেরেমি বেণ্টাম, জেমস মিল ও জন স্টুঅর্ট মিলের তত্ত্বে যেমন তিনটি প্রধান কথা ছিলো; লেসেফেয়ার, গণতন্ত্র ও শিক্ষা। 'লেসেফেয়ার' অর্থাৎ রাষ্ট্র ও ব্যক্তি পৃথক, রাষ্ট্র ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবে না, অর্থনীতি চলবে স্বাধীন ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কে এবং শিক্ষার মারফৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিপুষ্ট হবে। লেসেফেয়ারের অর্থনীতি ও রাজনীতির প্রধান প্রস্তাব আছে কবডেনে। ওঁর মতে অবাধ বাণিজ্যে গণতন্ত্র ও সভ্যতার মুক্তি। কবডেন লিখেছেন,

'Commerce is the grand panacea, which is like a beneficent medical discovery, will serve to inoculate with the healthy and saving taste for civilization all the nations of the world. Not a bale of merchandise leaves our shores, but it bears the seeds of intelligence and fruitful thought to the members of some less intelligent community; not a merchant visits our seats of manufacturing industry but he returns to his own country the missionary of freedom, peace and good government—'

কবডেনের এই উচ্ছ্বাসে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে যেমন মানা হয়েছে, তেমনি মনে করা হয়েছে অবাধ বাণিজ্যে গণতন্ত্রই পুষ্ট হবে কারণ নিয়ন্ত্রণহীন হলেই সমাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল।

সরকারের কাজ ন্যূনতম

জেফার্সনের মতে গণতান্ত্রিক বক্তব্যের দুটো দিক। সরকার গণতান্ত্রিক হবে (মিল যেমন প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের কথা ভেবেছেন), সরকারের কাজ হবে ন্যূনতম। এই বক্তব্যের নীতিতেই মার্কিন 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' তৈরি হয়। তাতে পাই,

'We hold these truths to be self-evident : that all men are created equal ; that they are endowed by their creator with certain inalienable rights ; that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness ; that to secure these rights governments are instituted among men, deriving their just, powers from the consent of the governed ; that whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or abolish it.

জেফার্সনের ঘোষণা ও কবডেনের আশা সত্ত্বেও যখন অর্থনীতিতে শোষণ ও রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ঘটে তখন গণতন্ত্রের দ্বিতীয় ধারাটি পাই আর তখন লাস্কিরা রাষ্ট্রকে প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন।

অধ্যাপক লাস্কি ও কোলের প্রতিপাদ্যের বিরুদ্ধে অত্যাধুনিক পণ্ডিত **কার্ল পপার** জানান যে সামগ্রিক পরিকল্পনা করা অসম্ভব এবং সামগ্রিক পরিকল্পনার নামে রাষ্ট্র সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে। যেমন দেখা গেছে সাম্যবাদী ও ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্রে। পপার তাই নতুন করে আবার মিলদের বক্তব্যে ফিরতে চান যে রাষ্ট্র যতোদূর সম্ভব নিষ্ক্রিয় থাকবে এবং তার প্রধান কাজই হবে পরোক্ষ। সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্র কাজ করতে চাইলেই ব্যক্তির জীবনে তার অধিকারের সীমা সম্প্রসারিত হবে।

গণতান্ত্রিক বক্তব্যে তাই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সত্ত্বেও রাষ্ট্রের ভূমিকা গৌণ। জেফার্সনের নির্দেশ মতো যা থেকেও নেই।

অনুশীলনী

1. Define state and critically examine the different theories relating to its nature.

2. Which, according to you, should be the proper theory regarding the nature and activity of the state ?

3. Does the idealist theory necessarily lead to totalitarianism ?

4. Critically examine the statement 'state is the epitome of force'.

5. Is the state an organism ? How far can the analogy of living organism go ?

6. Discuss the nature of relation between state and morality.

7. Write a short critical essay on the nature and activity of the state.

নবম অধ্যায়

শিক্ষা ও সংগঠন

১। শিক্ষা ও শিক্ষার তাৎপর্য (Education & Significance of Education):

আমরা দেখেছি সমাজ হচ্ছে মানুষের রীতিবদ্ধ জীবনযাত্রা। রীতিবদ্ধতা বিভিন্ন সংগঠনে প্রকাশ পায়। সমাজ ও সমাজে রীতিবদ্ধতার প্রয়োজন হয় মানুষের মতো বাঁচার জন্যে। প্রথমত বেঁচে থাকাটাই প্রধান, তারপর প্রয়োজন মানুষের মতো বাঁচার। সমাজ মানুষকে বাঁচার উপকরণ ও পরিবেশ দেয় আর পরিবার সামাজিক মন ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করে। কিন্তু কেমন করে করে? পরিবারের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি একমাত্র মানুষই প্রাণী-জগতে প্রাচীন সংস্কার ও সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে পরবর্তী যুগের জন্য জমা রাখতে পারে এবং বংশধরদের মধ্যে সেই জ্ঞানকে চালিয়ে দিতে পারে। জ্ঞানকে চালিয়ে দিতে পারার ক্ষমতা কিছুটা জৈবিক কার্যকরণের অধীন। বংশধারার মর্গানকৃত নিয়মে জানা গেছে যে, একটি বংশের দোষগুণ বংশধরদের মধ্যে প্রকাশ পায়। কিন্তু এই বংশপরম্পরাগত দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা মানুষ ও তার সমাজকে পুরো বোঝা যায় না, বা এমন কি বোঝা যায় না সমাজের প্রকৃত তাৎপর্য কি। তখন একটু নজর করলেই জানা যায় মনুষ্য সমাজের সঙ্গে নিম্নতর প্রাণী জগতের গুণগত পার্থক্য ঘটে সচেতনতা ও সচেতনতা-জাত জ্ঞানের প্রসারে। ইঁদুর ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষার উদাহরণে বলা হয়েছে ইঁদুরেরা অর্জিত বোধ ও জ্ঞানকে উত্তর পুরুষে ছড়াতে পারে না, শুধু মাত্র নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ইঁদুরটি বা ইঁদুরদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে। অথচ মানুষ তা পারে। পারে এইজন্যে যে মানুষ তার অর্জিত জ্ঞানকে সচেতনভাবে মনে রাখে, ব্যাখ্যা করে এবং প্রয়োজন মতো ব্যবহার করে। এই সচেতন প্রয়াসের জোরেই জ্ঞাতসারে বংশধরদের মধ্যে সঞ্চিত বিদ্যাকে ছড়াতে পারে। এই সচেতন প্রয়াসকেই বলা হয় শিক্ষা। পূর্বপুরুষ সচেতনভাবে বংশধরদের পরিবারের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করে। শিক্ষা পেয়েই পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তীর ধ্যানধারণা ও সংস্কারকে নিজেদের তৎকালীন

বাঁচা ও মানুষের মতো বাঁচা

অবস্থার ব্যবহার করে। শিক্ষার কারণেই পরিবারে পরিবারে সংযোগ হয় এবং সমাজের জ্ঞানভাণ্ডারকে মানুষ যে-কোনো কালেই ব্যবহার করে। শিক্ষার প্রমাণ মানুষ রাখে তাদের হাতের কাজে, হাতিয়ার ও শিল্পে, লিখিত কাহিনীতে, ছড়ায়, গানে, পুরাণ ও রূপকথায়। পরিবারে জন্মে তাই প্রতিটি মানবশিশু কমবেশি এই সঞ্চিত উপকরণের সাহায্য পায়, তার নিজের সাধ্য ও সম্ভাবনা মতো এই জগতকে নিজের জীবনে ব্যবহার করে। শিক্ষা তাই মূলতই সমাজ বিবর্তনের কারণ ও সমাজ-সত্তার কেন্দ্র।

সভ্যতার চরিত্র ও বিবর্তন বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিকরা চিন্তিত থেকে অনেকেই বলতে চেয়েছেন যে, সমাজ বদলায় অন্য সমাজের সাহচর্যে, বিরোধ বা সংযোগে। আবার একটি সমাজের মধ্যেই জ্ঞানের ও চরিত্রের পরম্পরা তৈরি হয় অনুকৃতি (imitation) দ্বারা। অনুকৃতির অর্থ এই যে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় ও স্থিতিশীল ব্যবহারাদিকে মানুষ যুগে যুগে অনুকরণের মধ্যে অব্যাহত রাখে। তারা অবশ্য নতুন সংযোজনও করে। এই সংযোজনটি ঘটে শিক্ষার মধ্যে প্রাচীন ঐতিহ্যকে ব্যবহার ও প্রয়োগ করার কারণে। ডারউইন অভিযোজন (adaptation) প্রক্রিয়ায় বুঝিয়েছিলেন বংশধারা ; পিতৃপুরুষের চাইতে কিছুটা বদলায় ; কারণ কিছু তারা সংস্কার হিসেবে নিয়ে আসে তাদের কাছ থেকে আর বাকিটুকু তৈরি হয় পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টায়। জৈব নিয়মের বাইরে একই প্রক্রিয়া প্রায় কার্যকরী। প্রত্যেক যুগই তার পূর্বার্জিত জ্ঞানকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে চায় এবং প্রয়োজনে অদলবদলও করে। প্রাচীনকে অনুকৃতিতে স্বীকৃতিও যেমন শিক্ষা, তেমনি পরিবর্তনের চেষ্টাও শিক্ষা। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে সমাজ রক্ষা করে শিক্ষা এবং শিক্ষাই অতীত ও বর্তমানের সেতু, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রেরণা। দার্শনিক ডেভিড হিউম তাই চমৎকার লিখেছেন,

সভ্যতা ও অনুকৃতি

'Whatever it be the forms of manners of one generation, the next must imbibe a deeper tincture of the same dye; men being more susceptible of all impressions during infancy, and retaining these impressions as long as they remain in the world.'

হিউম আমাদের বক্তব্যকেই সমর্থন করেন এই বলে যে, শৈশবে মানুষ অনেক বেশি ছাপ ধারণ করতে পারে এবং এই ছাপটি সে সারা জীবন রক্ষা করে বলেই সমাজ টিকে থাকে। এই ছাপ মনে দাগ কাটে শিক্ষার মধ্য দিয়ে।

শিক্ষার তাৎপর্য বিষয়ে তাই প্রথম কথাই হলো শিক্ষায় সমাজের স্থিতি এবং শিক্ষাতেই মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে 'মানুষ' হয়ে ওঠে। সমাজরক্ষা ও মনুষ্যত্বের পর আমরা জানি মানুষ এক এক সমাজে এক এক সংস্কৃতির পরিমণ্ডল তৈরি করে বাঁচে। শিক্ষা এই সংস্কৃতির পরিমণ্ডলকে রক্ষা করে, পুষ্টি দেয় ও নিয়ত সম্প্রসারণে জীবনের মূল লক্ষ্যকে প্রমাণ করে। গ্রীসের উদাহরণ দিয়ে হিউম এই কথাটাকেই প্রকাশ করেন।

শিক্ষা চরিত্র গড়ে, সংস্কৃতির অর্থ জানায়

গ্রীস ছোট্ট দেশ, তার বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে গভীর যোগাযোগ, তবু এক-একটি অংশে সংস্কৃতির এক এক চেহারা। তারা পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করেছে কিন্তু নিজেদের সত্তা বা জাতীয় চরিত্র হারায়নি। আমাদের বক্তব্য মতো বিভিন্ন প্রভাব নতুন সংযোজন, আর 'সত্তা' বা 'জাতীয় চরিত্র' নিজস্ব মনের প্রকাশ। এই দুটিব মিলনেই একটি সভ্যতার স্থিতি ও বৃদ্ধি। স্থিতি ও বৃদ্ধি উভয়তই শিক্ষার দান। এবং মনে রাখতে হবে শিক্ষা সচেতনভাবে নিজেদের সত্তা রক্ষার একটি প্রয়াস মাত্র। হিউম লিখেছেন,

'Greece was a cluster of little principalities, which soon became republic and being united both by their near neighbourhood, and by the ties of the same language and interest, they entered into the closest intercourse of commerce and learning.......Each city produced its several artists and philosophers, who refused to yield the preference to those of the neighbouring republics ; their contention and debates sharpened the wits of men ; a variety of objects was presented to the judgment, which each challenged the preference to the rest ; and the sciences, not being dwarfed by the restraints of authority, were enabled to make such considerable shoots as are even at this time the objects of our admiration.'

হিউম স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, এক একটি রাষ্ট্রের শিল্পী ও দার্শনিকরা পাশের রাষ্ট্রের শিল্পী ও দার্শনিকদের বিতর্ক শুনেছেন, নিজেরা বিতর্ক

করেছেন। তাতে তাদের চিন্তার নতুন খোরাক এসেছে, তাদের বিষয়-বুদ্ধি জাগ্রত ও তীক্ষ্ণ হয়েছে কিন্তু কখনোই তারা নিজেদের চরিত্র থেকে ভ্রষ্ট হননি।

হিউমের আলোচনা থেকে আরো একটা প্রতিপাদ্য তৈরি হলো যে শিক্ষা আমাদের চরিত্র রক্ষা করে, আমাকে বিশ্বাসের ভিত্তি দেয়। শিক্ষায় সংস্কৃতি ও জীবনের লক্ষ্য থেকে অধ্যয়ন ও নিদিধ্যাসনে নিজেদের অন্তর্নিহিত সত্তাকে প্রকাশ করতে হয়। শিক্ষায়, যদি সত্তার নিজস্ব আকর তৈরি না-হতো তবে আমরা হতাম জলের মতো। যখন যে পাত্রে ঢালা হতো সেই পাত্রেরই রূপ নিতাম। কিন্তু শিক্ষা চরিত্রকে জলের রূপ থেকে ধাতুর রূপ দেয়। অর্থাৎ এমন একটি নির্দিষ্টতা আনে যাতে একমাত্র নিজস্ব সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হয়।

শিক্ষা, যেহেতু আমরা জানতে পেরেছি, জাতীয় সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করে, সঙ্গে সঙ্গেই মনে রাখতে হবে প্রত্যেক শিক্ষাই তেমনি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে গড়ে, সংস্কৃতির চাপেই তার গড়নটা তৈরি হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক সংস্কৃতিই তার ব্যক্তিদের কাছ থেকে বিশেষ একটি সাড়া দেবার ক্ষমতাকে খোঁজে, যা একমাত্র তার স্বকীয় বক্তব্যে রূপ পায়। প্রত্যেক সংস্কৃতির মানুষের জীবন ও বিশ্বজগৎ বিষয়ে বক্তব্য থাকে। এই বক্তব্যটিই ব্যক্তিদের সামনে তাদের জীবনের লক্ষ্য। জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে প্রতিটি লোকই কমবেশি সেই বক্তব্যকে জীবনে প্রকাশ করে। কার্যত তাই সংস্কৃতিই ব্যক্তিকে মূর্তি দেয় এবং ব্যক্তিরা স্ব স্ব কর্মে নিজের প্রত্যয় ও বোধ অনুযায়ী সংস্কৃতির চরিত্রকে প্রকাশ করে। গ্রীক সভ্যতায় যেমন জীবন সম্পর্কে দুটি প্রধান কথা বলা হতো। একটি 'কলোকোগোথিয়া' ও অন্যটি 'এরেটে'। কর্ম ও চিন্তার সাযুজ্যকে 'কোলোকোগোথিয়া' শব্দে প্রকাশ করে গ্রীকরা বোঝাতে চেয়েছেন যে জীবনের লক্ষ্যই হবে 'রূপময় শুদ্ধতা'। জীবনে শুদ্ধতা বা মঙ্গলকে প্রকাশ করতে হয় এবং সেই শুদ্ধতার মূর্তি হবে সুন্দর। অপূর্ণকেই তাঁরা অসুন্দর মনে করতেন। প্লেটো ও এরিস্টটলে তার দার্শনিক প্রস্তাবনা পাওয়া যায়। 'এরেটে' শব্দের অর্থ পরিপূর্ণতা অর্থাৎ শরীরে ও মনে পূর্ণতাই ছিলো গ্রীকদের কল্পনা ও লক্ষ্য। এজন্যে শিক্ষায় তাদের বিশিষ্ট প্রয়াসটিকে রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে। একদিকে শারীরিক চর্চা ও অন্ত-

শিক্ষা সংস্কৃতি নির্ভর

দিকে মনের চর্চা। উভয়তই যখন ব্যক্তি পূর্ণতা পায় তখনই সে সার্থক মানুষ। আর ভারতবর্ষের প্রধান বক্তব্য ছিলো আত্মজ্ঞান লাভ করা। আত্মজ্ঞানকে ভারতীয়রা কখনোই পরজগতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন নি। তাঁরা বলতেন জীবনের প্রতিটি স্তরে মনুষ্যত্বের পরীক্ষা দেওয়াই কাজ। পরীক্ষায় নির্মোহ হয়ে তবে সিদ্ধ হতে হয়। সিদ্ধিলাভের পথে প্রতিটি পর্বে নিজের নিজের কর্তব্য করতে হয়, বাদ দিয়ে বা পেরিয়ে গিয়ে জীবনের হাত এড়াবার উপায় নেই। শুধুমাত্র পরজগতের কথা নয়, ইহা জগতেও প্রতদিন নির্দিষ্ট কর্ম থাকে। পুরো সেই কর্তব্য পালন না-করলে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হবে—গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সেকথাই বোঝান।

শিক্ষার উদ্দেশ্য (The Aims of Education):

বিভিন্নকালে বিভিন্ন মনীষী শিক্ষার উদ্দেশ্য বিষয়ে নানা মত দিয়েছেন। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি তার 'আউটলাইনস অব সোসাল ফিলসফি' গ্রন্থে বলেন যে শিক্ষাকে বৃহত্তর ও সংকীর্ণ দুই অর্থে গ্রহণ করা যায়। বৃহত্তর অর্থে শিক্ষা ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির চর্চা। তিনি বলেছেন শিক্ষার প্রক্রিয়া একটি প্রবাহিত ধারার মতো। সমস্ত জীবন ব্যেপে শিক্ষার প্রবাহ চলে। এই প্রবাহে ব্যক্তি তার ক্ষমতা ও অধিকার অনুযায়ী জীবনের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং সেই অভিজ্ঞতার আলোকে নিজের কল্পনা ও শক্তিকে রূপ দেয়। আসলে শিক্ষা ব্যক্তিকে জগত বিষয়ে সচেতন করে তোলে এবং সেই সচেতনতার মান অনুযায়ী সে নিজের স্থান ও কর্তব্য বেছে নেয়। এই বক্তব্যে কোনো নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ নেই যা শিখিয়ে দিলেই ব্যক্তির পরিপূর্ণতা তৈরি হয়ে গেলো। কোনো নিদিষ্ট পাঠ বা কার্যক্রমের সঙ্গেই তার নিদিষ্ট কোন যোগ নেই। ব্যক্তি কেবল নিজের আত্মপ্রকাশের অনুকূল সর্তগুলোকে জীবন থেকে, প্রবহমাণ ধারা থেকে সংগ্রহ করে। ওঁর ভাষায় তাই পাচ্ছি 'It means, in this sense, the general process by which personality is devoloped and by which persons are enabled to realize their relations to one another and to the universe in which they live.'

ওঁর মতে সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার অর্থ ব্যক্তির ক্ষমতাকে বিকশিত করবার জন্যে সচেতন অনুশীলনীয় ব্যবস্থা। এই বক্তব্যে নির্দিষ্ট খাতে

শিক্ষাকে চালাবার কথা থাকছে এবং তা সচেতনভাবে পরিচালিত করতে হবে। ব্যক্তিদের ক্ষমতা ও শক্তিকে মানা হচ্ছে কিন্তু সেই অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে সমাজ সচেতনভাবে একটি নির্দিষ্ট রূপ দেবে। ওঁর ভাষায় 'In a narrow sense, it may be taken to mean any consciously directed effort to develop and cultivate our powers.' বৃহত্তর অর্থে সচেতন প্রয়োগ নেই, আর সংকীর্ণ অর্থে যে কোনো সচেতন প্রয়াসই শিক্ষা। প্রথমটির ক্ষেত্রে ব্যক্তি শৈশব থেকে যেমনভাবে নিজে পাঠ গ্রহণ করে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে কোনো বিশেষ একটি ছাঁচে আনা হচ্ছে। দুটোই শিক্ষা, কিন্তু দুটোর মধ্যে মৌলিক ফারাক থাকছে।

ব্যক্তির ক্ষমতার বিকাশ

য়ুরোপে প্রাচীন মনীষীদের মধ্যে প্লেটো শিক্ষা বিষয়ে সবচেয়ে বেশী চিন্তা করেছেন। তাঁর চিন্তার পেছনে একটি আদর্শ রাষ্ট্র, সমাজ ও জীবন-যাত্রার কল্পনা ছিলো। তিনি মনে করেছিলেন সমগ্র সমাজের কল্পনার লক্ষ্যেই ব্যক্তির পরিণতি গড়ে। সুতরাং ব্যক্তিকে এমন পাঠ দিতে হবে যা তাকে সমাজের পরিচালক তৈরি করতে পারে, যাতে নিজের মধ্যে সে সমাজের সমগ্র পরিকল্পনাকে মূর্ত করতে পারে। প্লেটো তাই শিক্ষাকে দুটো স্তরে ভাগ করেছিলেন। প্রথম স্তরের শিক্ষা প্রতিটি নাগরিক বা ব্যক্তির জন্যে। এই স্তরের শিক্ষায় নাগরিকরা সমাজ ও সমাজ-বিধৃত জীবনযাত্রার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠ্‌বে এবং সতর্কভাবে নিজেদের ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব নেবে। প্লেটোর ভাষায় প্রথম স্তরের শিক্ষায় শিক্ষিত নাগরিকরা সমাজ-মনের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে চলবে। সমাজ যা সমর্থন করবে তাকে তারাও সমর্থন করবে; সমাজ যা বর্জন করবে তা তারাও বর্জন করবে।

দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা 'পরিচালকদের' (Guardians) জন্য। পরিচালকরা হলেন সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ও বিবেচক। তাঁদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তাঁরা মিথ্যা থেকে সত্যকে চিনতে পারেন। সত্যকে জানতে পারলেই তাঁরা 'ন্যায়' (Justice) ও 'শ্রেয়' (Good) কে বুঝতে পারবেন। তখন তাঁরা এই দুটি মহত্তম সত্যের পথে সমগ্র সমাজকে চালাতে পারবেন। তাঁরা হবেন স্থিতধী ও সত্যসন্ধ। তাঁরা শুধু যে সমাজকে চালাবেন তাই নয়, তাঁরা ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের স্বরূপ জেনে সচেতন নিষ্ঠায় বিবেকের পথে এগোবেন।

দার্শনিক জন লক অন্য একটি আদর্শ প্রচার করলেন শিক্ষার উদ্দেশ্য বিষয়ে। ওঁর মতে 'মানসিক সংযম' (Mental discipline) হলো শিক্ষার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। শিক্ষার লক্ষ্য হবে সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন। কঠোর দেহচর্চা আহার বিহারের নিয়ন্ত্রণে শরীর মনকে এমন একটা সংযমের স্তরে আনতে হবে যে চিত্তবৃত্তিসমূহ অবদমিত ও শৃঙ্খলিত হবে। ফলে জীবনে নৈতিক শৃঙ্খলা আসবে। লক মনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, বিশিষ্ট কয়েকটি মানসিক বৃত্তির সংযোগ (association) মনে করতেন। ওঁর দর্শনে মনের কোনো সক্রিয় ভূমিকা ছিলো না। সুতরাং মনকে অনেকটা স্পার্টার নজীরে গড়ে তোলাই ওর লক্ষ্য ; কিন্তু লক জানতেন না মনকে কেবলমাত্র বাইরে থেকে শৃঙ্খল পরালেই সংযমের পরাকাষ্ঠা হয় না। মনের নিজস্ব নিয়ম আছে এবং তা কখনো কখনো বিদ্রোহ করে। অনুষঙ্গের মনস্তত্ত্বে লক শিশুর মন বা ব্যক্তিকে যন্ত্রবৎ ভেবে শিক্ষাকে কেবলমাত্র বন্ধনের মতো ব্যবহার করলেন।

লক : শিক্ষা মানসিক সংযম তৈরি করে

লকের তত্ত্বের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিদ্রোহ করেন রুশো। তিনি জানালেন শিশুর মনকে উপেক্ষা করলে চলবে না। বাইরে থেকে তার মনের ওপর কৃত্রিম বোঝা চাপালেই তাকে শিক্ষা বলে না। প্রকৃতির মধ্যে সমস্ত রকম কৃত্রিমতা বর্জন করে শিশুকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে বড়ো হতে দিতে হবে। শিশুর শিক্ষা গড়বে তার নিজের নিয়মে।

রুশোর বক্তব্যেই আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের জন্ম। রুশোর উত্তরসাধক মণ্টেসরী জানালেন শিশু স্বয়ং ঈশ্বরতুল্য। শৈশবে তার মনে এমন একটা সচেতনতা কাজ করে যা স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ না পেলে সম্পূর্ণ মরে যায়। শিশুকে ঈশ্বরের মতোই গ্রহণ করতে হবে এবং তাকে কাদামাটি মনে করে কোনো নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলা চলবে না। তাকে সম্পূর্ণ সুযোগ ও স্বাধীনতা দিতে হবে। সে নিজের মতো তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে প্রকাশ করবে। পরিণত বয়স্করা শুধু দেখবে—যেনো তার সত্তা কোনো বাধার দ্বারা আক্রান্ত না হয়।

পেস্টালৎজি শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের ওপর দাঁড় করাতে চাইলেন। বীজ থেকে বৃক্ষের উৎপত্তির সঙ্গে শিশুর শিক্ষাকে তুলনা করে তিনি ঘোষণা করলেন শিশুর সহজাত শক্তি ও সম্ভাবনার সামগ্রিক আত্ম-প্রকাশই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য। হার্বার্ট জানালেন চরিত্র গঠনই শিক্ষার

চরম আদর্শ। অন্তর্নিহিত স্বাধীনতা, দক্ষতা বা পরিণতি, সদিচ্ছা, ন্যায়-পরায়ণতা ও সাম্য এই পঞ্চশীলকেই তিনি চরিত্রের আদর্শ বলে ঘোষণা করলেন। কর্মের মধ্যে এই গুণাবলীকে অর্জন করতে পারলেই চরিত্রের বিকাশ সম্ভব। কর্ম-প্রেরণা জন্মায় সুস্পষ্ট ধারণা ও সহানুভূতি থেকে। ইন্দ্রিয়জ্ঞান তাকে ধারণা দেয় এবং সামাজিক মেলামেশা থেকে সে সহানুভূতির পরিচয় পায়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুমনের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে ধারণা সৃষ্টি করা ও শিশুর চরিত্র গঠন করা। আর ফ্রোএবেল ঘোষণা করলেন স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনশীল কর্মকে আশ্রয় করেই শিশুর আত্মবিকাশ। এই কর্মপ্রবণতার মাধ্যমে অন্তরে সুপ্ত পরমাত্মার উপলব্ধি ও বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে মহাস্রষ্টাকে অনুভব করতে শেখাই শিক্ষার পরম লক্ষ্য।

বর্তমানে অনেক দার্শনিক শিক্ষাকে সংকীর্ণ অর্থেই গ্রহণ করতে চাচ্ছেন। তাঁদের মতে প্রত্যেক দেশেই ন্যূনতম কয়েকটি কর্তব্য আছে শিক্ষা বিষয়ে। এই আদর্শের মধ্যে কয়েকটি সাধারন কর্তব্য নির্দেশ করেই তাঁরা শিক্ষার লক্ষ্যকে ব্যাখ্যা করেন। যেমন অধ্যাপক জোড বলেছেন শিক্ষার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য। (ক) নরনারীকে জীবিকা অর্জনের জন্য উপযুক্ত করে তোলা, (খ) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তোলা ও (গ) তাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করে সৎ জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত করা। ঠিক এই বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠন কমিশনের বক্তব্যে। কমিশন শিক্ষার সাতটি লক্ষ্য ঘোষণা করেছেন। (ক) স্বাস্থ্য, (খ) আধুনিক জীবনযাত্রার জন্য অপরিহার্য বিষয়সমূহের ওপর পূর্ণ অধিকার অর্জন, (গ) পারিবারিক জীবন-যাপনের যোগ্যতা, (ঘ) নাগরিক কর্তব্যের শিক্ষা, (ঙ) বৃত্তি শিক্ষা, (চ) অবকাশ যাপনের শিক্ষা ও (ছ) গণতান্ত্রিক জীবন-দর্শনে আস্থাশীল নৈতিক চরিত্র গঠন।

শিক্ষার কর্তব্য মার্কিন বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য

এই তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে বর্তমান কালে প্লেটোর বক্তব্য আর পণ্ডিতরা স্বীকার করছেন না। তাঁরা ক্রমশই শিক্ষার ব্যবহারিক ও প্রয়োগসিদ্ধ উদ্দেশ্যর দিকে ঝুঁকছেন। যেমন অধ্যাপক ডিউঈ প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষার কথা বলে অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে সমাজ ও জীবনকে ব্যাখ্যা করছেন। এই সব পণ্ডিতদের চেতনায় ব্যক্তি ও সমাজ কেবলমাত্র

আদান-প্রদানের প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ। আদান-প্রদানটুকু আবার হিসেব করা হয় প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ছকে, অর্থাৎ শিক্ষা কেবলমাত্র ব্যবহারিক (Instrumental) হবে, ব্যক্তিও সমাজের আশু প্রয়োজনটুকু মিটিয়েই ক্ষান্ত হবে। বর্তমান সমাজে ব্যক্তিকে এতোই ক্ষুদ্র অর্থে ধরা হচ্ছে যে, তার প্রয়োজনের জগৎ বড়োজোর প্রতিষ্ঠা ও রাজনৈতিক অর্থে নাগরিকের কর্তব্য। সীমা অনেক সম্প্রসারিত করলে বড়োজোর বলা হবে গণতান্ত্রিক আদর্শই লক্ষ্য। কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজের সামনে সেই আদর্শের কোন বৃহৎ কল্পনা রাখা হচ্ছেনা যা ব্যক্তির আশু প্রয়োজন মিটিয়ে বিশ্ব-প্রপঞ্চের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা তুলবে।

সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য বিষয়ে আমরা প্রাচীন ভারতীয় বা গ্রীক আদর্শের ওপর দাঁড়াবো। কারণ শিক্ষা মূলতঃই সংস্কৃতির প্রবহমাণ ধারায় ব্যক্তির অনন্ত সম্ভাবনার পথ খোলার ব্যবস্থা। অনন্ত সম্ভাবনাকে রূপ দেওয়া হয় কল্পনায় ঈশ্বরের আদর্শে অর্থাৎ ব্যক্তি আত্মজ্ঞানে ঈশ্বর হতে পারে। আত্মজ্ঞান ও ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানে কোনো বিরোধ নেই। এই কারণেই সক্রাটেস নিজেকে জানবার কথা বলেন এবং ভারতীয় শাস্ত্রে আত্ম ও ব্রহ্মে অভেদ কল্পনা করা হয়। এই বক্তব্য থেকে মনে করবার কোনো কারণ নেই যে, জগৎ সংসারকে অস্বীকার করা হচ্ছে। ব্যক্তি স্থান কালের মধ্যেই নির্দিষ্ট সমাজে তার অন্তরে তাকাবে এবং প্রেমে মমতায় সবার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ঐক্য উপলব্ধি করে নিজেই বাসনামুক্ত পুরুষ হয়ে উঠ্‌বে।

আধুনিক পণ্ডিত জি, ডি, এইচ কোল শিক্ষার লক্ষ্য বিষয়ে তাই চমৎকার বলেন The educational system which we attempt to set up must depend on the kind of society we mean to live in, on the qualities in men and women on which we set the highest value, and on the estimates which we make of the educability both of those who are endowed with the higher intellectual or aesthetic capacities and of ordinary people'. দেখা যাচ্ছে অধ্যাপক কোল প্রায় প্লেটোর মতো বলছেন যে সমাজ ও শিক্ষা নির্ভর করে আমাদের কল্পনার ওপর। এই কল্পনা প্রতিফলিত হয় দুই স্তরে। যাদের আমরা শ্রেষ্ঠ নরনারী মনে করি (প্লেটোর পরিচালক) ও যারা জনসাধারণ। দুই স্তরেই সমগ্র সমাজ ও জীবনের কল্পনা থেকেই শিক্ষার লক্ষ্যের কথা ওঠে।

অধ্যাপক হ্বাইটহেড সবচেয়ে স্বচ্ছ এবং স্পষ্টভাবে শিক্ষার আদর্শের কথা জানিয়েছেন। প্রথমেই তিনি বলেন যে, খবরাখবর রাখে এমন ব্যক্তিকে শিক্ষিত লোক বলা চলে না। ওঁর মতে 'A merely well informed man is the most useless bore on God's earth'.

শিক্ষা সংবাদ সংগ্রহ নয়

হ্বাইটহেডের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে এমন লোক তৈরি করা—যাঁরা একাধারে সংস্কৃতিবান ও বিশেষজ্ঞ। আত্মোন্নতিই জীবনের লক্ষ্য, শিক্ষা তার পথ প্রস্তুত করে। একটি শিশু বর্তমানে কী বা কী তার সম্ভাবনা এটাই বড়ো কথা নয়, সে কী হচ্ছে তা-ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, হয়ে ওঠাতেই জীবনের পরিচয়, পরিণতির প্রতিটি ধাপেই ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা। শিক্ষা পরিণতির বোধ তৈরি করে ও দিনে দিনে তাকে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। সংস্কৃতি ও মনুষ্যত্বের বাধা হলো স্থাণু অচল ধারণাদি ; হ্বাইটহেড যাকে বলেন 'inert ideas'। এই স্থাণু অচল ভাবধারাগুলো জীবনের উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে থাকে। কল্পনা ও জ্ঞানের সমবায়ে জীবনের প্রতিটি অগ্রগামী পদক্ষেপকে পেছুটানে আটকে রাখে। তাই মানব সভ্যতায় যতোবার বৈপ্লবিক ধাপ দেখতে পাওয়া যায় ততোবারই আমরা জানি এইসব মৃত স্থানু সংস্কার ও ধারণার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জানানো হয়েছে। প্রতিটি নতুন সভ্যতা তার ভিত্তি স্থাপন করে পুরোনোর শিকড় উপড়ে কারণ জগৎ ও জীবন বিষয়ক তার বক্তব্য আনকোরা নতুন। পুরোনোর ভাঙাচোরা জীর্ণ বনিয়াদে নতুনের স্থিতি সম্ভব নয়। অবশ্য এ-কথাও সত্য যে পুরোনো সভ্যতার প্রাণবান ধারা নতুনের উৎস ; নতুন সংস্কৃতিকে সে পুষ্ট করে। নতুন সভ্যতা কেবল তাই ত্যাগ করে যা তার পক্ষে বোঝা ও বাধা, যা নিঃশেষে মুছতে পারলেই তবে অগ্রগমন সম্ভব।

শিক্ষার মূল্য তাই জীবনের পরিচালনা। জীবনের পরিচালনা বলতে বুঝতে হবে প্রতিটি সচেতন ও স্বাধীন ব্যক্তির স্বকীয় পরিণতির পথ খুঁজে বের করা। এই পরিণতির সম্ভাবনাই সেই ব্যক্তিটি নিজে। সে যতোটুকু হয়ে উঠতে পারে ততোটুকুই তার সম্ভাবনার প্রকাশ ও সিদ্ধি। পরিণতির লক্ষ্য ও পদ্ধতি যদিও ব্যক্তিগত, অধ্যাপক হ্বাইটহেড জানেন, সংস্কৃতির বৃহত্তর পরিমণ্ডল ও কল্পনা তাকে নির্দিষ্টতা দেয়। প্রবহমাণ সংস্কৃতির সত্য ব্যক্তির আদর্শকে সঞ্জীবিত করে আর সে সেই

আদর্শের ওপর নিজের কর্ম ও কল্পনায় নতুন চরিত্র সংযোজন করে।

শিক্ষা হল জীবনের পরিচালনা

সম্পর্কটা তাই সংযোগ ও বিয়োগের। অন্ধতাকে দূর করতে হয়, যা কিছু আবর্জনা ও মৃত বোঝা তাকে উপড়ে ফেলতে হয়, নিজের চারপাশে অবাধ মুক্ত আলো-হাওয়ার জন্য সমস্ত জানালা খুলতে হয়। কতোটুকুকে নেবে ও কতটুকু বর্জন করবে তা প্রতিনিয়ত সচেতনভাবে স্থির করতে হয় নিজের কল্পনার মাপে। কল্পনার শ্রেয় ও প্রেয় আবার নির্ধারিত হয় সমগ্র সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কে ও বোঝাপড়ায়। হ্বাইটহেড চমৎকার লিখেছেন যে এ কারণেই 'Education is the acquisition of the art of the utilisation of knowledge'।

শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারের প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ আমরা আগেই বলেছি শিক্ষায় মানুষ লক্ষ্য অনুযায়ী হয়ে ওঠে (becoming), সুতরাং প্রতি মুহূর্তেই তার শুধু সংবাদ ও জ্ঞান সঞ্চয় করাই একমাত্র কিম্বা অন্যতম কাজ নয়। তাকে যাচাই করতে হয়, সে যা সঞ্চয় করছে তা কিসের জন্যে? যদি নিজের প্রয়োজনে হয়, তবে জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে পরীক্ষা করা দরকার। কারণ, সে সময়ের প্রবাহে নিয়ত স্থির থাকতে পারে না, তাকে কিছু-না-কিছু হতেই হয়। ভালো হোক বা মন্দ হোক তাকে জীবনে অংশ নিতে হয়, বাছাই করতে হয়। এই বাছাইয়ের সঙ্গে তার কর্ম জড়িত। সে তাই প্রয়োগের সূত্রেই জ্ঞানের পরিচয় গ্রহণ করে।

জ্ঞানের এই 'প্রয়োগ কৌশল'টির অর্থ হ্বাইটহেড ব্যাখ্যা করে জানান যে, **প্রয়োগ-কৌশলটা হলো** তার জীবনের ওপর দিয়ে **সতত প্রবাহমাণ ঘটনা প্রবাহকে বুঝবার রীতি**। কারণ তা বুঝতে না পারলে সে নিজেকেই বুঝতে পারবে না। কারণ, এই ঘটনা-প্রবাহই সে নিজে। ঘটনা-প্রবাহই তার জীবন। শিক্ষা জীবনকে তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতার দ্বৈত সম্বন্ধে জানতে শেখায়। শিক্ষা জীবনকে রহস্য ও অজ্ঞানের আড়াল থেকে নিয়ে আসে কল্পনা ও সত্যের জগতে।

এই তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে অধ্যাপক কোল শিক্ষার উদ্দেশ্য

অধ্যাপক কোলের ছটি নির্দেশ

বিষয়ে কয়েকটি নির্দেশ তৈরি করেছেন। তাঁর মূল্যবান তালিকাটি আমাদের সাহায্য করবে। তিনি ছটি প্রয়োগের কথা বলেছেন, শিক্ষার লক্ষ্য হবে এই প্রয়োগগুলো মেটানো।

(ক) পারস্পরিক সুবিধে তৈরি করা বা নোংরামি বন্ধ করা (common convenience or prevention of nuisance)। এই শিরোনামায় কোল প্রত্যেক ছেলেমেয়ের কয়েকটি ন্যূনতম কর্তব্য ছকেছেন। যেমন ওঁর ভাষায় 'Read easily, write intelligibly, do ordinary sums and accounts ; ইত্যাদি।

(খ) পারস্পরিক দায়িত্ব বা নিজের নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী কর্ম (Common service from each according to his capacities)। সব চেয়ে কম অপচয় করে প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে তাদের সাধ্যমত উপার্জনক্ষম ও সামাজিক দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন করে তুলতে হবে, যেমন কোলের উদাহরণ মতো

'Combining institutional instruction with gainful employment so as to make each help the other, and help towards an understanding of the other.'

(গ) উপভোগ ও আনন্দ (Enjoyment and Appreciation)। শিক্ষা এমন হবে যে প্রতিটি নরনারী তাদের অবসরকে আনন্দের ও সৃষ্টিশীল কর্মের উপযুক্ত করে তুলতে পারবে। প্রতিটি লোকই নিশ্চয়ই সৃষ্টিশীল কর্মে অংশ গ্রহণ করে না। তারা পরোক্ষভাবে পাঠক হিসেবে, ভোক্তা হিসেবে সেই প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। কোলের ভাষায় একটি উদাহরণ হলো 'organizing things—and people'।

(ঘ) সামাজিক নৈতিকতা ও সম্প্রদায়ের মনোভাব (Social morality and Sentiment of community)। প্রত্যেক নরনারীকে এমন ভাবে জীবনের পাঠ নিতে হবে যে তারা সামাজিক কর্মের তাৎপর্য বুঝবে ও নিজের নিজের কর্তব্য করবে। সমাজের প্রবাহমান ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা ও শ্রেয়-প্রেয়র ধারণা থেকেই ব্যক্তিরা শেখে ও তাদের নিজেদের ধর্মকে সংগঠিত করে। এই শিক্ষা তারা গোড়ায় পায় পরিবারে এবং পরিশেষে সচেতন শিক্ষা-ব্যবস্থায়। কোলের ব্যাখ্যায় আছে।

'The educational system should be designed to endow every boy and girl with a sufficient basis of common moral sentiment and belief to enable the largest possible proportion of them to live in harmony with the society to which they belong, and to contribute actively to its development.'

কোল বলেছেন যে বর্তমান কালে ধর্ম আর সমাজবন্ধনকে প্রাণশক্তি জোগাতে পারছে না। এই শূন্যতাকে অন্যভাবে ভরাতে হবে। কোলের মতে এই শূন্যতা ভরাবার কথাটির দুটি তাৎপর্য। (১) সামাজিক সংস্থার সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত হবে ও (২) নৈতিক শিক্ষা হবে সামাজিক শিক্ষা।

(ঙ) ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত প্রয়াস (Personal and Group Initiative or Democratic creativeness)। শিক্ষা শেখাবে আত্মনির্ভরতা ও আত্ম প্রচেষ্টা। আত্মনির্ভরতায় ব্যক্তি নিজের কর্মের প্রেরণা ও স্বাধীনতা লাভ করে।

(চ) স্বীকৃত কাজ বা সামাজিক সাম্য (Common standards or Social equality)। সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করা যেমন প্রয়োজন তেমনি সামাজিক বিভেদ ও সামাজিক বাধাকে পেরিয়ে যাবার আত্মবিশ্বাসও প্রয়োজন। মানুষে মানুষে ক্ষমতার তারতম্য নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেই তারতম্যের ভেদ যেনো সামাজিক শ্রেণীভেদে পরিণত না হয়। কোল উদাহরণ দিয়েছেন,

'An educated man should be able to marry his cook, and *vice versa*, without the probability of clashes of social behaviour'.

বিদ্যালয়ের কাজ (Role of the school) :

শিক্ষার আদর্শকে পরিপূর্ণ করাই বিদ্যালয়ের কাজ। শিক্ষার প্রাথমিক এবং জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া চলতে থাকে পরিবারে। পরিবারের কাছ থেকে শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে বিদ্যালয়। পরিবারে জীবনের লক্ষ্য সচেতন ও নির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু বিদ্যালয় নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের মধ্যে সচেতন ভাবে পরিকল্পনা মতো ব্যক্তির জীবনকে রূপ দেবার চেষ্টা করে।

বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট কার্যক্রমের সঙ্গে পণ্ডিতরা শিশুর মনস্তত্ত্বকে মিশিয়ে দেখেন। শিশুই যেহেতু বিদ্যা ও বিদ্যালয়ের কেন্দ্র, শিশুর মানসিকতা স্বভাবতই আলোচনার বিষয়। কারণ, কেমন করে সে শেখে, কতটুকু তার শিখবার বাসনা, কি কি বাধা তাকে এগোতে দেয় না এ সমস্ত কিছুই জানা দরকার।

শ্রীমতী মণ্টেসরীর মতে শিশুর জীবনে একটি পর্যায় আছে যখন তার সচেনতা অত্যন্ত তীব্র। মৃদুতম সংবেদনেও সে সাড়া দিতে পারে। এই

পর্যায়টিতে এমনভাবে তার সঙ্গে ব্যবহার করা দরকার—যেনো তার সংবেদনশীলতা কোনোক্রমেই আঘাত না পায়। বিদ্যালয়ের প্রাথমিক কর্তব্য হবে শিশুর এই তীব্র অথচ গভীর সংবেদন-পর্বকে রক্ষা করা।

অধ্যাপক হ্বাইটহেড বিদ্যালয়ের কাজ ছকবার জন্য 'শিক্ষার ছন্দ' (Rhythms of education) নামে একটি বক্তব্য তৈরি করেছেন। ওঁর মতে কোন ছাত্রের একটানা উন্নতি বা অগ্রগমন বলে কিছু হয়না। একটা ভুল ধারণা চালু আছে যে, একটি ছাত্র আট থেকে দশ বছর বয়সে ল্যাটিন শিখতে শুরু করে আঠারো কিম্বা কুড়িতে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে। এই বক্তব্যটি ভুল মনস্তত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, ঋজু সরলরেখার মতো একটানা গতি জীবনের নেই। জীবন চলে পর্য্যায়ক্রমে (periodic)। পর্যায়গুলোকে ভাগ করা যায় দৈনিক পর্যায়, অবসর ও খেলার সঙ্গে মিলিয়ে, ঋতুপর্যায়, শিক্ষার এক-একটা পর্ব ও ছুটির সঙ্গে মিলিয়ে। আর আছে বাৎসরিক পর্যায়। এই সঙ্গে থাকে মনের বিবর্তনের চক্র। চক্রাকারে বিবর্তন চলে অথচ প্রতিটি পর্বেই নতুন কথা তৈরি হয়। মনের এই চক্রাকার গতিতে নতুন ও পুরোনো বারবার সম্পর্কিত হয় ভাঙা গড়ায়। একেই হ্বাইটহেড বলেন 'শিক্ষার ছন্দ'। ওঁর ভাষায় জানা যায় শিক্ষার ছন্দ হলো, 'as meaning essentially the *conveyance of difference* within the *frame work of repetition.*' এই চিহ্নিত শব্দ-দুটিকেই অধ্যাপক হ্বাইটহেড সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেন।

শিক্ষার ছন্দ

শিক্ষায় নিত্যনৈমিত্তিকতা থাকে, পৌনঃপুনিকতা থাকে, একই পাঠ্যক্রম ঘুরেফিরে দীর্ঘদিন প্রচলিত থাকে। এটা শিক্ষার নির্দিষ্টতা ও ঐক্যরূপের জন্য প্রয়োজন। সঙ্গেসঙ্গেই আবার প্রয়োজন নতুনকে গড়বার ব্যবস্থা, যা এক নয়, যা সবার মতো নয় তাকে তৈরি করার ব্যবস্থা। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিদ্যালয় শিক্ষার ছন্দ জানে না, তাই তার কোনো চরিত্র নেই। এই চরিত্রহীনতা সম্বন্ধে হ্বাইটহেড লিখেছেন,

'Lack of attention to the rhythm and character of mental growth is a main source of wooden futility in education'.

এই মৃত প্রাণহীন অবস্থা থেকে বেরিয়ে নতুন বিদ্যালয়ের কাজের জন্য হ্বাইটহেড 'শিক্ষার ছন্দকে' তিনটি পর্বে ভাগ করেছেন। (ক) রোমান্স পর্ব, (খ) নির্দিষ্টতা পর্ব ও (গ) সাধারণীকরণের পর্ব।

(ক) রোমান্স পর্ব (Stage of Romance)—রোমান্স পর্বে প্রথম বোধের জন্ম। এই পর্বে জ্ঞান নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে চলে না। আমরা এই পর্বে তথ্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়াই, তখন তথ্যের চুলচেরা বিশ্লেষণে বস্তুর সম্পর্ক ও তাৎপর্য বুঝবার চেষ্টা করি না। যেমন,

'...Crusoe was a mere man, the sand was mere sand, the footprint was a mere footprint, and the island a mere island, and Europe was the busy world of men.'

অনেকটা স্বপ্নরাজ্যের মতো। নিশ্চয়ই তাত্ত্বিক যোগসূত্র তথ্যের থাকে, নানা সম্পর্কের সূত্রে তাদের দেখতে হয় কিন্তু এই পর্বে তা আমাদের নজর এড়ায়। তথ্যের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিটাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ তা আমাদের সমস্ত দৃষ্টি কেড়ে নেয়।

নির্দিষ্টতার পর্ব (Stage of precision)—এই পর্বে আবেগ, উত্তেজনা ও আনন্দ পেরিয়ে বস্তু ও তথ্যের নির্দিষ্ট সম্পর্কের সূত্র খোঁজ হয়। এই সম্পর্ক প্রকাশ করা হয় যথাবিহিত এবং রীতিবদ্ধ সংজ্ঞাপ্রকরণে। হোয়াইটহেড বলেন—

'It is the stage of grammar, the grammar of language and the grammar of science. It proceeds by forcing on the student's acceptance a given way of analysing the facts, bit by bit. New facts are added, but they are the facts which fit into the analysis'.

হোয়াইটহেড এই পর্বে বিশ্লেষণকেই (analysis) সবচেয়ে গুরুত্ব দেন। আমরা প্রথম পর্বের তথ্যবিষয়ক অনুভূতি থেকে এই পর্বে চলে আসি চিন্তার মৌলিক সূত্রে, কার্যকারণের সম্পর্কে। বিভিন্ন ঘটনা ও তথ্যকে একটি বা একাধিক নিয়মের ঐক্যরূপে সংস্থিত করি।

(গ) সাধারণীকরণের পর্যায় (stage of generalisation)—এটা হলো সর্বশেষ পর্ব যখন পূর্ববর্তী পর্ব দুটোর পরিণতি পাওয়া গেছে, তাতে কৃতকার্যতা এসেছে।

এই তিনটি পর্ব-বিভাগের আলোচনায় মনে রাখা দরকার যে আমরা সাধারণত দ্বিতীয় পর্বটিকেই শিক্ষা বলতে চাই। প্রথম পর্বটির তাৎপর্য আমাদের নজরে পড়ে না। কারণ শিক্ষা বলতেই আমরা রীতিবদ্ধতা ভাবতে থাকি। অথচ প্রথম পর্বটি ছাড়া দ্বিতীয় পর্বের কোনো অর্থ নেই।

প্রথম পর্বেই আনন্দের মাধ্যমে বিশ্ব বিষয়ে বোধের সূত্রপাত। বোধহীন যান্ত্রিক শিক্ষায় জীবনের কোনো উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। প্রথম বোধের উত্তেজনা ও আবিষ্কারের আনন্দে চঞ্চল শিশু বিশ্বের সঙ্গে তার নাড়ির সম্পর্ক টের পায় এবং সেই রোমাঞ্চে সারা বিশ্বের হৃদয়ের খোঁজ নিতে উদ্‌গ্রীব হয়। আসলে এই পর্বেই প্রেরণার শিকড় জীবনের গভীরে রস সঞ্চয় করে এবং সারা জীবন উজ্জীবিত রাখে। হ্বাইটহেড তাই সুন্দর লেখেন 'Education must essentially be a setting in order of a ferment already stirring in the mind : you cannot educate mind in vacuo.' এবং একথাও আমরা জানি যে 'a stage of a precision is barren without a previous stage of romance' কারণ প্রথম পর্বেই তথ্যের সচেনতা গড়ে, নিজের বাইরে যে বিশ্ব তাকে একটু একটু করে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে জানতে ইচ্ছে করে এবং জানার উপকরণ মন জমাতে থাকে।

সাধারণত শিক্ষা হল দ্বিতীয় পর্যায়

শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে এই তিনটি পর্বকে রক্ষা করা, বিদ্যালয় এই কর্তব্য পালন করবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা কারিগরী শিক্ষা (Vocational and Technical Education):

বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রধান ঝোঁক 'বৃত্তি' শব্দটির উপর। কিন্তু বৃত্তি শব্দটির অর্থ কি? সাধারণভাবে বৃত্তি বলতে আমরা বুঝি 'পেশা'। অর্থাৎ যে কর্মে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়। সুতরাং বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলতে বোঝা হবে এমন শিক্ষা যা গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে। এই বক্তব্যের পেছনে আরো একটা বক্তব্য প্রচ্ছন্ন থাকে। সেটা হলো আমরা যেনো মনে মনে ধরে নিই বৃত্তিমূলক শিক্ষা ছাড়া অন্য কোনো শিক্ষা সম্ভব এবং যাতে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয় না। অনেকেই জানেন তাকে মোটামুটি-ভাবে 'সাধারণ শিক্ষা' বলা হয় অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট পেশার দিকে যে-শিক্ষার কোনো ঝোঁক নেই। কাজেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার বিরোধী। গ্রাসাচ্ছাদনের প্রশ্নটি বর্তমান কালে খুব জটিল হয়ে উঠেছে কারণ বর্তমানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এমন লোকের প্রয়োজন সর্বাধিক যে উৎপাদন ও উৎপাদন-সংক্রান্ত কর্মে জড়িত। নিছক কোনো শাস্ত্রে পারদর্শিতায় এই প্রয়োজন মেটেনা। অর্থাৎ প্রধানতই প্রয়োগ ও প্রায়োগিক কর্মের সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষার যোগাযোগ।

বৃত্তি হল প্রয়োগ বিদ্যা

প্রয়োজনের সঙ্গেই প্রয়োগের যোগ। বর্তমান জীবনযাত্রায় প্রয়োগ ও প্রত্যক্ষতা প্রধান দুটি শব্দ। যে শিক্ষা বা জ্ঞানের প্রয়োগ নেই বা যার প্রয়োগের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ তার মূল্য কম, যাতে নগদ বিদায় নেই অর্থাৎ যে-শিক্ষার সামনে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল রঙ নেই, তার মূল্যও নেই।

কারিগরী শিক্ষাও গোড়ায় একটা কৌশল বা technique। এই কৌশলের সাহায্যে প্রকৃতি থেকে প্রয়োজন মতো আহরণ করা যায়। আদায়ের উপকরণ হিসেবে, জীবনের মান উন্নয়নের প্রধান ভিত্তি হিসেবে এই কৌশল বা টেকনিকের গুরুত্ব এতো বেশি যে শিক্ষার প্রধান কর্তব্যই মনে করা হচ্ছে নির্দিষ্ট ধারার কারিগরী কৌশলের শিক্ষা। কারিগরী শিক্ষার গুরুত্ব যন্ত্র-বিদ্যার অগ্রগতিতে আরো বেড়ে গেছে। অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি হওয়ায় করিগরী শিক্ষা ছাত্রদের অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্ভাবনার স্বপ্ন জোগাতে পারছে। হাতে কলমে কাজটার দক্ষতা অর্জন করতে পারলেই যেহেতু অর্থের ভাবনা থাকবে না, জীবনে অন্য কিছুর দিকে নজর না-দিয়ে কৌশলটা রপ্ত করতে পারলেই হলো। কাজেই কারিগরী শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার বিভাগ তৈরি হয়েছে এবং সাধারণ শিক্ষার মূল্য দ্রুত কমে আসছে।

কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে একটি প্রধান ধারণা জড়িয়ে আছে যে, বৃত্তি নির্ভর করে বা করা উচিত মানসিক ঝোঁকের ওপর। প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব মানসিক গড়ন ও সেই গড়ন অনুযায়ী কর্মের প্রেরণা ও লক্ষ্য থাকে। তাকে সেই লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারলেই তার সিদ্ধির পথ খোলা হয়। বৃত্তি তার মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। বৃত্তির সঙ্গে মেশানো দরকার শিক্ষা: সাধারণ বা কারিগরী যাই হোক না কেনো।

এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে অনেক পণ্ডিতের প্রচণ্ড আপত্তি আছে। তাঁরা বলেন শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তির কোনো যোগ নেই। কারণ বৃত্তি বাহ্য কর্ম। গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা যে যার মতো করবে কিন্তু করাটা সর্বদা তার নিজের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। সমাজ ও পরিবেশ সমস্ত সম্ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ, সর্ববিধ বৃত্তির মধ্যে বাছাই করবার একান্ত সুযোগ ব্যক্তি কখনো পায় না। তার সামাজিক অবস্থান, প্রতিপত্তি ইত্যাদি সর্বদাই নানা ভাবে তার বাছাইকে সীমাবদ্ধ করে। সুতরাং প্রধান দুটো আপত্তি জানা যাচ্ছে। প্রথমত, বৃত্তির সঙ্গে শিক্ষার যোগ থাকতে

পারে না। কারণ মানসিক বৃত্তি কোনো একটি মুহূর্তে চিরকালের মতো নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। দ্বিতীয়ত, বৃত্তির সুযোগ সামাজিক কার্য-কারণ নির্ভর। যেমন একটি ছাত্র বুঝতে পারছে তার মানসিক ঝোঁক ইনজিনীয়র হবার দিকে অথচ নিছক আর্থিক কারণে সে ওই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারলো না। সুতরাং সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বিভাগ তৈরি করা উচিত নয়, যেমন বিভাগ তৈরি করা উচিত নয় বৃত্তিমূলক শিক্ষার মর্যাদা ও সাধারণ শিক্ষার মর্যাদা বিষয়ে।

বৃত্তি আসলে মানসিক ঝোঁক নির্ভর

এই সমালোচনা প্রসঙ্গে অন্যান্য পণ্ডিতরা বলতে চান যে 'বৃত্তি' শব্দটিকে সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা ঠিক নয়। ডিউঈ যেমন বলেন যে 'A vocation means nothing but such a direction of life activities as renders them perceptibly significant to a person because of the consequences they accomplish and also useful to his association !' অর্থাৎ বৃত্তি বলতে তিনি আর নির্দিষ্ট ব্যবহারিক ও প্রয়োগসিদ্ধ কর্ম বুঝছেন না। বৃত্তিকে জীবনের বৃহত্তর কর্ম ও লক্ষ্যের সঙ্গে জড়াচ্ছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও যন্ত্রবিদ্যার প্রভাবে ডিউঈ অত্যন্ত চিন্তিতভাবে দেখেছিলেন যে জীবনে বড় বেশি প্রকোষ্ঠভাগ হয়ে গেছে। এক একটি খোপে এক এক ব্যক্তি বাস করছেন। যিনি পদার্থতত্ত্ববিদ তিনি শিল্প জানেন না, যিনি চিত্রকর তিনি জীববিদ্যা জানেন না, যিনি রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ তিনি দর্শনের খোঁজ রাখেন না। জীবনকে এমনভাবে ভাগ করা হয়েছে যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে কারো সঙ্গে কারো যোগসূত্র নেই। ফলে শিক্ষার ফলাফল সমাজে নানা বিভাগের জন্ম দিচ্ছে।

ডিউঈ তাই বলেন কোনো বিশেষ বৃত্তির পরিপোষকতা করা শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ কোনো ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার কথা যেমন একমুহূর্তে জানা যায় না তেমনি কোনো ব্যক্তি কেবল একটি মাত্র বৃত্তিরই যোগ্য, এমন কথাও বলা যায় না। অথচ বৃত্তিমূলক শিক্ষায় গোড়াতেই উপরোক্ত দুটি প্রত্যয় তৈরি করা হয় এবং ব্যক্তিদের সেই খোপে খোপে ফেলা হয়। সুতরাং ব্যক্তিদের এমন সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যের বাহন মনে করলে শিক্ষার তাৎপর্য ও ক্ষেত্র এত সীমাবদ্ধ হয় যে ব্যক্তির স্বকীয়তা তাতে সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হবে। তাছাড়া বৃত্তিতে বৃত্তিতে সম্পর্ক

ডিউঈ: শিক্ষা বৃত্তিমূলক হওয়া উচিত নয়

না-থাকলে কোনো বৃত্তিই স্বয়ং-সম্পূর্ণভাবে পরিণতি পেতে পারে না। কারণ জ্ঞানের ক্ষেত্র কখনোই পৃথক-পৃথক রাজ্য নয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যদিও মনে হয় যে, এক একটি শাস্ত্র প্রকৃতির এক একটি বিভাগ নিয়ে যেহেতু আলোচনা করে তারা পৃথক হতে বাধ্য, তবুও আমরা জানি প্রকৃতি এক এবং তাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কক্ষে ভাগ করা যায় না। তাই দেখতে পাওয়া যায় যে পদার্থবিদ্যার সঙ্গে যোগ রসায়ন ও জীববিদ্যার, জীববিদ্যার সঙ্গে রসায়নের, মনস্তত্ত্বের সঙ্গে জীববিদ্যার, রসায়ন ও পদার্থতত্ত্বের। একটি শাস্ত্র আর একটি শাস্ত্রের ভিত্তি বা পরিপূরক।

কাজেই নিছক নির্দিষ্ট একটি বৃত্তির সূত্রে শিক্ষাকে গড়লে শিক্ষায় মারাত্মক গলদ থেকে যাবে। শুধু শিক্ষা ব্যবস্থাই নয়, শিক্ষার সঙ্গে জড়িত সামাজিকবোধের ক্ষেত্রেও মূল্য বিচারে নানা ভ্রান্তি দেখা দেয়। কোনো এক ব্যক্তি এমন একটা যন্ত্র নয় যে তাকে কেবলমাত্র একটি ছাঁচেই গড়তে হবে। বরং আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে অনন্ত সম্ভাবনাময় ব্যক্তি নানা কর্মের সঙ্গে জড়িত। নানা ক্ষেত্রে তার নানা বৃত্তি। **সুতরাং সম্পর্ক ও বৃত্তির সহযোগিতা সৃষ্টিই শিক্ষার উদ্দেশ্য, কেবলমাত্র বৃত্তিজ নির্দিষ্ট ছক তৈরি করা নয়।** সম্পর্ক যতো স্তরের, বৃত্তির সম্ভাবনাও ততো জটিল।

দার্শনিক ডিউই তাই চমৎকার নির্দেশ দিয়েছেন যে **শিক্ষায় আমাদের এই বিভাগ বা প্রকোষ্ঠভাগ** (compartmentalisation) **বন্ধ করতে হবে।** বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে চীনের প্রাচীরটি ভেঙে এমন একটা ব্যবস্থা আনতে হবে যে স্বাভাবিক সর্ববিধ বৃত্তির প্রকাশ হবে ব্যক্তিদের জীবনে। তারা কেবলমাত্র কোনো একটি নির্দিষ্ট পেশাতেই কেন্দ্রবদ্ধ থাকবে না। সমাজ ও জীবনের সমস্ত স্তরের কর্মে উৎসাহিত হবে এবং অংশ গ্রহণ করতে পারবে। তাই 'the scientific inquierer shall not be merely the scientist, the teacher merely the pedagogue,' সবই একই সঙ্গে অনেক কিছু হবার চেষ্টা করবে।

অধ্যাপক হোয়াইটহেড উদারনৈতিক শিক্ষা (liberal education) ও কারিগরী শিক্ষা (technical education) কে প্লেটো ও সন্ত বেনেডিক্ট এর দ্বৈতে প্রকাশ করেন। উদারনৈতিক শিক্ষাকে তিনি বলেন 'an educatian for thought and for asthetic appreciation' এই শিক্ষায় 'It proceeds by imparting a knowledge of the masterpieces of thought, of imaginative literature, and of art. The action which

it contemplates is command।' এই উদারনৈতিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিলো রুচির সংগঠন। দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে শরীর ও মনের গঠন। যেনো প্রতিটি নর-নারী এমনভাবে তৈরি হবে যে একদিকে যেমন তারা দেশজ মনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশ দেবে, ঐতিহ্যের চাপে সাড়া দেবে তেমনি নিজেদের নির্দিষ্ট কর্মকে সার্থকতায় মণ্ডিত করব। **এক কথায় উদারনৈতিক শিক্ষা মনকে সংস্কৃতির যোগ্য করে তোলে।** যেমন প্লেটোর আদর্শে য়ুরোপীয় সংস্কৃতি উন্নতির শিখরে ওঠে। 'It has encouraged art, it has fostered that spirit of disinterested curiosity which is the origin of science, it has maintained the dignity of mind in the face of material force, a dignity which claims freedom of thought.'

হোয়াইটহেড কারিগরী শিক্ষা ও উদারনৈতিক শিক্ষায় দ্বন্দ্ব নেই বলেন

কারিগরী শিক্ষাকে এই উদারনৈতিক শিক্ষার বিরুদ্ধে শুধুমাত্র প্রয়োগ-বিদ্যা বলা হচ্ছে। হোয়াইট হেড বলেন যে **এই দুই শিক্ষার মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই।** কারণ শুধুমাত্র তত্ত্ব বা শুধুমাত্র প্রয়োগে যেমন বিভেদ তৈরি করা যায় না তেমনি শুধুমাত্র সাহিত্য-শিল্প ও বিজ্ঞানে কোনো মূলগত বিরোধ নেই। হোয়াইটহেড লেখেন 'The insistence in the Platonic culture on disinterested intellectual appreciation is a psychological error. Action and our implication in the transition of events amid the inevitable bond of cause to effect are fundamental. An education which strives to divorce intellectual or aesthetic life from these fundamental facts carries with it the decadence of civilisation.'। ওঁর মতে শুদ্ধ সংস্কৃতির শিক্ষা ও প্রয়োগকৌশলযুক্ত বিজ্ঞানকে তফাৎ করা যায় না। কারণ বিজ্ঞান প্রকৃতিকে দেখে কার্য-কারণ মিলিয়ে। কার্য-কারণকে জানতে হয় হাতে কলমে তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগকে জড়িয়ে। কর্মহীন, প্রয়োগহীন জ্ঞানের সত্য একপেশে কারণ চিন্তার উপকরণকে ব্যবহারের সূত্রেই অর্থ যুক্তভাবে জানতে হয়। 'শুধু মাত্র চিন্তা বা শুদ্ধ চিন্তা বলে পৃথিবীতে কিছুই সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বা বিজ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে a passion for on ordered intellectual vision of the connection of

জ্ঞান ও কর্মের মিলন চাই, প্রয়োগ ও তত্ত্বের যোগ

events. But the goal of such curiosity is the marriage of action to thought.

প্রয়োজন তাই জ্ঞান ও কর্মের মিলন। কর্ম বা প্রয়োগ বিচ্ছিন্ন তথ্যকে যাচাই করে, সংগ্রহ করে ও শ্রেণীবদ্ধ করে। ঠেকে ঠেকে শিখতে হয় প্রকৃতির তথ্যাবলীকে, অভিজ্ঞতায় প্রকৃতির সত্য টুকরো টুকরো ভাবে প্রতিভাত হয়। তারপর তথ্যাবলীকে কোনো ঐক্যে গ্রথিত করে আমরা সমগ্রভাবে প্রকৃতিকে বুঝতে চাই। প্রকৃতির নিয়মকে স্থির করি। প্রকৃতির নিয়ম জানা শুধু তথ্যই নয়, তথ্যের কেন্দ্রগত ঐক্য ও ঐক্যের নীতি। সুতরাং তত্ত্ব ও তথ্যের যোগ অন্তর্নিহিত। তথ্য ছাড়া যেমন তত্ত্ব সম্ভব নয়, তেমনি তত্ত্ব ছাড়া তথ্যের তাৎপর্য অস্পষ্ট। বাঁচার জন্যেই মানুষকে তত্ত্ব ও তথ্যের ঐক্য প্রতিপাদন করতে হয়।

তত্ত্ব ও তথ্যের সম্পর্ক থেকেই বুঝতে হয় উদারনৈতিক শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার মৌলিক ঐক্যবন্ধন। **তুটি শিক্ষার প্রধান কথাই হলো 'অনুসন্ধান'।** অনুসন্ধান কখনো শুধুমাত্র প্রকৃতির নিয়ম, কখনো, আত্ম-প্রকাশের শিল্পরীতি। সুতরাং বৈজ্ঞানিক 'does not discover in order to know, he knows in order to discover.' কাজেই আবিষ্কার জীবনেরই নিয়ম, জীবনকে প্রতিমুহূর্তে বোধে ও কর্মে প্রকাশ করতে পারলেই সত্য লাভ সম্ভব। তাই হোয়াইটহেড সঠিক নির্দেশ দেন যে 'In simpler language, education should turn out the pupil with something he knows well and something he can do well.,

উচ্চশিক্ষা (Higher Education)

শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। পরিবারের শিক্ষা চিরকাল চলতে থাকে। কিন্তু বিদ্যালয়ের কাজ বৃহত্তর জীবনের জন্য প্রাথমিক বোধ, কর্ম ও দায়িত্ব বিষয়ে প্রস্তুত করা। তারপর বিদ্যালয় থেকে দায়িত্ব নেয় বিশ্ববিদ্যালয়। **বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ তখন পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সহযোগী পরিবেশ তৈরি করা।** কিশোর-কিশোরী বা যুবক-যুবতীরা সমগ্র জীবনের আদর্শ ও কল্পনাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে সংগঠিত করে এবং ভাবী কর্ম ও প্রেরণার উৎসকে স্পষ্টভাবে স্থির করে। কার্যত **বিশ্ববিদ্যালয় তাই বৃহত্তর জীবনের প্রহরী।** প্রহরী ছাড়পত্র দিলেই জীবনে প্রবেশাধিকার মেলে।

একথা নিশ্চয়ই ঠিক যে প্রতিটি ব্যক্তিই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা নেয় না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র জাতির কল্পনা ও প্রেরণাকে তার শিক্ষার মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে দেয় যে দেশের সংস্কৃতির আবহাওয়ায় তার ছাপ পড়ে। জানা যায় বিশ্ববিদ্যালয় কেমন করে জাতিগঠন করছে বা সংস্কৃতির পরিমণ্ডল তৈরি করছে। **বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ দেখেই জাতির মানসকে বোঝা যায়।** এই ছাপটা কেবলমাত্র কয়েকটি ডিগ্রী নয়। ছাপটা চিনতে পারা যায় রুচিতে, সামাজিক ব্যবহারে, জীবনের সর্ববিধ ক্ষেত্রের উৎসাহ ও সংযোগে। হোয়াইটহেড বলেন 'The universitios are schools of education, and schools of research.' শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্য নির্ভর করে কতোটুকু জীবনের প্রতি অনুরাগ ও মমতা প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে তার ওপর। হোয়াইটহেডই বলেন যে 'The justification for a university is that it preserves the connection between knowledge and the zest of life, by uniting the young and the old in the imaginative consideration of learning. The university imparts information, but it imparts imaginatively.' অধ্যাপক হোয়াইটহেডের বক্তব্য থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ে আমরা দুটো প্রধান কথা জানতে পারছি। প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দেয়। শিক্ষার অর্থ এখানে জ্ঞান-সঞ্চয় ও জ্ঞানের জগত বিষয়ে আমাদের সচেতন করা। জ্ঞান অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সেতু। **বিশ্ববিদ্যালয় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত জ্ঞানকে একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে ঐক্যবদ্ধ করে ও সংহতি দেয়।** সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগের সৃষ্টি করে। কারণ জীবনের অনুরাগেই জ্ঞানের সার্থকতা ও প্রয়োজন উপলব্ধি করা যায়। জ্ঞান জীবনের প্রয়োজনেই। জীবনের তাৎপর্য বুঝবার জন্যই তত্ত্ব ও তথ্যকে মিলিয়ে ভবিষ্যত প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। কাজেই জীবনের স্বার্থকতাতে অতীত ও বর্তমান সম্পর্কিত হয়, ভবিষ্যত নির্দিষ্ট রূপ পেতে থাকে। জ্ঞানের ক্রমিকতা রক্ষা পায় ও সংস্কৃতির মান আমাদের জীবনে নির্দিষ্ট হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার শেষ কেন্দ্র

দ্বিতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত জ্ঞানকেই আবেগের দ্বারা জারিত করে জীবনে প্রয়োগ করে। তথ্য বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের চারপাশে ছড়ানো। প্রকৃতিতে অসংখ্য ঘটনা ঘটছে, জীবনের প্রবাহ একটানা বয়ে চলেছে।

আপাতদৃষ্টিতে এই ঘটনাবলী ও প্রবাহের কোনো তাৎপর্য নেই। দার্শনিক হিউম দেখিয়েছেন যে সবটাই একটানা প্রবাহমাত্র ; কী ঘটনা, কী জীবন। হিউমের বক্তব্য মেনে নিলে জীবনের কোনো লক্ষ্য থাকে না, কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না একটা ঘটনা থেকে আর একটা ঘটনার। হিউম নিজেই অজ্ঞেয়বাদী হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ আমরা জানি প্রতিদিনকার বাঁচা থেকে আরম্ভ করে সমাজের সর্বত্র আমাদের প্রতিটি কাজে একটি আদর্শ ঐক্যসূত্র কাজ করে। নইলে আমাদের যেমন পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় না, তেমনি নিজেদেরও জানবার কোনো উপায় নেই। 'আমি' বলতে আমরা যেমন একটি নির্দিষ্ট চরিত্রকে বোঝাই, যার মধ্যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিহিত। কারণ 'আমি' শব্দের দ্বারা সে তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অসংখ্য বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীকে সংগঠিত করে। এবং করতে পারে বলেই তার কর্মে তার চরিত্রের প্রকাশ ঘটে। হিউমের মতে তার জীবনে নিশ্চয়ই ঘটনা ঘটে যাচ্ছে কিন্তু এই ঘটনাবলীর মধ্যে কোনো যোগসূত্র নেই। সমস্ত ঘটনাই বিচ্ছিন্ন। আমরা এই বক্তব্য মানিনা কারণ আমরা জানি যে ঘটনার ঐক্য আমরাই স্থাপন করি যেহেতু ঐক্যের মধ্যেই জীবনযাত্রার অর্থ লুকিয়ে থাকে। ঐক্যেই আমার কর্মের রহস্য প্রস্ফুটিত হয়। সুতরাং জীবনের প্রতিটি ঘটনাকেই আবেগে নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত ভাবতে হয়। আবেগেই তথ্য বিষয়ে আমাদের অনুসন্ধিৎসা তৈরি হয়। হ্বাইটহেড বলেন আবেগ 'enables men to construct an intellectual vision of a new world, and it preserves the zest of life by the suggestion of satisfying purposes.' আবেগেই কল্পনার জন্ম এবং কল্পনাতেই জগত সংসারকে বুঝে নতুন রূপ দেবার কথা থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও আবেগের সংযোগ আনে

শিক্ষা ও রাষ্ট্র (Education and the State)

পৃথিবী বিখ্যাত জর্মন দার্শনিক কাণ্ট বলেন মানুষকে সর্বদাই পরিপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে দেখতে হবে, কখনোই উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাহন হিসেবে নয়। **শিক্ষার সঙ্গে পরিপূর্ণ মানুষের যোগ**। আংশিক কোনো উদ্দেশ্যসিদ্ধির সূত্রে মানুষকে ভাবেন সত্যে পৌছোনো যাবে না।

কিন্তু মানুষ সামাজিক জীব। জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে সে অসংখ্য বন্ধনে অন্যদের সঙ্গে জড়িত। প্রতিটি ব্যক্তিই যেহেতু পরিপূর্ণ লক্ষ্য, মানুষে

মানুষে সম্পর্কে সবার পরিপূর্ণতার কথাই উপস্থিত। প্রতি ক্ষেত্রেই প্রতিটি ব্যক্তির কথা পরস্পরের সহযোগিতা বা বিরোধে স্থিরীকৃত হয়। কোনো ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র কোনো একজনের কথা ভাবা যায় না। বর্তমান কালে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কারণে সমাজের সীমা এতো বেড়ে গেছে যে সর্বত্রই গড়পড়তা ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। কোথাও আর ব্যক্তিবিশেষের কথা ভাবা চলছে না। একমাত্র পরিবার ব্যক্তির কথা ভাবতে পারে কিন্তু সমাজের পক্ষে আর ব্যক্তিদের পৃথক করে ভাবা সম্ভব হচ্ছে না।

রুশো ভেবেছিলেন জনসাধারণের সক্রিয় কর্মে ও সহযোগিতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং গণতন্ত্র সাথক হয়ে ওঠে। রুশো প্রতিটি ব্যক্তিকে এমন গভীর মূল্য দেওয়ায় ওঁর শিক্ষাতত্ত্বে প্রকৃতির কাছে অবাধ স্বাধীনতায় ফিরে যাবার কথা থাকে। তৎসত্ত্বেও কিন্তু সামাজিক কারণেই নিছক ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শিক্ষার সম্ভাবনা থাকে না। সামাজিকভাবে শিক্ষার কথা ওঠে। একেই আমরা বলতে পারি 'চিন্তার সংগঠন' (organisation of thought)। দার্শনিকের ভাষায় 'Organised thought is tho basis of organised action'—সুতরাং শিক্ষা এই চিন্তার সংগঠনকে তৈরি করে এমনভাবে যে, সবাই জীবনে কর্মের মধ্যে কল্পনাকে সার্থক করবার কথা ভাবে।

এই 'চিন্তা সংগঠনে'র সূত্রেই রাষ্ট্র ও শিক্ষার সম্পর্ক বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্নটা হলো শিক্ষা কি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে? না, শিক্ষা ব্যক্তিগত প্রয়াস নির্ভর হবে? এই প্রশ্নের জবাবে গণতান্ত্রিক ও ভাববাদী পণ্ডিতরা আবার দ্বিধাবিভক্ত হন। গণতান্ত্রিক পণ্ডিতদের মতে শিক্ষা ব্যক্তির জন্যে, ব্যক্তির মনুষ্যত্ব প্রকাশের জন্য সহায়কমাত্র। সুতরাং রাষ্ট্রের ব্যাপারে যেমন রাষ্ট্রের কাজ নিছক নঞর্থক তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেই। শিক্ষায় একমাত্র সম্পর্ক ছাত্র ও শিক্ষকের। রাষ্ট্রের তাতে বলবার কিছু থাকতে পারে না। বরং রাষ্ট্রের হাতে শিক্ষার ভার থাকলে রাষ্ট্র শিক্ষার মাধ্যমে তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করবে মাত্র।

চিন্তা সংগঠনের সূত্রে রাষ্ট্রের কর্ম

ভাববাদীদের মতে রাষ্ট্র ও ব্যক্তিতে যেহেতু কোনো বিরোধ নেই, রাষ্ট্রকেই শিক্ষার ভার নিতে হবে। রাষ্ট্রই একমাত্র সংগঠন যা ব্যক্তির

'প্রকৃত সঙ্কল্প' জানে সুতরাং রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বার্থ অনুযায়ী তাদের শিক্ষাকে সংগঠিত করবে।

রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বিষয়ে যতো মতবিরোধ থাকুক না কেনো কার্যত গণতান্ত্রিক পণ্ডিতরাও রাষ্ট্রের সাহায্যের কথা বলেছেন। তাঁদের স্বাধীনতা হরণের ভয়টা কিন্তু নির্ভর করবে রাষ্ট্রের চরিত্রের ওপর। অর্থাৎ জনসাধারণের প্রকৃত লক্ষ্যের ওপর। কারণ রাষ্ট্র স্বৈরচারী হলে তার চেষ্টা হবে শিক্ষাকেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির বাহন করতে। রাষ্ট্র প্রকৃত গণতান্ত্রিক হলে শিক্ষা গণতন্ত্রের স্বাধীনতা ও অধিকারকে সত্য করে তুলবে। কার্যত রাষ্ট্র ও শিক্ষার সম্পর্কে একটি সাধারণ নীতি অনুসরণ করলেই সমস্যা দূর হয়। রাষ্ট্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাহায্য করবে আর সমগ্র সমাজের আদর্শ অনুযায়ী একটি পরিকল্পনা দেবে। কিন্তু পরিকল্পনার পরিচালনা ও ভালোমন্দ নির্ভর করবে ব্যক্তির ওপর।

অনুশীলনী

1. Elucidate the aims of Education.

2. Explain the general significance of Education and relate the roles of schools in society.

3. Analyse the relation between state and education and describe how will you organise education.

4. What is Technical education? Is there any difference between Technical and General education?

দশম অধ্যায়

খ্রীষ্টীয় গীর্জা

১। খৃষ্টধর্ম ও গীর্জার সম্পর্ক (Relation between Christianity and the Church)

খৃষ্টীয় ধর্ম-সংগঠনের নাম গীর্জা। ইংরেজীতে 'চর্চ' (গীর্জা) বলতে যে-কোন ধর্ম সংগঠনকেই বোঝায়। কিন্তু ইতিহাসে গীর্জা শব্দটি খৃষ্টীয় ধর্ম সাধনার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। গীর্জা ও খৃষ্টীয় ধর্ম সংগঠনের এই একাত্মতার কারণ শুধু ঐতিহাসিক নয়, খৃষ্টীয় ধর্মের বৈশিষ্ট্যই হলো সংগঠিত ধর্মের চরিত্র। প্রায় শুরু থেকেই খৃষ্টীয় ধর্মের সঙ্গে সংগঠন অঙ্গাঙ্গী

হয়ে আছে। সংগঠন ছাড়া খৃষ্টীয় ধর্মকে চিনবার আর কোনো উপায় নেই। ইতিহাসে ধর্ম ও সংগঠনের এমন অভিন্নতার কারণ প্রধানত দুটো। প্রথমত, ইহুদী ধর্মের (জুডাবাদ) 'অবতার তত্ত্বে' 'নির্বাচিত জনগোষ্ঠী' ও তাদের 'স্বর্গরাজ্যে'র কল্পনা থাকায় স্বভাবতই তাদের ধর্ম নির্দিষ্ট রূপে সংগঠিত। 'অবতারবাদ' (Messianic cult) ইহুদী ধর্ম থেকে খৃষ্টধর্মে সরাসরি চলে আসে এবং তারই ফলে খৃষ্টভক্তরা নিজেদের নির্দিষ্ট একটি কেন্দ্রে অর্থাৎ সংস্থার বিশ্বাসে সংগঠিত করে। কারণ, তাদের জন্যেই নির্দিষ্ট অবতার জন্মাচ্ছেন এবং তিনি কেবলমাত্র তাদেরই রক্ষা করবেন। সুতরাং তাদের আত্ম-পরিচয় থাকছে কোনো প্রত্যক্ষ সংগঠনে। এমন একটি প্রতিষ্ঠান তাদের প্রয়োজন যা আপদে বিপদে তাদের ভরসা দেবে, বিশ্বাসে দৃঢ় রাখবে। তৃতীয়ত, বিরোধী জগতে খৃষ্টভক্তরা উপস্থিত হওয়ায়, প্রতিমুহূর্তেই একটি কেন্দ্রগত ঐক্যের প্রয়োজন হয়েছে। রাষ্ট্রের চাপে শুধুমাত্র নৈর্ব্যক্তিক ও বিমূর্ত বিশ্বাস নিয়ে দাঁড়াতে দ্বিধা হয়, নিঃসহায়তা থেকে ভয় জন্মায়। কাজেই তারা তাদের আত্মস্থতা খুঁজেছে নির্দিষ্ট কোনো সংগঠনে যা একদিকে তাদের বিশ্বাসকে রূপ দেবে ও আপদে বিপদে আদর্শকে তুলে ধরবে। এই সঙ্গেই অন্য ধর্মের বিরোধিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রয়োজন ছিলো। যেমন রোমে পেগান ধর্মের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষে জিতবার জন্য প্রয়োজন থাকে নিষ্ঠা ও ঐক্যবদ্ধ বিশ্বাসের। নিষ্ঠা ও বিশ্বাস রীতিবদ্ধ থেকেছে তাদের সংগঠনে। কার্যত যে-কোন প্রচারশীল ধর্মেরই নির্দিষ্ট সংগঠন দরকার করে। খৃষ্টধর্ম রাষ্ট্র ও অন্য ধর্মের সঙ্গে সংগ্রাম করে নিজেকে যেহেতু প্রতিষ্ঠা করেছে সুতরাং সংগঠন তার একান্ত ভাবে প্রয়োজন। সংগঠন ব্যতিরেকে খৃষ্টধর্ম কখনোই প্রচারশীল, সম্প্রদায়গত ধর্ম হয়ে উঠতে পারতো না। একই রকমে পারেনি নবীনতম ধর্ম ইসলাম।

অবতারবাদ ও প্রচারশীলতার জন্য সংগঠনের প্রয়োজন

(ক) জুডাবাদের অবতারতত্ত্বে সম্ভাব্য অবতার বা ত্রাণকর্তার কল্পনা অত্যন্ত প্রচলিত ছিলো। এই ত্রাণকর্তা কেবলমাত্র ইহুদীদের প্রভু। তিনি নিজেই তাদের বাছাই করেছেন এবং সমস্ত রকম অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করে এনে দেবেন নতুন এক স্বর্গরাজ্য, যেখানে কেবল আনন্দ ও কেবল শান্তি। আদিতে যীশু তাই সর্ব মানবের ত্রাণকর্তা নন, যাঁর রক্তপাতে জগতের পাপ স্খালন হবে। তিনি

ইহুদীদের জন্যেই জন্মেছেন এবং ইহুদীদেরই থাকবেন। যীশুকে সর্ব-মানবের ত্রাণকর্তা ও ঈশ্বরের একজাত প্রিয় সন্তানে পরিণত করেন সন্ত পল, যিনি নিজে যীশুর শিষ্য নন এবং তাঁকে সশরীরে প্রত্যক্ষ করেন নি। সন্ত পল তাঁর কল্পনায় যীশুর কাহিনীকে ঐতিহাসিক যীশু থেকে অনেক সরিয়ে এনে নতুন কাহিনীতে রূপ দেন। 'কলোসিনীয় পত্রে' (Epistle of the Colossians) তিনি যীশুকে ঘোষণা করেন 'the image of the invisible God, the first born of all creation, in whom were all things created, through whom and unto whom all things were made, who was before all things, and in whom all things consist.' কার্যত, যীশু সন্ত পলের কল্পনায় ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করলেন।

(খ) রোমক রাষ্ট্রের প্রচণ্ড চাপ ছিলো ইহুদীদের ওপর। রোমক সাম্রাজ্যের এলাকাতে যীশুর জন্ম সম্রাট অগস্টাসের আমলে। পুরোনো পৃথিবী থেকেই ইহুদীরা অত্যাচারিত হয়ে এসেছে। নতুন ধর্ম প্রবক্তার মধ্যে তারা তাই নিজেদের মুক্তির আশা দেখে। অত্যাচারিত জনগোষ্ঠীর ধর্ম হিসেবে তাই খৃষ্টধর্ম গোড়ায় ছিলো religio illicita অর্থাৎ অবৈধ ধর্ম। রাষ্ট্র এই ধর্মকে গোড়ায় সমর্থন দেয়নি। বরং ভেবেছে খৃষ্ট ও খৃষ্টভক্তরা বুঝি রোমক সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে টলাতে চাচ্ছে। তাই অত্যাচারের বাঁধ খুলে দেওয়া হয় ও যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় প্রাণ দিতে হয়। অত্যাচার কিন্তু খৃষ্টভক্তদের ভবিষ্যত জয় সম্পর্কে আস্থা দেয় ও ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করে। সন্ত পল তাই লেখেন 'We glory in our tribulations also knowing that tribulations worketh patience, and patience experience; and experience hope: and hope maketh not ashamed.'

(গ) রোম সাম্রাজ্যে, বিশেষত রাজধানী রোমে তখন বিভিন্ন ধর্মের লীলা চলেছে। গ্রীস ও রোমের পুরোনো ধর্ম, জিউস ও অলিম্পসের দেবতা-কেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠান তখন প্রায় মৃত। প্রাচ্য দেশ থেকে এসেছে কাইবেল ও আইসিস-এর পূজাবিধি (মিশর থেকে) ও সূর্যদেব মিত্রর উপাসনা (পারস্য থেকে)। রোম সম্রাট অবশ্য ধর্ম বিষয়ে নির্বিকার ছিলেন। সমস্ত ধর্মেরই অবাধ সুযোগ ছিলো রোমে। এমনকি সন্ত পলের খৃষ্টধর্ম প্রচারকেও রোমক শাসনকর্তা (গভর্নর) গ্যালিও বাধা

দেননি। তাঁর একটিমাত্র বক্তব্য ছিলো যেনো কোনোক্রমেই শান্তিভঙ্গ না হয়। প্রসারধর্মী তত্ত্ব হিসেবে খৃষ্টধর্ম প্যাগানবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং (ক) একমাত্র খৃষ্টধর্মই শ্রেষ্ঠ এবং (খ) মানবমুক্তির চাবিকাঠি তাদের হাতে—তত্ত্ব দুটি দাপটের সঙ্গে প্রচার করতে থাকে খৃষ্টধর্মের প্রচারকরা।

ভবিষ্যত স্বর্গরাজ্য ও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের আত্মবিশ্বাস অত্যাশ্চর্যভাবে লিপিবদ্ধ আছে খৃষ্টজন্মের দুশো বছর পরেকার এক সংলাপে। লেখক বলেছেন একদা এক শরতের দিনে তাঁর খৃষ্টান বন্ধু ওক্টাভিয়স (Octavius of Memecius Felix) ও তাঁদের প্যাগান সঙ্গী কিসিলিউসের এক বিতর্ক হয়েছিলো। টিবার নদীর তীরে পায়চারী করতে করতে এই তর্ক চলে। কিসিলিউস বলছেন 'কোথায় তোমাদের সেই ঈশ্বর যিনি এই জীবনে তোমাদের সাহায্য করতে পারেন না অথচ পর জীবনে সাহায্য করতে পারেন? তোমাদের ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়াই তো রোমকরা শাসন করছে, পরিচালনা করছে, সারা পৃথিবীর সম্পদ লুঠে নিচ্ছে, এমন কি তোমাদের ওপরেও প্রভুত্ব করছে না কি? আর তোমরা, এখন শঙ্কা ও অবরুদ্ধ বিশ্বাসে জীবনের সমস্ত আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছো।......তাই যে দেবতাদের তোমরা অস্বীকার করো তার ভয়ে তোমরা জুজু হয়ে আছো।...তাই এমনভাবে নিঃসহায় তোমরা যে, যেমন মাথা তুলতে পারো না তেমনি এই মুহূর্তে বাঁচতেও পারছো না।'

ওক্টাভিয়স জবাবে গর্ব করে জানাচ্ছে সক্রাটেস হলেন একটি এথেনীয় ভাঁড়।

"We despise the bentbrows of the philosophers, whom we know to be corruptors and adulterers and tyrants, and ever eloquent against their own vices. We who bear wisdom, not in our dress but in our mind, we do not speak great things but we live them; we boast we have attained what they sought with the utmost eagerness and have not been able to find.'

বাইরের পোষাকে নয়, নিজেদের মনে জ্ঞান সঞ্চিত আছে এই গর্বই খৃষ্টানদের আত্মবিশ্বাস ও সংঘবদ্ধতার মূল কারণ। এবং সংঘবদ্ধতা ও সমর্পিত-প্রাণ বিশ্বাস থেকে জন্ম নেয় গীর্জা সংগঠন।

খৃষ্টীয় ধর্ম ও গীর্জা-সংগঠনের ঐকান্তিক যোগের কার্য-কারণ নিহিত আছে ওপরের আলোচিত তিনটি প্রধান বক্তব্যে। এই ধর্ম ও সংগঠন

যে গোড়া থেকেই অভিন্ন আমাদের এই বক্তব্যের স্বপক্ষে পৃথিবী বিখ্যাত পণ্ডিত ট্রোএল্টসের একটি উক্তি অনুধাবনযোগ্য। তিনি লিখেছেন 'Even in the Apostolic Age, the idea of Kingdom of God become merged with that of the Church, and the idea of the coming of the Kingdom of God was replaced by the exaltation of the Church.' ওঁর মতে ঈশ্বরের রাজত্ব ও গীর্জা এক হয়ে আছে।

২। গীর্জা কি? ও কেনো? (**Why and what of the Christian Church**)

যে-কোনো ধর্ম-সংগঠনকেই যদি গীর্জা বা ইংরেজীভাষায় 'চর্চ' বলা হয় তবে সংগঠিত প্রসারশীল ধর্মের চরিত্রেই সংগঠন থাকে। ধর্মের সংগঠন বা গীর্জা বলতে বোঝায় দুটি মূল ঐক্যবদ্ধতা বা সংগঠন। একটি হচ্ছে, আদর্শ বা ভাবনার সংগঠন (Organisation of ideas) ও অন্যটি হলো বিশ্বাসীদের, ভক্তদের সংগঠন (Organisation of men)। এই দুটি সংগঠন থাকলেই গীর্জা গড়ে। প্রাথমিক ভাবে গীর্জা তাই কোনো আদর্শের কেন্দ্রে সংহত হয় এবং এই বিশ্বাসের আকর্ষণেই লোকেরা সংঘবদ্ধ হতে থাকে। যতোদিন পর্যন্ত ভাবনা বা আদর্শের সক্রিয় প্রভাব থাকে ততোদিন লোকেরা কেন্দ্রগত ঐক্যে স্থির থাকে এবং তাদের বিশ্বাসকে চারপাশে ছড়ায়।

খৃষ্টীয় গীর্জা সংগঠনের কেন্দ্র তাই যীশুখৃষ্ট ও তাঁর জগত ও জীবন বিষয়ক বক্তব্য। এই বিশ্বাসের চারপাশেই নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ কল্পনা ও আদর্শের জীবনযাত্রা তৈরি হয়েছিলো।

প্রথম 'হুইট সানডে'তে (Whit Sunday), পেন্টেকোস্টের (Pentecost) ভোজের সময় জেরুজালেমে 'দিব্য সত্তা' (Holy-Spirit) ভর করেন শিষ্যদের (Apostle) ওপর। বাইবেলের ঘটনায় পাওয়া যাচ্ছে,

'Suddenly their came from heaven a sound like the rushing of a violent wind, and it filled the whole house where they were sitting. And there appeared to them tongues like flames of fire, divided among them and resting on each one. And they were all filled with the Holy Spirit'

(এক্টস, ii, 2-4)। ওই দিনেই সন্ত পীটারের প্রচারে জেরুজালেমে তিন হাজার নরনারী দীক্ষা গ্রহণ করে ও খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের পত্তন হয়। মাথু লিখিত সুসমাচারে আছে (২৮,২৯), যীশু বলেছেন, 'এখন তাই যাও,

সমস্ত জাতিকে আমার শিষ্য করো।' সন্ত স্টিফেনকে পাথর ছুঁড়ে মারবার ঘটনার পরেই জেরুজালেমের গীর্জা সংগঠনের খৃষ্টানেরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা প্রথমে খৃষ্টের বাণী প্রচার করেন ইহুদীদের মধ্যে ও পরে জেণ্টাইলদের মধ্যে। অল্পদিনের মধ্যে সমগ্র রোম সাম্রাজ্যে এবং এমনকি সাম্রাজ্যের বাইরেও খৃষ্টান সম্প্রদায় তৈরি হয়ে যায়। প্রথম প্রচারকরা গোড়ায় শহরে শহরেই উপস্থিত হন এবং ধর্মের পত্তন করেন। তাঁদের শহর-কেন্দ্রিক প্রচারের কারণেই আদি গীর্জা তার শাসন-মূলক সংগঠনটি তৈরি করে রাষ্ট্র শাসন-ব্যবস্থার অনুরূপ। মৌল সংগঠনটি হচ্ছে শহরের খৃষ্টান সম্প্রদায়।

প্রত্যেক শহরেই এই সম্প্রদায় ছিলো। সম্প্রদায়ের গীর্জার প্রধান পরিচালক হলেন বিশপ এবং তাঁকে কেন্দ্র করে থাকতেন প্রেসবাইটার ও ডীকনরা। চারপাশের অঞ্চলগুলো নির্ভর করতো শহরের ওপর। প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকটাতে সর্বত্রই এই ছকটি কাজ করতে থাকে। ছকটি ছিলো তিনটি স্তরে বিভক্ত। সবার ওপর বিশপ, তার তলায় প্রেসবাইটর ও সর্বনিম্নে ডীকন। ১০৭ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত সন্ত ইগনাটিয়সের সাতটি পত্রে এই কাঠামোর নির্দেশ আছে। ওঁর কাছে গীর্জা সর্বদাই স্তর বিভক্ত (hiearchical) অর্থাৎ অবস্থানের তারতম্য ভেদ বর্তমান। ওঁর মতে প্রত্যেক গীর্জার বিশপ 'ঈশ্বরের বদলে শাসন করেন'। তিনি লিখেছেন, 'Let no one do any of the things which concern the Church without the bishop......wherever the bishop appears, there let the people be, just as wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church' এবং ওঁর মতে এই সঙ্গেই গীর্জার কাজ হচ্ছে 'ইউক্যারিস্ট' অনুষ্ঠান পালন করা কারণ এই অনুষ্ঠানটি হলো 'অমরত্বের ওষধি'। সন্ত ইগনাটিয়সের চিন্তায় তখনো গীর্জা বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠান নয়। গীর্জা তখনো ইউক্যারিষ্ট পালনের ছোটছোট নির্দিষ্ট সম্প্রদায় মাত্র। তখনো পর্যন্ত গীর্জায় এই 'ইউক্যারিস্ট' অনুষ্ঠানই আত্মা, বাহ্য সংগঠন ততো মূল্যবান নয়।

স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গেও গীর্জার বিস্তৃত ঐক্যের কথা থাকে। এ-বিষয়ে আলোচনা করেন নিহত সন্ত সাইপ্রিয়ান। তিনি মনে করতেন যে সমস্ত বিশপরাই একটা 'এপিসকোপেটে' (Episcopate) অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি গীর্জাই পূর্ণ, কেউ অংশ নয়। তিনি লেখেন যে

'The Episcopate is a single whole, in which each bishop enjoys full possession. So is the Church a single whole, though it spreads far and wide into a multitude of Churches as its fertility increases'. অর্থাৎ যদিও অনেক গীর্জা সংগঠন তৈরি হয়েছে তবু গীর্জা মাত্র একটিই, অনেক এপিসকোপাই হয়েছে কিন্তু এপিসকোপেট মাত্র একটি।

প্রচারশীল ধর্ম হিসেবে এসময় থেকেই (এমন কি স্বয়ং যীশুই যেহেতু নিহত) শহীদের রক্তদানের প্রসঙ্গ খৃষ্টধর্মে প্রধান স্থান জোড়ে। কারণ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিজেদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করতে হলেই এই প্রসঙ্গ ওঠে। তাই যীশুর মতবাদের জন্য, তা প্রসার করবার জন্য মৃত্যুবরণকে বলা হয়েছে 'লাল শহীদত্ব'।

সন্ত সাইপ্রিয়ানের চিন্তায় ছিলো বিশপ যদিও ঈশ্বরের মতো সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত, তবু তিনি সবার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে কর্তব্য স্থির করবেন। সমিতিই হলো ঈশ্বর-নির্দিষ্ট পরিচালনার সংগঠন। সুতরাং ক্যাথলিক গীর্জা মূলতই 'সমিতিবদ্ধ' (conciliar)। গীর্জায় তাই একেকেন্দ্রিকতা যেমন নেই, তেমনি নেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। সর্বত্রই ঐক্য ও সংহতি কাজ করে। প্রতিটি ব্যক্তিই স্বাধীন কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়। কারণ তারা প্রেমে, বিশ্বাসে এবং পূজাবিধির ঘনিষ্ঠ আদান প্রদানে ঐক্যবদ্ধ।

প্রথম সমিতির খবরে আছে (এক্টস, ১৫), জেরুজালেমে সংঘটিত সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কেমন ভাবে জেণ্টাইলদের মুসার নিয়ম (Law of Moses) মানানো হবে। খৃষ্ট ধর্মের সংগঠনে বৈপ্লবিক একটি ঘটনা ঘটে ৩২২ খৃষ্টাব্দে। সৈন্যবাহিনী সহ সম্রাট কনস্টান্টিন একদিন ফ্রান্সের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একবার তিনি আকাশে মুখ তুলে দেখতে পেলেন আলোর একটি ক্রুশ আঁকা রয়েছে। সেই ক্রুশে লেখা আছে, 'এই প্রতীকে জয় করো'। এই দিব্য দর্শনের ফলে তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং খৃষ্টধর্ম রোমক সাম্রাজ্যের স্বীকৃত রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হয়।

গীর্জা সংগঠনের প্রধান দুটি ধারা। একটি পূর্বদেশীয় ও অন্যটি পশ্চিম দেশীয়। পূর্বদেশীয় ধারাটির নাম প্রাচীন বা রক্ষণশীল গীর্জা (Orthodox Church) ও পশ্চিম দেশীয় ধারাটির নাম ক্যাথলিক গীর্জা (Catholic Church)। ষোড়শ শতাব্দীতে পশ্চিমের ক্যাথলিক গীর্জায় ভাঙন ধরে ও প্রোটেস্টাণ্ট গীর্জার সূত্রপাত হয়। তারপর খৃষ্টীয় গীর্জা সংগঠন বিভক্ত

দেশে আরো বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে জাতীয় গীর্জার রূপ নিয়েছে। কিন্তু খৃষ্টধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য গীর্জা সংগঠনটি থেকে গেছে।

গীর্জার ইতিহাসকে একটি রেখাচিত্রে ছকলে দাঁড়াবে

(শুধুমাত্র ইংলণ্ডের ইতিহাসে)

খৃঃ পূঃ | খৃষ্টের জন্ম

(প্যাগানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম)

— ১০০

— ২০০

— ৩০০ খৃষ্টধর্ম সাম্রাজ্যের ধর্ম হয়েছে। নিসিয়ার কাউন্সিল

— ৪০০ সন্ত অগাস্টিন

বর্বরদের আক্রমণ — ৫০০ সন্ত জেরোম

— ৬০০ সন্ত বেনেডিক্ট (সন্ন্যাস ও ধর্ম)

— ৭০০ বিড

— ৮০০ এলকুইন, শ্রেষ্ঠ এলফ্রেড

— ৯০০ নর্স আক্রমণ

— ১০০০ মধ্যযুগ

(পোপ ক্ষমতার শিখরে)

— ১১০০ সন্ত বের্ণার্ড

— ১২০০ সন্ত ফ্রান্সিস

— ১৩০০ সন্ত একুইনস (স্কলাস্টিক দর্শন)

— ১৪০০ হ্বাইক্লিফের বাইবেল

— ১৫০০ মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার

রেনেসান্স ও রেফর্মেশ্যন — ১৬০০ লুথার ও ক্যালভিন। প্রথম প্রার্থনা পুস্তক। বাইবেলের স্বীকৃত পাঠ

— ১৭০০ পঞ্চম প্রার্থনা পুস্তক

— ১৮০০ ওএজলী (মেথোডিজ্‌ম)। বাইবেল সমিতির প্রতিষ্ঠা। ল্যামবেথ কনফারেন্স

ক্যাথলিক নবজাগরণ — ১৯০০

বাইজেনটিয়মে খৃষ্টধর্ম রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হওয়ায় খৃষ্টধর্মের যে পরিবর্তন ঘটে তার প্রথম প্রকাশ হয় ধর্মের ক্ষেত্র বিষয়ে। এতোদিন পর্যন্ত পার্থিব

জগতের কোনো ক্ষমতার সঙ্গে যোগ না-থাকায়, বিশেষত অত্যাচারিতের ধর্ম হওয়ায় খৃষ্টধর্মের সমস্ত ঝোঁক ছিলো আন্তর্জাতিক বিশ্বাস, আবেগ ও আত্মদানের ওপর। কিন্তু যেই পার্থিব ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া গেলো, যেই রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের সঙ্গে এলো সমস্ত ধর্মের ওপর একচ্ছত্র একাধিপত্য, খৃষ্টধর্ম বিশ্ব সংসারকে দুভাগে ভাগ করে নেয়। একটা 'ঈশ্বরের জগত' ও অন্যটা 'ইন্দ্রিয়ের' জগত বা পার্থিব জগত। ঈশ্বরের জগতের ওপর গীর্জার পূর্ণ অধিকার আর পার্থিব জগতের ওপর অধিকার রাজা ও রাণীর, কিন্তু ঈশ্বরের (যীশু খৃষ্টর) প্রতিনিধি হিসেবে। কালক্রমে গীর্জা শুধু ঈশ্বরের জগতের ওপরেই নয়, পার্থিব জগত অর্থাৎ রাজারাণীর ওপরেও কর্তৃত্ব দাবি করে। ক্ষমতার দাবিতে ঐশ্বরিক শৃঙ্খলা (Divine order) জাগতিক শৃঙ্খলা (Temporal order) কেও নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। গোটা মধ্যযুগ ধরে পশ্চিম য়ুরোপে ক্যাথলিক গীর্জার দাপট চলে। পূর্বদেশের রক্ষণশীল গীর্জার ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। গীর্জার প্রভুত্বের ফলে ক্রমশ বিভিন্নদেশে প্রতিবাদ উঠতে থাকে ও ক্যাথলিক গীর্জা জাতীয় চাপে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। জাগতিক ক্ষমতার সংগ্রামে গীর্জা বহুকাল জয়ী থাকলেও (ধর্মের ভয় দেখিয়ে) শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের কাছে মাথা নিচু করতে বাধ্য হয়। গীর্জার ইতিহাসে পশ্চিম য়ুরোপে এটাই সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা যে রাষ্ট্রের সমর্থনেই গীর্জার প্রভুত্ববোধ বাড়ে আবার রাষ্ট্রের ধাক্কাতেই তার জাগতিক ক্ষমতা চূর্ণ হয়।

৩। জীবনে গীর্জার ভূমিকা (Role of Church in Life)

খৃষ্টীয় গীর্জা খৃষ্টীয় চিন্তার সংগঠক হিসেবে য়ুরোপের জীবন ও সংস্কৃতির মৌলিক কেন্দ্র। গীর্জা সংগঠনেই খৃষ্টীয় তত্ত্বের জন্ম এবং তিনটি প্রধান সংস্কৃতির ধারাকে নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত রেখে গীর্জা য়ুরোপের প্রাণ-শক্তিকে উদ্বোধিত করে। য়ুরোপের সবরকম চিন্তা, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও সামাজিক-বিন্যাস সমস্তই খৃষ্টতত্ত্বের দ্বারা জারিত। গ্রীক-রোমক সভ্যতার ভিত্তিতে খৃষ্টতত্ত্ব গীর্জা সংগঠনের মধ্য দিয়ে নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পত্তন করে, সারা মধ্যযুগ ব্যেপে সংস্কৃতির শিকড় জীবনের গভীরে প্রবেশ করায় বর্তমানে আধুনিকদের চিন্তাধারার পেছনেও অবলম্বন হিসেবে থাকে। এককথায় য়ুরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতি মূলতই গীর্জার দান।

খৃষ্টীয় গীর্জা-সংগঠন রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর য়ুরোপের সমাজ-জীবনের ধারক ও বাহক হয়। বর্বরদের আক্রমণে ঘুণধরা রোমক সাম্রাজ্য ধ্বসে পড়তে থাকে। বর্বরদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে খৃষ্টীয় গীর্জা তাদের নিজের প্রভাবের মধ্যে আনে ও প্রাচীন জনসমাজ নতুন বর্বর রক্তের মিশ্রণে পুষ্ট হয়।

খৃষ্টীয় গীর্জা দুভাবে তার কর্ম সম্পাদন করে। প্রথমত, অতীন্দ্রিয় সত্তা অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে প্রাণের যোগ প্রতিষ্ঠা করে ও পরজীবনের কল্পনায় মানুষকে বিশ্বাস ও কর্মের প্রেরণা জোগায়। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীতেই মানুষে মানুষে সামাজিক সংগতির ভিত্তি গড়ে জীবনের ঐক্যবদ্ধ কল্পনা ও বিশ্বাসের সত্যে।

প্রথম বক্তব্যে আছে আদি পাপ ও তজ্জানিত পতনের কথা। ঈশ্বরের সন্তান আদম ও ইভ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে আমাদের পূর্বপুরুষ হিসেবে পাপের পত্তন করেন। তাঁদের সম্মিলিত পাপেই মানুষের জন্ম, আদম ও ইভের স্বর্গ থেকে বিদায়। কিন্তু এই পাপ ও পতনের ফল কি চিরকাল স্থায়ী হবে? মানুষের মুক্তির কি কোনো পথ নেই? এই প্রশ্নের জবাবেই দ্বিতীয় অংশটি পাওয়া যায় যে পারস্পরিক প্রেম ও মৈত্রীতে জীবনের সংগঠন গড়তে হবে। তারপর ঈশ্বরের পুত্র নিজের রক্তদানে তাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করবেন। রক্তদান ঘটে যাবার পর প্রতিটি মানুষকে যীশুর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে পাপস্খালনের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। এই দ্বৈত বক্তব্য নিয়ে খৃষ্টীয় সংগঠনে প্রচুর বাদানুবাদ হয়েছে। ফলে নানা গোষ্ঠী উপগোষ্ঠীতে তারা বিভক্ত হয়ে গেছে।

বাইবেলের নতুন অংশে আছে পাপের কারণে ঈশ্বর ও মানুষে ফারাক হয়ে গেছে। নিজের চেষ্টায় মানুষ এই বিরোধ দূর করতে পারে না কারণ পাপই বিরোধটা তৈরি করছে। ঈশ্বর তাই নিজেই সচেষ্ট হন। তিনি মানুষ হন, ক্রুশবিদ্ধ হন, মৃতদের থেকে ওঠেন এবং তার দ্বারাই সমগ্র মানবসমাজকে পাপ ও বন্ধন থেকে মুক্তি দেন। মুক্তির পথ এই সূত্রে নির্দেশিত হলেও নানা বিরোধী মতবাদ তৈরি হতে থাকে। গীর্জার প্রধান কাজই তখন হয় নিজস্ব বক্তব্য বলা ও বাইবেল ব্যাখ্যা করা। যীশু খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব ও মানবত্ব নিয়ে ভক্তরা প্রচুর বাদানুবাদ করেন এবং তার ফলে গীর্জার নানা পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সন্ত পল 'অংশগ্রহণে'র তত্ত্বে মুক্তিকে ব্যাখ্যা করেন। যীশু আমাদের দারিদ্র্যের

অংশ নিয়েছেন যাতে আমরা তাঁর ঐশ্বর্য্যের ভাগ নিতে পারি। তিনি লিখেছেন 'Our Lord Jesus Christ, though he was rich, yet for your sake became poor, that you through his poverty might become rich' (২, কোরিন্থিয়ানস, ৮, ৯,)। সন্ত জন প্রায় হুবহু একই কথা জানান। যীশু বলেছেন 'The glory which Thou, Father, gavest me I have given to them, that they may be one, just as we are one; I in them, and Thou in me, that they may be perfectly one.' (জন, ৮, ২২-৩)। সন্ত এথানসিঅস বলেন 'God became man that we might be made God.'

কিন্তু 'দেবতায় পরিণত' হবার কথায় নানা সমস্যা থাকে। যদি সত্যিই এমন ঘটনা সম্ভব হয় তবে ত্রাণকর্তা যীশুকে এক সঙ্গে ঈশ্বর ও মানুষ হতে হবে। কারণ ঈশ্বর ছাড়া কেউ মানুষকে মুক্তি দিতে পারবে না। সুতরাং যীশুকে যদি রক্ষাকর্তা হতে হয় তবে তিনি নিশ্চয়ই স্বয়ং ঈশ্বর। আবার একমাত্র সম্পূর্ণ মানুষ হলেই তিনি মানুষের জীবনে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। যীশুই তাই ঈশ্বর ও মানুষের সেতু হলেন। জন-লিখিত সুসমাচারে তাই পাচ্ছি 'Hereafter you shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man!' শুধু মাত্র পরীরাই স্বর্গে যাতায়াত করেনি, মানুষও করতে সক্ষম হয়। এই বক্তব্য থেকেই প্রতিবাদী নানা তত্ত্ব তৈরি হয়। যেমন একটি তত্ত্বে বলা হচ্ছে যীশু নিশ্চয়ই ঈশ্বর থেকে কিছু খাটো (আরিয়ানিজম); তাঁর ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বে এমন একটা বিভেদ যে তিনি দুটো অংশে দুই পুরুষ হন (নেস্টোরিয়ানিজম); তিনি কার্যত পুরো মানুষ নন (মোনোফাইজিটিজম, মোনোথেলিটিজম)। বিভিন্ন খৃষ্টীয় সঙ্গীতিতে এই সব তত্ত্ব বিষয়ে খৃষ্টানরা মতামত স্থির করেন এবং পরবর্তী-কালের গীর্জাসংগঠনের ধারা স্থির করেন। সমগ্র ইতিহাস জুড়ে গীর্জাসংগঠন যীশু ও গীর্জার বিশ্বাস বিষয়ে মতামত দিয়ে খৃষ্টীয় ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করছে।

মধ্যযুগে খৃষ্টীয় গীর্জা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কর্তব্যও পালন করছে। রাজনৈতিক কর্তব্যের মধ্যে আমরা জানি জগতের শাসন বিষয়ে গীর্জা সম্রাটদের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করছে। গীর্জার অর্থনৈতিক ভূমিকাও ছিলো। গীর্জা নিজেই বিরাট সামন্ত ভূস্বামীতে পরিণত হয়। সামন্ত প্রথার সঙ্গে গীর্জার যোগ ঘটায় খৃষ্টধর্ম

সাংসারিক ক্ষমতার অংশীদার হয়। পৃথিবী বিখ্যাত জর্মান সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স হেবার তাই দেখিয়েছেন যে পুঁজিবাদের সঙ্গে প্রোটেষ্টান্টবাদের সত্তা জড়িত।

খৃষ্টীয় গীর্জা সামাজিক রীতিনীতি, জীবনযাত্রা প্রণালী, ও আচার-ব্যবহারকেও সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ খৃষ্টধর্ম মানুষের জীবনকে একটি পরিপূর্ণ আদর্শে গড়তে চায়। গীর্জাও তাই সেই চিন্তার বাহন হিসেবে সমাজের নিয়ন্তা হয়।

গীর্জা ছিলো সংস্কৃতি ও শিক্ষার পীঠস্থান। খৃষ্টীয় যাজকরা তাঁদের মঠে মঠে পুঁথি লিখেছেন, অনুলিপি করেছেন, ধ্রুপদী গ্রীক সভ্যতার শাস্ত্রাদির চর্চা করেছেন। বিদ্যালয় চালিয়েছেন, পাঠ্যতালিকা তৈরি করেছেন, গ্রামে গ্রামে শিক্ষা প্রচার করেছেন। গীর্জার প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণাতেই বিখ্যাত বাইজেণ্টীয় দেয়ালচিত্র, আইকন, রোমানেস্ক ও গথিক গীর্জা গড়ে ওঠে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য বিশিষ্ট দেশজ রীতির সঙ্গে খৃষ্টতত্ত্বের সংমিশ্রণে নতুন প্রাণপ্রবাহে উৎসারিত হয়। অধ্যাপক ম্যাকাইভর ও পেজ লেখেন '...the church is at the same time a fellowship, a brotherhood to believers a basis, of social intercourse.' গীর্জা সমস্ত খৃষ্টান জীবনের কেন্দ্র হওয়ায় গীর্জার মাধ্যমেই ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় কারণ প্রতিটি ব্যক্তিই যেহেতু খৃষ্টের আত্মদানে অংশ গ্রহণ করছে সেহেতু তারা একটি মৌলিক ঐক্যে গ্রথিত। ধর্মের এই মৌলিক সম্পর্কে, পরস্পরের প্রতি প্রেমে (যেহেতু ঈশ্বর প্রেমেই মানুষকে তাঁর একমাত্র সন্তানকে দান করেন ও যীশু প্রেমেই আত্মদানের পথে যান) খৃষ্টানরা নিজেদের মধ্যে দৃঢ় সামাজিক ঐক্য বোধ করে। গীর্জা এই ঐক্যের তত্ত্ব ও কর্ম তৈরি করে ও সামাজিক আচরণাদির নির্দেশ দেয়। গীর্জার জীবনে অংশ গ্রহণের মধ্যেই নিজেদের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক খৃষ্টানরা জানতে পারে।

এককথায় বলা যায়, খৃষ্টীয় গীর্জা প্রতীচ্য দেশে সমগ্র জীবনের পরিচালক ছিলো।

৪। গীর্জা কি সামাজিক অত্যাচারের মাধ্যম? (Is Church a tool of social oppression)?

য়ুরোপের ইতিহাসে খৃষ্টীয় গীর্জার নানা রূপান্তর আছে। ক্ষমতাহীন অত্যাচারিত সংগঠন থেকে হঠাৎ একদিন গীর্জা সম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হয়। রাষ্ট্রশক্তিও গীর্জার দৈবশক্তির কাছে মাথা নীচু করে। তারপর

দীর্ঘ মধ্যযুগ ধরে গীর্জা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার পীঠস্থান হিসেবে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ভূমাধিকারী হিসেবে গীর্জা একই রকমে জনসাধারণকে শোষণ করে। গীর্জার অবশ্য কিছুটা বাড়তি সুবিধে ছিলো। ধর্ম ও মুক্তির নামে তারা সহজেই অন্যান্য সামন্তবর্গের চাইতে অনেক বেশী সুবিধে পেয়েছে। যেমন মধ্যযুগের একপর্বে পোপেরা 'মুক্তিপত্র' (salvation paper) বিক্রি করে প্রচুর উপার্জন করতেন। 'মুক্তিপত্র' হচ্ছে গীর্জার শীল-মোহর করা একটি কাগজ টাকা দিয়ে যা সংগ্রহ করতে হতো। এই কাগজে লেখা থাকতো ক্রেতা মৃত্যুর পর স্বর্গে যেতে পারবে।

যীশু ঘোষণা করেছিলেন স্বর্গের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু কোথায় হবে? স্বর্গে না মর্ত্যে? এ বিষয়ে নানা মতদ্বৈধ থাকে। কেউ বলেন মৃত্যুর পর স্বর্গে সমস্ত কল্পনার সিদ্ধি হবে। অন্যরা ঘোষণা করেন যে, ইহজগতেই ঈশ্বরের স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এই স্বর্গরাজ্যের প্রচারে গীর্জা দুর্বল মানুষদের মন নিয়ন্ত্রণ করে।

খৃষ্টীয় ধর্মের সংগঠন গীর্জার সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চরিত্র ও কর্ম জড়িত থাকায় বহু পণ্ডিত, বিশেষত বামপন্থী পণ্ডিতরা যেমন কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস, বিশ্লেষণ করে দেখতে চান যে কার্যত গীর্জা একটি প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠান। গীর্জা সমাজের প্রগতিকে বাধা দিচ্ছে ও মনুষ্যত্বের সমস্ত সম্ভাবনাকে মিথ্যা স্তোক দিয়ে ভুলিয়ে রাখছে। মার্কস বলতে চান যে ধর্মসংগঠনগুলো ইহজগতকে ভুলিয়ে পর জগতের কথা তোলে, বর্তমানের দৈন্য দুর্দশার কার্যকারণকে ভাগ্যের হাতে তুলে দিয়ে ভবিষ্যতের রঙিন কল্পনায় লোকের সৃষ্টিক্ষমতাকে থামিয়ে রাখে। পুরুষকারের বদলে ভাগ্যের জয় ঘোষনায় একালের ও ইহজীবনের অত্যাচারী শোষকদের ক্ষমতাকে কায়েম রাখে। অসহায় দুর্বল ভীরু লোকদের স্বর্গরাজ্যের প্রলোভনে জানতে দেয়না যে তাদের দারিদ্র্যের, অধঃপতনের সত্য কার্য কারণ কি। ধনী ও বলশালীদের ঈশ্বরের নামে ঘিরে রেখে গীর্জা সাধারণ লোকদের থেকে তাদের তফাৎ করে রাখে।

মার্কস এঙ্গেলসের এই সমালোচনায় গীর্জার কর্মচ্যুতির সত্য প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু অপরাধটা ধর্মের নয়, অপরাধ প্রধানত সংগঠক ও সংগঠন পরিচালদের। গীর্জার চরিত্রেই ছিলো জীবনের সমস্ত স্তরকে নিয়ন্ত্রণ করবার কথা। তাই সহজেই গীর্জা-সংগঠন ব্যক্তির জীবনের ইহ জাগতিক

কর্মেও হস্তক্ষেপ করে। এবং এই কর্মের এমনই গতি যে ইহ জাগতিক ব্যাপারে লিপ্ত হলে ধর্মের অংশে ফাঁকি পড়তে থাকে। বিশেষত গীর্জা যে মুহূর্তে রাষ্ট্রীয় সমর্থন পায় এবং খৃষ্টধর্ম রাষ্ট্রের ধর্মে পরিণত হয়, সে-মুহূর্তে স্বভাবতই গীর্জা কর্তৃত্বের সুরে নির্দেশ দিতে থাকে। ইতিপূর্বেই আমরা বলেছি যে প্রচারশীল ধর্মের সঙ্গে ইহজাগতিক ক্ষমতার যোগাযোগ হতে বাধ্য। কারণ খৃষ্টধর্ম নিজেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব মনে করায় অন্য ধর্মের ওপর প্রভুত্ব বিস্তারের কথা থাকে। কিন্তু ইহ জীবনের দারিদ্র্য, দৈন্য থেকে দৃষ্টি সরিয়ে শোষণকে কায়েম করবার প্রসঙ্গ মার্কস এঙ্গেলসের বক্তব্য মতো কিছুটা সত্য এবং কিছুটা মিথ্যা। কারণ খৃষ্টধর্ম অন্যান্য ধর্মের মতোই মানুষের আত্মার কথা বলে। ইহ জীবনকে সংগঠিত করবার ভার মানুষের নিজের। খৃষ্টধর্ম তাতে মানুষের শোষণকে কখনোই সমর্থন করে না। গীর্জা জাগতিক কর্তৃত্বের বক্তব্য ছেড়ে দিলেই তার বিরুদ্ধে আপত্তির কিছু থাকবে না।

অনুশীলনী

1. What is a church? What are its main functions?

2. Explain the significance of Church in the life of men?

3. 'But the Church is at the same time a fellowship, a brotherhood of believers, a basis of social intercourse'—Discus.

4, What is church? Is Church a tool of social oppression?

একাদশ অধ্যায়

ধর্ম

১। ধর্মের তাৎপর্য কি? (The meaning of religion)

সংস্কৃতে 'ধর্ম' শব্দটির উৎপত্তি 'ধৃ' ধাতুর সঙ্গে 'মন্' প্রত্যয় যোগ করে। ধাতুগত অর্থে ধর্ম শব্দটির অর্থ 'ধারণ করা'। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে কী ধারণ করা হবে? ভারতীয় দার্শনিকেরা জবাব দেন ধারণ করতে হবে নিজেকে। নিজেকে ধারণ করার অর্থ সত্তার প্রকাশ। সাধারণভাবে প্রতিটি নরনারীই সত্তাবান কারণ তারা দেহধারী জীব এবং জীবনের নিত্যকর্ম থাকে যার কিছুটা জৈবিক ও কিছুটা মানসিক। সুতরাং রামবাবু

বা শ্যামবাবুর সত্তা শুরুতেই স্বীকৃত। প্রতিটি নরনারীর অস্তিত্ব স্থানকালে স্বীকৃত হওয়ায়, সত্তার অর্থকে বলা চলে বাঁচা। যে কোনো লোকেরই বাঁচার জন্য সত্তা, থাকতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে ধর্মের অর্থ হবে সত্তাকে ধারণ করা। অথচ যার সত্তা আছে সে তো নিজেকে ধারণ করেই সত্তাবান। নতুন করে তখন আর ধারণ করবার কিছু থাকে না।

কিন্তু আমরা বলেছি ধর্ম আমাদের ধারণ করতে শেখায়। প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষ বাঁচে মরে, তার বাঁচা মরাটাই সত্তার প্রকাশ। প্রাকৃতিক নিয়মে যা আপনা থেকেই সত্য তাকে বিশেষ তাৎপর্য দেবার কোনো কারণ থাকে না। অথচ ধর্মের এমন সংজ্ঞা তৈরি করলে প্রাকৃতিক কার্যকারণের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটে। ধারণ করার প্রসঙ্গে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, ধারণ করতে বলা হচ্ছে সচেতনভাবে। আর যাই সচেতনভাবে করতে হয়, তা আপনা থেকে ঘটে না। ধর্মের সংজ্ঞা সত্য হলে তাই বোঝা দরকার, সত্তার প্রকাশ আপনা থেকেই ঘটছে না বা ঘটতে পারে না।

তাহলে প্রশ্ন হবে সত্তার প্রকাশ হবে কখন এবং কেমন করে? সত্তার প্রকাশকে আমরা বলেছি আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ অন্তর্নিহিত আত্মার প্রকাশ। দার্শনিক হিউম তত্ত্বালোচনায় দেখিয়েছিলেন যে, প্রকৃতিতে যেমন ঘটনা প্রবাহ চলেছে এবং কোনো কার্যকারণ পরম্পরা নেই তেমনি একটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেও 'আত্ম' বলতে কিছু জানা যায় না। আমরা শুধু কয়েকটি মানসিক অভ্যাসের কারণে 'আমি' বা আত্ম বলে কিছু একটা ধরে নিই। কাণ্টও প্রায় একই রকমে দেখিয়েছিলেন যে আত্মকে অভিজ্ঞতায় জানা যায় না। কারণ অভিজ্ঞতায় জানতে গেলেই তাকে অভিজ্ঞতার বিষয় হতে হবে। অথচ আত্মা একবার অভিজ্ঞতার বিষয় হলে তাকে জানবার জন্যে একজন কর্তা বা বিষয়ীর প্রয়োজন। বিষয়ী বিষয়-জ্ঞানকে 'আমার' জ্ঞান বলে প্রকাশ করে। কিন্তু তার এই 'আমি' বোধটা আসবে কোথা থেকে! তার এই 'আমি'কে জানতে হলে তাকে জ্ঞানের বিষয় করতে হয়। অর্থাৎ জ্ঞানে আমরা বিষয়কে পাচ্ছি কিন্তু বিষয়ীকে পেতে পারি না। 'আমি' বা আত্মকে তাই অভিজ্ঞতায় জানবার উপায় নেই। অথচ প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতায় আমরা জানি যে যে কোনো জ্ঞানই 'আমার জ্ঞান'। 'আমি' যদি না-ই থাকবে তবে 'আমার জ্ঞান' বলবো কেনো? কাণ্ট প্রশ্নের জবাবে বলেন যে যদিও

অভিজ্ঞতায় আত্মকে জানা যায় না তবু জ্ঞানের প্রয়োজনে আমরা নীতি হিসেবে তা ধরে নিয়েছি।

অভিজ্ঞতায় সত্যি আত্মকে জানা যায় কিনা কাণ্টের এই প্রশ্নের জবাব যাই হোক, আমরা দৈনন্দিনের নানা কার্য কারণেই জানি যে আমার স্মৃতির সঙ্গে আমি জড়িত। জন্মাবার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে একটি লোককে নির্দিষ্টভাবে চিনি তার কারণ সে যদিও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে ও মনে পরিবর্তিত হয়েছে তবু তার কয়েকটি বাহ্য এবং কয়েকটি অন্তরস্থ চিহ্ন মিলিয়ে তাকে চেনা যায়। শুধু আমাদের কাছেই বা কেনো, নিজের কাছেও সেই ব্যক্তিটি 'আমিত্ব' ছাড়া পরিচিত থাকবে না। কারণ তারও দিনে দিনে মুহূর্তে মুহূর্তে নানা পরিবর্তন হয়েছে, জন্মকালের সেই শিশুটি ও তার জীবনের নানা পর্বের লোকটি এমনিতে কিছুতেই এক হতে পারে না। কিন্তু লোকটি আমিত্বের জোরেই নিজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে মেলায়। আর মেলায় সে আমার ছেলেবেলা, আমার কৈশোর, আমার যৌবন বলে। কাজেই 'আমি' প্রত্যয়টিই জীবনের প্রবাহমান স্রোতে ঐক্যের সূত্র। এই আমিকেই আমরা সত্তা বলছি।

'আমি' যদি সত্তা হয় তবে তার নানা পরিবর্তন আছে। কাজেই সত্তাকে আমরা নির্দিষ্ট, চিরকালের মতো স্থির একটি প্রত্যয় ধরতে পারি না। সত্তা যদি নির্দিষ্ট না হয় তবে রামবাবু নামক ব্যক্তিটিকে চিনলেই তার সত্তাকে জানা যায় না। সত্তাকে অন্যভাবে চিনতে হয়। অর্থাৎ সত্তা একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে যেমন স্থির নয় তেমনি সে চির চঞ্চলও নয়। কারণ প্রতি মুহূর্তেই যদি সে অস্থির হয় তবে তাকে কোনো কালেই চেনা যাবে না। অথচ সময় তো নিয়ত চঞ্চল এবং মানুষও সময়ের অধীন। কাজেই মনে হচ্ছে সে সত্তা একাধারে স্থির আবার তেমনি চঞ্চল।

এই স্থিরতা ও চাঞ্চল্যের বিরোধ ঘোচাবার জন্য আমরা বলতে পারি যে সত্তাকে চিনতে হয় ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দিয়ে। উদ্দেশ্যই একমাত্র স্থিরতার সন্ধান দেয় এবং উদ্দেশ্যের মানদণ্ডেই অস্থিরের বিচার সম্ভব। প্লেটো এরিস্টটল বলেছেন বিশ্বজগত পরিণতির লক্ষ্যে বাঁধা। যে যা হবে তা তাকে হতেই হবে। এই হওয়ার চাপেই চঞ্চল সত্তা প্রতিনিয়ত রূপ পেতে থাকে। প্রতিটি পরিবর্তনের ধাপে

তার পরিণতি বিচারের সূত্র ও ঐক্যস্থাপন করে। অর্থাৎ কতোটুকু সে হয়ে উঠছে তার মাপেই সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন আমটা আমই হয়, ভালো বা মন্দ, কিন্তু কাঁঠাল হয় না কখনো। কারণ আমত্বই আমবীজের পরিণতি। এই পরিণতির আদর্শ তার সত্তা (আমত্ব) রক্ষা করে এবং সত্তাকে পূর্ণ প্রকাশিত হবার জন্য অনুপ্রেরিত করে। তাকে কখনোই কাঁঠাল হতে দেয় না। তেমনি মানুষের পরিচয় তার বাইরের চিহ্নে নয়। তার সত্তার মাপে। সত্তা প্রতিনিয়ত তার অন্তর্নিহিত সত্তাকে প্রকাশের দিকে ঠেলে। তার প্রকাশটাই তার চরিত্র এবং চরিত্রই তার সত্তা অর্থাৎ সে নিজে যা, এবং যা সে হতে চায়। সত্তা তাই দিনে দিনে পূর্ণ হয় বা হয় না। এই হওয়া না হওয়ার হিসেব করে আমরা ব্যক্তিকে চিনি এবং তার মূল্য নির্ধারণ করি। সুতরাং সত্তা বলতে আমরা বুঝবো যে-কোনো ব্যক্তির পরিণতির আদর্শ ও সেই আদর্শানুযায়ী কর্মের প্রয়াস।

এই যে লক্ষ্য অনুযায়ী হয়ে ওঠার চেষ্টা তাকেই ধর্ম বলা হচ্ছে। ধর্ম সত্তাকে পরিণতির আদর্শ ও কর্ম ধরে রাখতে শেখায়। যেমন জল নিচের দিকে গড়িয়ে যায়, এটা তার নিজস্ব ধর্ম। জল প্রাকৃতিক কারণে গড়ায়, তার সচেতন কর্মের সমস্যা নেই। মানুষকে তার ধর্মরক্ষা করতে হয় কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজন তার নিজস্ব চরিত্রকে জানা। সচেতনভাবে জানতে পারলেই তবে মানুষের সত্তা প্রকাশিত হয় এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। জলের বৃত্তির মতো মানুষের সত্তা হলো তার আদর্শ। আদর্শকেই রূপ দিয়ে ধর্মের স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সত্তা বা চরিত্রের আদর্শ তৈরি এবং পুষ্ট হয় সংস্কৃতির ভাবলোকে। প্রত্যেক জাতি ও দেশের একটি নিজস্ব মন আছে। এই মনের পরিচয় পাওয়া যায় তার আত্মপ্রকাশের রীতি ও ভঙ্গীতে। দেশের চিরকালীন সংস্কৃতির আবহাওয়ায় যেহেতু সবার মন কম বেশি রসসিঞ্চিত হয়, সংস্কৃতিই ধর্মের পটভূমি।

সুতরাং এবার বলা চলে যে সংস্কৃতির নিজস্ব জগতের আদর্শ অনুযায়ী জীবনকে প্রকাশ করার কথাই ধর্ম। ধর্ম বলতে ঈশ্বর বিশ্বাস, দেবদেবীর পূজা ইত্যাদি বোঝায় না। নিজের সত্তার প্রকাশেই এসবের প্রয়োজন হয়। যেমন বৌদ্ধ বা জৈনধর্মে ঈশ্বর বা দেবদেবীর স্থান ছিলো না। তবু তাদের ধর্ম বলতে আমাদের দ্বিধা হয়নি।

২। ধর্ম বিষয়ে সংজ্ঞা (Some Definitions of Religion)

বিভিন্ন দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিকেরা ধর্মের নানাবিধ সংজ্ঞা দিয়েছেন। বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক ম্যাথু আর্ণল্ড তার 'লিটরেচর এণ্ড ডগমা' গ্রন্থে লিখেছেন ধর্ম হচ্ছে 'morality touched with emotion'। আর্ণল্ডের সংজ্ঞার সমস্ত ঝোঁকটাই হচ্ছে নৈতিক কর্তব্য ও কর্মের ওপর। নৈতিকতাহীন কর্মকে তিনি ধর্ম বলতে রাজি হবেন না বা আমরা বলতে পারি যে তিনি ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের কোনো তফাৎ করছেন না, নীতিশাস্ত্রই ধর্মের স্থান দখল করছে। শুধুমাত্র নীতির সঙ্গে আবেগ জড়ালেই তা ধর্মে উন্নীত হচ্ছে।

আর্ণল্ডের সংজ্ঞা নানা কারণে গ্রহণ করা যায় না। প্রথমত, তিনি নজর করেন নি যে নৈতিকতার আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও জনগোষ্ঠীতে পৃথক। একই দেশের পরিধিতে নানা জাতির লোক ও আচার ব্যবহার স্থান পায় অথচ তাদের ধর্ম এক হতে পারে। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র নৈতিকতাকে ধর্মের চরিত্র লক্ষণ বললে মারাত্মক ভুল হবে। দ্বিতীয়ত ধর্ম ও নৈতিকতার যোগ আছে কিন্তু ধর্ম কেবলমাত্র নৈতিকতাই, এমন কথা বলা যায় না। বহুক্ষেত্রে নৈতিক কর্মাবলীর বিচারে অন্য মানদণ্ডের প্রয়োজন হয় এবং আমরা ধর্মের কাছ থেকে সেই মানদণ্ড গ্রহণ করি। ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র এক হলে ধর্ম ও নীতির মধ্যে কোনো তফাৎ থাকতে পারে না না। আদিম জনগোষ্ঠীতে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যাকে আমরা বর্তমানে সমর্থন করবো না অথচ তাদের নৈতিকতার আদর্শে সে আচরণের সমর্থন আছে। সুতরাং তাদের ধর্মও আছে এবং এই সমস্ত আচরণ নিশ্চয়ই ধর্ম সমর্থিত। কিন্তু কার্যত আদিম সেই সব গোষ্ঠীতে বর্তমান ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধর্মের চিহ্ন নেই। বা বহুক্ষেত্রে ধর্মের অস্পষ্ট উপস্থিত আছে কিন্তু কর্ম মোটেই নৈতিক নয়। কাজেই আর্ণল্ড ধর্মকে নিতান্তই সঙ্কীর্ণ করে ধর্মের চরিত্র নষ্ট করেছেন।

অথচ আমরা দেখেছি যে ধর্ম সত্তার প্রকাশ। সত্তা ব্যক্তির। দল করে, সংগঠন গড়ে সত্তার পরিণতি লাভ করা যায় না। কারণ সত্তা সামাজিক ছাঁচে গড়ে না এবং প্রতিটি ব্যক্তির সত্তার জন্য বিশ্বব্যাপী একটি ছাঁচ তৈরি হয়নি। যতো ব্যক্তি ততো সত্তার প্রকাশ ও ততো পথ তার আত্মোপলব্ধির। কাজেই যদি ম্যাকেঞ্জির মতো বলতে হয় যে ধর্মের জন্য সংগঠনের আবশ্যক আছে তবে আমরা বলবো সংগঠনের সীমা সংখ্যা

থাকবে না। সেক্ষেত্রে সংগঠন শব্দটির তাৎপর্য নষ্ট হবে। ভারতবর্ষের ধর্মে তাই বলা হয় যতো মত ততো পথ। খ্রীষ্টধর্ম বা ইসলামের মতো নির্দিষ্ট একই পথেই ব্যক্তির মুক্তির কথা ভাবা হয় না।

সুতরাং আমরা বলবো যে ধর্মের সঙ্গে সংগঠনের কোনো যোগ নেই। সংগঠনের বক্তব্য তারাই তৈরি করেন যারা ধর্মকে সঙ্কীর্ণ ভাবে কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাহন মনে করেন।

৩। ধর্মের সামাজিক ভূমিকা (The Social Role of Religion)

আমাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধর্মের কোনো পৃথক সামাজিক ভূমিকা থাকতে পারে না। ধর্ম সত্তার কথা বলে, সত্তাকে তার পরিণতির পথে নিয়ে যায়। সত্তা ব্যক্তির, ব্যক্তির আত্মপ্রকাশে, তার ক্রম-উদবর্তিত জীবনযাত্রায় ধর্মের প্রকাশ হয়। সুতরাং ধর্ম সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, তার কোনো সামাজিক চরিত্র নেই।

তৎসত্ত্বেও কিন্তু আমরা দেখেছি যে ধর্মের বন্ধনই সামাজিক জীবন-যাত্রার মৌলিক বন্ধন। ধর্মই সমাজকে ধরে রেখেছে, তার সমস্ত চিন্তাভাবনা ও কল্পনাকে রূপ দিচ্ছে। কিন্তু ধর্মে সামাজিক প্রকাশ ঘটছে প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব চেষ্টার ফলে। প্রতিটি ব্যক্তির সত্তাই পরিণত হবার চেষ্টায় এমন একটি চাপ ও প্রভাবের পরিমণ্ডল তৈরি করে যে তার ছাপ সর্বত্রই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ব্যক্তিগত প্রয়াস থেকেই হোক আর সামাজিক সাংগঠনিককর্মের সূত্রেই হোক ধর্মের সামাজিক ভূমিকা দুদিক থেকে আলোচনা করা যায়। **একটি শুভবোধের দিক থেকেও অন্যটি অমঙ্গল ও অন্যায়ের দিক থেকে।**

সমাজের প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক স্বতই প্রতিষ্ঠিত। তাকে সচেতনভাবে গড়ে নিতে হয় না। সচেতনভাবে কেবলমাত্র তাকে লক্ষ্য নির্দিষ্ট রূপ দেওয়া যায়। ব্যক্তির প্রকাশ হয় তার ব্যক্ত ও সুপ্ত কর্মে। কর্মের সূত্রে অন্যান্য অসংখ্য ব্যক্তিরা একটি বৃত্তের পরিধির মধ্যে চলে আসে। সম্পর্কের এই টানেই ধর্ম ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিকে প্রভাবান্বিত করে। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপড়েনে সত্তার চরিত্র পাল্টায়, এক কর্ম থেকে আর এক কর্মে সত্তা আত্মপ্রকাশ করে। ধর্মের প্রকাশ যদিও তাই ব্যক্তিগত সম্পর্কে পরিস্ফুট হয় তবু তার সামাজিক শুভ বা অশুভ ফলাফল থাকে।

একদল পণ্ডিতের মতে ধর্ম সমাজের ভিত্তি। ধর্মের সূত্রেই সভ্যতার তাৎপর্য প্রকাশিত হয়। রাধাকৃষ্ণান যেমন লিখেছেন যে সভ্যতার মৌলিক উপাদানগুলি ধর্মের দান। ধর্ম এমন একটি সামগ্রিক পরিমণ্ডল প্রস্তুত করে যার মধ্যে মানুষেরা তাদের জীবন ও সংস্কৃতির লক্ষ্যকে স্থির করে, মনুষ্যত্বের মান প্রস্তুত করে। রাধাকৃষ্ণানের বক্তব্যে জানছি 'Regard for spiritual values, love of truth and beauty, righteousness justice and mercy, sympathy with the oppressed and belief in the brotherhood of man, are qualities which will save modern civilisation.' এই প্রত্যেকটি গুণ রাধাকৃষ্ণানের মতে ধর্মের তৈরি।

ক্রিস্টোফর ডসন বলেন যে সভ্যতার আদিকাল থেকেই ধর্ম মানুষকে সভ্যতার অর্থ বুঝিয়েছে, তাকে ভরসা দিয়েছে ও মানুষ হতে সাহায্য করেছে। ডসন তাই বলেন যে সভ্যতার আদিতে কেবলমাত্র যে সামাজিক সংগঠনের ঐক্য দরকার করছে তা নয়, সচেতন মানসিক সংগঠনও দরকার করেছে। ডসন তাই উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চান যে ওই মানসিক সংগঠনই হলো ধর্মের দান। তিনি লেখেন 'The first development of a higher culture in the Near East, the beginnings of agriculture and irrigation, and the rise of city life were profoundly religious in their conception. Men did not learn to control the forces of nature, to make the earth fruitful, and to raise flocks and herds as a practical task of economic organization in which they relied on the own enterprise and hard work. They viewed it rather as a religious rite by which they cooperated as priests or hierophants in the great cosmic mystery of the fertilization and growth of nature'.

ডসন বলতে চাচ্ছেন যে মানুষ শুধু বাঁচার বাহ্ প্রয়োজন মেটাবার জন্যই সেঁচের ব্যবস্থা বা চাষের ব্যবস্থা করেনি। তার প্রতিটি কাজের পেছনে একটা গভীর রহস্যের বোধ ও তার সঙ্গে সংযোগের ধারণা কাজ করেছে। তার সমস্ত কর্মই ছিলো সেই বিরাট অজ্ঞাত রহস্যের পর্দা তোলার প্রয়াস। জীবনের প্রতিটি পর্বে এবং প্রতিটি কর্মেই ধর্মের প্রকাশ হয়েছে। ধর্ম সমগ্র জীবনযাত্রাকে ছেয়ে থেকেছে। যেমন ভারতবর্ষে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও আমরা জানছি যে সমস্ত বিদ্যার লক্ষ্য আন্বীক্ষিকী বিদ্যা। এই বিদ্যা জীবনযাত্রার সুখসমৃদ্ধি বিধানের বিদ্যা নয়, আত্মদর্শনের

বিদ্যা। অর্থশাস্ত্রে যখন এই বিদ্যার কথা বলা হয়, তখন বোঝা যায় যে ভারতীয় জীবনযাত্রা কেমন আত্মোপলব্ধির ধারণায় জারিত।

মিশরের জীবনযাত্রায় তেমনি জীবনের সমস্ত কেন্দ্র এবং রাষ্ট্র সূর্য-দেবতার সঙ্গে জড়িত ছিলো। এমন একটিও কর্ম ছিলো না যা সূর্য-দেবতার আওতার বাইরে। ফ্যারাও থেকে সাধারণ প্রজা পর্যন্ত সবার জীবন তাঁর নিয়ন্ত্রণেই চলেছে। যেমন একটি প্রার্থনায় জানছি—

> 'It is he (the sun-god) who has adorned the (Egypt),
> It is he who has built thee,
> It is he who has founded thee,
> Thou dost for him everything that he says to thee
> In every place where he goes,
> Thou carriest to him every tree that is in thee,
> Thou carriest to him all food that is in thee,
> Thou carriest to him the gifts that are in thee,
> Thou carriest to him everything that is in thee,
> Thou carriest to him everything that shall be in thee,
> Thou bringest them to him
> To every place where his heart desires to be.

(ব্রেসটেড, ডেভেলপমেণ্ট অব রিলিজিয়ন এণ্ড থট ইন এনসেণ্ট ইজিপ্ট, ২১৩-১৪)

ধর্ম সভ্যতা ও মনুষ্যত্বকে পরিপুষ্ট করে। মনুষ্যত্বের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। (ধর্ম মনুষ্যত্বের বোধ তৈরি করে কারণ মনুষ্যত্ব সত্তার বোধের সঙ্গে জড়িত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যাকে বলেছেন 'মানহুঁশ' হবার কথা। সভ্যতার প্রসঙ্গ তখন ওঠে যখন মানুষ তার জীবনের লক্ষ্য খোঁজে এবং সেই লক্ষ্যের কল্পনাকে প্রতিটি কাজের মধ্যে প্রকাশ করে। সমাজ যেহেতু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক, আমাদের জানতে হয় সমাজ কেবলমাত্র প্রাকৃতিক কারণেই সত্য কিনা। প্রকৃতির নিয়মে বাঁচবার জন্যেই মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ। কিন্তু পূর্বেই আমরা দেখেছি মানুষ মানুষ হয় তার সচেতন কর্মে। কারণ স্বাধীন ও সচেতন কর্মেই তার নিজস্ব ইচ্ছার প্রকাশ হয়। মনুষ্যেতর প্রাণী জগত থেকে তার পার্থক্য তার স্বাধীনতায়। সুতরাং সমাজে মানুষ শুধু প্রাকৃতিক কার্যকারণেই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয় না। সে প্রতিমুহূর্তেই বাছাই করে, বাছাই করে তার কল্পনার লক্ষ্য মিলিয়ে, যা সে প্রতিদিন হয়ে উঠ্‌তে চায়।

সাধারণভাবে নিশ্চয়ই পরস্পরের সম্পর্ক থাকে। কিন্তু সচেতনভাবে সম্পর্ক কেনো রাখতেই হবে এই প্রশ্নের জবাবে ধর্মের প্রভাব বুঝতে পারা যায়। ধর্ম আমাদের শুধুমাত্র মানুষী প্রয়োজন ও স্বার্থের বাইরে বৃহত্তর লক্ষ্যের সঙ্গে পরিচিত করে। শুধুমাত্র মানুষের জন্যই মানুষ ভাবলে সমাজে মানুষের সাধারণ প্রয়োজনটাই প্রধান হয়ে ওঠে। তখন বড়োজোর হব্‌স বা রুশোর মতো সমাজকল্যাণ বা সমাজ শক্তির কথা ভাবা যায় কিন্তু মানুষ কেনো নিজের স্বার্থ ত্যাগ করবে তা বোঝা যায় না। ধর্ম নিজের স্বার্থের বাইরে বিরাট জগতের খোঁজ দেয় এবং মানুষকে বিরাট আকাশের তলায় প্রতিষ্ঠিত করে। অর্থাৎ মানুষকে আকাশের মতো বৃহৎ হবার কল্পনা দেয়, যে-কল্পনায় কেবলমাত্র নিজের সংসার ছাড়াও অন্যদের কথা থাকে এবং আত্মদান ও ত্যাগের কথা ওঠে। ধর্মকে বাদ দিয়ে মনুষ্যত্ব ও সমাজ নিছক উপযোগিতাবাদ বা পরোক্ষবাদের বক্তব্য হয়ে দাঁড়ায় কারণ ওই দুটি তথ্য মানুষকে কেবলমাত্র স্বার্থের ও প্রয়োজনের হিসেব ছাড়া আর কিছুই বলতে চায় না। অথচ আমরা জানি যে স্বার্থের প্ররোচনায় কেবলমাত্র স্বার্থ ই থাকে এবং তাতে সমাজকল্পনা খুঁজে পাওয়া যায় না। সমাজ বন্ধনের জন্য স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন। কিন্তু মানুষ স্বার্থত্যাগ করবে কেনো? করবে যেহেতু সে ধর্মে তার মাপকে ঈশ্বরের তুল্য বলে জানতে পেরেছে, যেহেতু সে নিজেকে অমৃতের সন্তান বলে চিনতে পেরেছে। সুতরাং ধর্ম ই সমাজ ও সভ্যতার কেন্দ্র। জীবনের সমস্ত মঙ্গলের উৎস।

ধর্মের সামাজিক কার্যক্রমের পরিচয় পাওয়া যায় বিখ্যাত ফরাসী সমাজতান্ত্রিক দুর্খাইমের বক্তব্যে। সমাজকে তিনি ধর্মের মধ্যেও দেখেন। তিনি তাই লেখেন 'In the divine I can only see society tansfigured and thought of symbolically' অর্থাৎ দুর্খাইম বলতে চাচ্ছেন যে সমাজ ও ধর্মে কোনো বিরোধ নেই যেহেতু ধর্মের বন্ধন সমাজের মধ্যেই স্বীকৃত।

পৃথিবী বিখ্যাত পণ্ডিত ফ্রেজার ধর্মের ব্যাখ্যায় তার আদিম সমাজ বিষয়ক জ্ঞানকে উপস্থিত করেন। তিনি বলেন যে আদিম সমাজ সংগঠনে প্রকৃতি বিষয়ে নানা ভয় ও চিন্তা কাজ করেছে। প্রতিকূল প্রকৃতিকে মানুষ তার স্বার্থ বিরোধী মনে করেছে কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে তারা এমন একটি শক্তি দেখেছে যা তাদের জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। এই শক্তিকে তারা সক্রিয় মনে করেছে। যেনো প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সচেতন ভাবে

নিজে থেকেই ঘটছে। বাঁচবার জন্য তারা এই শক্তিকে খুশি করতে চেয়েছে কারণ প্রাকৃতিক শক্তি খুশি হলে তাদের বাঁচার পথ সুগম হয়। বর্তমান কালেও যেমন আমাদের পূজাঅর্চনার নানা অনুষ্ঠানে দেবতাদের খুশি করবার প্রয়াস থাকে। ফ্রেজার তাই ধর্মের সম্পর্কে বলেন 'a propitiation or conciliation of powers superior to man which are believed to control the course of nature or of human life' (গোল্ডেন বাউ, ১, ৬২)। ফ্রেজারের ব্যাখ্যা মেনে নিলে মানুষের আদি ভয়টাকেই ধর্ম বলতে হয়। আমরা কিন্তু ধর্মের মানসিক বা মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণের বদলে ধর্মের চরিত্রকে বুঝতে চাচ্ছি। ফ্রেজার ধর্মের বৈশিষ্ট্য কিছু ব্যাখ্যা করছেন না শুধু ধর্মের সঙ্গে প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তিকে জড়িয়ে কিছু কিছু আচার অনুষ্ঠানকে ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছেন। এবং সেই আচার অনুষ্ঠানও আবার বর্তমান মানুষের নয় আদিম মানুষের। আমাদের আচরণ, অনুষ্ঠান ও পূজাবিধিতে হয়তো ফ্রেজার কথিত প্রয়াস নিশ্চয়ই কিছুটা আছে কিন্তু ধর্ম বলতে আমরা শুধু প্রাকৃতিক শক্তিকে প্রসন্ন করবার কথাই ভাবি না। সেই শক্তির সঙ্গে একাত্ম হবার কথাও ভাবি। ফ্রেজারের বক্তব্যকেই একজন মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক ভেঙে বলেন 'Religion is the effective desire to be in right relation to the Power manifesting itself in the universe' শুধু এই সংজ্ঞায় শক্তির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা বলা হচ্ছে

এই বক্তব্যের পাশাপাশি দার্শনিক বোসাঙ্কেটে ও রাধাকৃষ্ণানের সংজ্ঞা উপস্থিত করা যায়। বোসাঙ্কেট 'ভ্যালু এণ্ড ডেস্টিনি অফ দি ইনডিভিডুঅল' গ্রন্থে লিখেছেন' Wherever we have devoutness, devotion, we have the primary features of religion' (২, ২৫) আর রাধাকৃষ্ণান সংজ্ঞা দিয়েছেন 'The search of the mind for beauty, goodness and truth is the search for God.' এই দুটি সংজ্ঞা বিষয়ে আমাদের মন্তব্য এই যে ওঁরা ধর্মবিষয়ে যতো না চিন্তিত তার চেয়ে বেশি চিন্তিত হয়েছেন 'ধর্মভাব' বা 'ধর্মপ্রবণতা' (religiousness) নিয়ে। অথচ ধর্ম বিষয়ে মনস্থির করতে না পারলে ধর্মভাব থেকে ধর্ম বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা হয় না। যেমন বোসাঙ্কেটের সংজ্ঞা অনুযায়ী ভক্তি, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা থাকলেই ধর্মের প্রমাণ হয়। কিন্তু সাধারণভাবেই আমরা জানি যে বহু ব্যক্তি পৃথিবীতে আছেন যাঁদের এই গুণগুলো অত্যন্ত বেশি তাঁরা কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠিত

ধর্মই মানেন না। লোকাচারের অর্থে তাঁদের ধার্মিক বলাও সম্ভব নয়। উদাহরণত যেমন আমরা রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের জ্যাঠামশায়কে দেখতে পারি। তাঁর সমস্ত কর্মই চূড়ান্তভাবে নৈতিক ছিলো। তিনি কিন্তু কোনো ধর্মকে স্বীকার করতেন না। এক্ষেত্রে বোসাঙ্কেটের সংজ্ঞা অনুযায়ী তিনি ধার্মিক, তাঁর ধর্ম না থাকলেও। কাজেই বোসাঙ্কেটের সংজ্ঞায় ধর্মের চরিত্র বিশ্লেষিত হয়নি।

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণানও ধর্মের চরিত্রকে নীতিশাস্ত্র বা নন্দনশাস্ত্রের দিক থেকে দেখছেন। সৌন্দর্যের চর্চা করলেই কি ধার্মিক হয়? লুক্রেশিঅস নামে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন বস্তুবাদী। তিনি কাব্যে সৌন্দর্যের চর্চা করেছেন। কিন্তু সেজন্যেই কেউ তাঁকে ধার্মিক বলে না। তেমনি শুভ ও সত্যের চর্চা নিশ্চয়ই ধর্মের একটা অঙ্গ কিন্তু ধর্মহীন নৈতিক ব্যক্তিও এই দুইটি প্রত্যয় বিষয়ে চিন্তিত থাকতে পারেন এবং নিজের কর্মে তার প্রমাণ দিতে পারেন। ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রকে সুতরাং একই সঙ্গে ব্যাখ্যায় ধরা যায় না।

দার্শনিক উইলিয়ম জেমস ধর্ম বিষয়ে লেখেন 'The belief that there is an unseen order and that our supreme good lies in harmoniously adjusting ourselves thereto.' উইলিঅম জেমসের মতে ধর্মে জগত-শৃঙ্খলার বোধ প্রধান কথা। তিনি মানুষের মঙ্গলামঙ্গলের দিক থেকে বিশ্বব্যাপী নিয়মের সঙ্গে সংযোগের কথা বলছেন। মঙ্গলের ধারণা ও বিশ্ব প্রপঞ্চের নিয়ম জেমসের ব্যাখ্যায় অনেকটাই নৈতিক বোধের মতো। কারণ মানুষকে তার মঙ্গলের জন্য নিজের কথা বলতে হচ্ছে, ভাবতে হচ্ছে কেমন করে অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে নিজেকে মেলাবে। এই বক্তব্য অনেকটাই যেন ফ্রেজারের বক্তব্যের প্রতিধ্বনির মতো। অথচ আমরা জানি যে ধর্ম কেবলমাত্র সচেতন মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে জড়িত হতে পারে না। আমরা যদিও ধর্ম বলতে অনেক সময় প্রয়োজনসিদ্ধি বুঝি এবং দেবতাদের কাছে নানা জাতের প্রার্থনা উপস্থিত করি তবু ধর্ম এমন স্পষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাহন হতে পারেনা।

হর্বর্ট স্পেনসর ধর্ম সম্বন্ধে বলেছেন যে ধর্ম আমাদের কল্পনা বা ধারণা মাত্র। এই ধরণার সাহায্যে বিশ্বজগতকে আমরা বোধগম্য করি তুলি। স্পেনসরের বক্তব্যে ধর্মের যুক্তির দিকটা প্রকট। মানুষকে সর্বদাই তার চারপাশ অর্শাৎ পরিবেশকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করে তুলতে হয় যেহেতু শৃঙ্খলার

বোধেই তার বাঁচবার সম্ভাবনা। বিশৃঙ্খল অপরিচিত বিশ্বে প্রতিমুহূর্তেই যদি অজ্ঞাত কার্য কারণের লীলা চলে তবে মানুষ একটা ঘটনা থেকে আর একটা ঘটনায় অন্ধের মতো বিক্ষিপ্ত হবে মাত্র, কোনদিনই সচেতনভাবে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। স্পেনসর তাই ধর্মের মধ্যে একটি শৃঙ্খলার তত্ত্ব দেখতে পেয়েছেন।

দার্শনিক হেগেলের সংজ্ঞায় ধর্ম হচ্ছে সসীম মনের অসীম সত্তাকে জানা। হেগেল শিষ্য-ইংরেজ দার্শনিক ম্যাকটেগার্ট লিখেছেন ধর্ম হচ্ছে 'An emotion resting on a harmony between ourselves and the universe at large.' ধর্মকে তিনি বিশ্বপ্রপঞ্চের সঙ্গে সংহতির বোধ বলতে চাচ্ছেন। ম্যাক্সমুলের সংজ্ঞা দিচ্ছেন 'Anything that lifts man above the realities of this natural life is religion': নিউম্যান বলেছেন 'the essence of religion is authority and obedience' আর শ্লিয়ার-ম্যাকার লিখেছেন 'it is a feeling of absolute dependence'। আর একজন জর্মন লেখক বলতে চেয়েছেন যে ধর্ম হলো একটা সংক্রামক রোগ। ম্যাক্সমুলের যে কথা বলেছেন তাতে পৃথিবীর বন্ধন থেকে যা মুক্তি দেয় তাই ধর্ম। কোন ব্যক্তি যদি ঈশ্বর বিশ্বাসী না হন, তিনি যদি জড়বাদের ভক্ত হন, তবু মানসিক শান্তি থাকলে তিনি নিশ্চয়ই ধার্মিক। কবিতায় যদি কোনো ব্যক্তি মানসিক প্রশান্তি খুঁজে পান তবে তিনি ম্যাক্সমুলেরের মতে ধার্মিক ব্যক্তি। আর নিউম্যান আদিম বিশ্বাসের ভয় ও ভক্তিকে ধর্মের চরিত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছেন। ধর্ম যে প্রতিটি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত আবেগ ও অনুরাগের ব্যাপার হতে পারে তা তিনি মানছেন না, তিনি কেবলমাত্র আনুগত্যের কথা বলছেন। আনুগত্য বা শ্রদ্ধাতে যে বাহ্য সম্পর্কের কথা থাকে নিউম্যান তা মানতে চাচ্ছেন না। ওঁর মতে বড়ো একটা কিছুর সামনে মানুষ কেবল মাথা নীচু করে থাকবে এবং থাকলেই ধর্ম হবে।

উপরোক্ত প্রতিটি সংজ্ঞায় যেমন সত্য নিহিত আছে তেমনি ভ্রান্তিও প্রচুর। ধর্মকে কেউ বাইরে থেকে আচার অনুষ্ঠানের অর্থে জেনেছেন, আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভয় ও অন্যান্য উদ্দেশ্য জড়িয়েছেন, আবার কেউ শুধুমাত্র নৈতিক আদর্শের কথা বলেছেন। নৈতিক আদর্শও যে ধর্মের অনুপ্রেরণাতে গড়ে তা দেখেন নি। ধর্ম শুধু ভয় বা প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় হলে ধর্মের চরিত্রই নষ্ট হয় কারণ ধর্ম কার্যত কোনো প্রত্যক্ষ

ফলথাভের উপায় নয়। এ প্রসঙ্গে হ্বাটারহাউসের একটি কথা অত্যন্ত মূল্যবান 'Its meaning to man is not dependent upon what it is, so much as upon what he is.' তিনি সঠিক বলেছেন যে ধর্ম কি এই আলোচনায় তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে না, মানুষ নিজে কী তার সঙ্গেই ধর্মজড়িত। মানুষেরই ধর্ম, মানুষের জন্যেই ধর্ম সুতরাং মানুষ কি এবং কেনো ধর্মকে চায় সবটাই প্রমাণ হবে তার নিজের সত্তার নজীরে।

ধর্মের বিভিন্ন আলোচিত সংজ্ঞা থেকে আমাদের সংজ্ঞা অনেকবেশি ব্যাপক ও তাৎপর্যময়। মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার জন্যেই ধর্ম বা সত্তার প্রকাশকেই ধর্ম বলা হবে। ভারতীয় শাস্ত্রে এই সত্তাকে বলা হয়েছে 'স্বভাব' স্বভাব রক্ষাই ধর্ম। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনবিষাদযোগে অর্জুনকে সেকথাই উপদেশ দিয়েছেন। মহাবল অর্জুন কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে স্বজন হত্যার দুঃখে মর্মপীড়িত হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখিয়ে তাঁকে উদবুদ্ধ করেন। কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন শ্রীকৃষ্ণ স্বজন হত্যায় অর্জুনকে প্ররোচিত করলেন কেনো? একটু ভাবলেই দেখা যাবে যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নতুন কিছুই করতে বলেন নি। তিনি শুধু বুঝিয়েছেন যে 'তোমার ধর্ম তুমি পালন করো। নিজের স্বভাব থেকে বিচ্যুত হলে স্বধর্ম থেকেও বিচ্যুত হতে হয়। কারণ স্বভাবই স্বধর্ম। অর্জুন কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে আত্মীয় হত্যার কথায় চিন্তিত হয়েছেন, তিনি কিন্তু নিছক প্রাণীর হত্যায় দুঃখে চিন্তিত হননি। কুরুক্ষেত্রের পূর্বেও তিনি বহু হত্যা করেছেন, পরেও করবেন! তবে সাময়িক বৈরাগ্য কেনো? না, আত্মীয় দেখে। অর্থাৎ তিনি যে হত্যা করেন সেটা তার স্বভাবের পরিণতি, ক্ষত্রিয়র কর্তব্য। সেটা না করাই অন্যায় ও ধর্মচ্যুতি। আত্মীয়দের জন্য কর্তব্যভ্রষ্ট হওয়াটা 'মোহ' মাত্র। প্রকৃত বৈরাগ্য নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই তাকে ক্লীবতা ত্যাগ করতে বলেন, আরো জানান যে অর্জুনের নতুন কিছু করবার নেই সবই আগে থেকে স্থির হয়ে গেছে।

(ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের একথাই বোঝাতে চেয়েছেন বা গীতার শিক্ষাই এই যে, নিজের স্বভাবের পরিণতি চাইতে হয়, স্বভাব অনুযায়ী মনুষ্যত্বের কথা বুঝতে হয়—তবেই ধর্ম এবং ধর্মের বোধ সত্য হয়। ধর্ম স্বভাবের জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নয়।)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গীতার এই শিক্ষাকে আশ্চর্য একটি গল্পে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে একদা এক ব্যাঘ্র শাবক একটি ছাগলের দলে

পালিত হয়েছিলো। ছাগলের সঙ্গেসঙ্গে সে ছাগল হয়ে ওঠে এবং ছাগলের মতো আচরণে অভ্যস্ত হয়। এমনিভাবে তার বেশ দিন কাটছিল কিন্তু হঠাৎ ওই ছাগলের পালে একটি বাঘ পড়লো। বাঘটি ছাগলদের সঙ্গে লেজ গুটিয়ে একটি ব্যাঘ্র শাবককে পালাতে দেখে এমন চমকে যায় যে শিকারের কথা ভুলে সে এই শাবকটিকে ধরে। তাকে জিজ্ঞেস করে তুমি কে? সে জবাবে জানায় সে 'একটি ছাগল'। বাঘ তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারেনা যে সে আসলে ছাগল নয় একটি বাঘ, তারই মতোই বিরাট হিংস্র জীব, ছাগলদের যম। কিছুতেই যখন তাকে বোঝানো যাচ্ছেনা তখন শাবকটির কান ধরে জলাশয়ের কাছে নিয়ে যায় জলের প্রতিবিম্ব দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে 'এবার বলো তুমি কে? ছাগল, না তুমি আমার মতো দেখতে?' এবারে শাবকটি জলে নিজের মুখের সঙ্গে সত্যিই বাঘের মিল দেখতে পেয়ে অবাক হয়, সন্দেহ হয় যে সত্যিই সে বুঝি ছাগল নয়। তারপর ওই বাঘটি শাবকটিকে নিয়ে যায় এবং নিরামিষাশী শাবকটিকে শিকার ও রক্ত পানে পটু করে তোলে। সে ছাগলত্ব ত্যাগ করে সত্যি সত্যিই বাঘ হয়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব ধর্মকে এই স্বভাব আবিষ্কারের কথাই বলেন। স্বভাবেই আত্মজ্ঞানের বীজ থাকে। বীজ যখন ক্রমশ অঙ্কুরিত হয়ে মহীরুহে পরিণত হয় তখন বোঝা যায় সত্তার গোপন চরিত্র। স্বভাব আবিষ্কারের প্রসঙ্গে অবশ্য একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে স্বভাবের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগ কি? বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ব্যতীত পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আছে নানাভাবে। ঈশ্বরের প্রসঙ্গে ধর্মে স্বভাবতই ওঠে কারণ স্বভাবের প্রশ্নে মানুষ পৃথিবীর রহস্য জানতে চায়। বিশ্বের রহস্য সে জানে বিশ্ব প্রপঞ্চের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থির করে। চারপাশের মহাজাগতিক বিশ্বের আপাত বিশৃঙ্খলায় সে নিয়ম আরোপ করে নিজে প্রাণের নজীরে, দেখতে পায় যে একই প্রাণ সমস্ত জড় ও অজড়ে প্রবাহিত। কারণ বিশ্বের নিয়ন্তাই প্রাণ। বিশ্বের এই মূলীভূত ঐক্য ও তার নিয়মকে ভারতীয় ঋষিরা বলেছেন 'ঋত'— সমস্ত বিশ্বজগত, এমনকি অগ্নি বরুণ ইন্দ্রও এই ঋতর অধীন। ঋতর অধিষ্ঠান প্রাণের কারণে যেহেতু প্রাণই বিশ্বকে চৈতন্যদান করে এবং ব্রহ্ম সন্নিধানে নিয়ে যায়।

বিশ্বচক্রে প্রাণের এই লীলা ও ঋতের অমোঘ কার্যকারণের সঙ্গে স্বভাবের সংযোগ। স্বভাব আত্মস্থ হয় এসবের জ্ঞানে। সুতরাং স্বভাবের প্রসঙ্গেই ঈশ্বরের কথা আসে। ঈশ্বর ঋত ও প্রাণের প্রতীক। সুতরাং পণ্ডিতরা যখন বাহ্যত ঈশ্বরকে ক্ষমতা ও ভয়ের পাত্র বলেন বা ধর্মকে বাহ্য মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে জড়ান তখন তাঁরা ভুলে যান যে ধর্মের যোগ আত্মার সঙ্গে, সত্তার ক্রম-উদ্‌ঘাটিত পরিণতির সঙ্গে। সত্তার ক্রম-উদ্‌ঘটিত প্রকাশ ব্যতীত ধর্মের কোনো তাৎপর্য নেই। সহস্রবার পূজা অনুষ্ঠান ও রীতি প্রকরণের চর্চাতেও ধর্মের চরিত্র স্পষ্ট হবে না, যদি না আচরণীয় কর্মে সত্তার পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

ভারতীয় শাস্ত্রের এই অত্যাশ্চর্য বক্তব্য জানা না থাকায় বহু য়ুরোপীয় পণ্ডিত ধর্মের চরিত্র ও স্বরূপ বিষয়ে অজ্ঞতার পরিচয় দেন। যেমন অধ্যাপক হ্বাটারহাউসই অন্যত্র লিখেছেন যে নিজেদের অনুপযুক্ততাকে পূর্ণ করবার জন্যই ধর্মের প্রয়োজন। অর্থাৎ অধ্যাপক হ্বাটারহাউস শুরুতেই ধরে নিয়েছেন যে মানুষ অনুপযুক্ত সুতরাং তার পূর্ণতার প্রয়োজন। তিনি কিন্তু বুঝতে পারছেন না যে অনুপযুক্ততার জন্যই ধর্মের প্রয়োজন নয় বা মানুষ স্বভাবতই অপূর্ণ নয়। গোড়াতেই পূর্ণতা-অপূর্ণতার প্রশ্ন তুললে বোঝা যায় যে মানুষ বিষয়ে এই পণ্ডিতদের পূর্বধারণা আছে এবং তারা পরিণতির লক্ষ্য ছাড়াই পূর্ণতা বিচারের মানদণ্ড স্থির করে নিয়েছেন। কিন্তু তা কখনোই সম্ভব নয়। মানুষ পূর্ণ কি অপূর্ণ একথা কখনোই গোড়ায় জানা যায় না। মানুষ সম্পূর্ণ মানুষ। তার পূর্ণতার প্রশ্ন একমাত্র সত্তার পরিণতির সূত্রে বোঝা যায়। সুতরাং সত্তা ও সত্তার পরিণতির কথা আলোচনায় স্পষ্ট না করলে অপূর্ণতার কথা নিতান্ত অবান্তর। একই ভুল করেন ফ্লিন্ট যখন তিনি লেখেন, 'Religion is man's belief in a being or beings mighter than himself and inaccosibe to his sense but indifferent to his sentiments." ফ্লিন্ট বলছেন যে মানুষ ও অপ্রাকৃত সত্তায় ক্ষমতার বিরাট ফারাক এবং এই ক্ষমতাকে মানুষ জানতে পারে না। কাজেই তাকে সেই ক্ষমতার কাছে মাথা নিচু করতে হয়।

এই বক্তব্যগুলোর পেছনে খৃষ্টধর্মের বক্তব্য কাজ করছে। সেজন্যেই মানুষ ও ঈশ্বরে এতো তফাৎ করা হচ্ছে এবং মানুষের অপূর্ণতার কথা এতো বলা হচ্ছে। খৃষ্ট ধর্মে আদি পাপের কথা এতোই ঘোষণা করা হয়েছে

যে মানুষের অপূর্ণতার কথা বারবার বলতেই হবে। ভারতীয় ধর্মে কিন্তু এমন বিভাগ নেই এবং গোড়া থেকেই মানুষের অপূর্ণতার কথা বলা হচ্ছে না। বরং মানুষকে অমৃতের সন্তান বলে তাকে ঈশ্বরের সমতুল্য সম্মান দেওয়া হচ্ছে। আরো বলা হয়েছে যে যেখানেই জীব সেখানেই শিব অধিষ্ঠিত।

৩। **ধর্ম ও সংগঠন** (**Religion and Institution**)

ধর্ম ও সংগঠনের প্রশ্ন ধর্মের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সংগঠনের সঙ্গে রীতিনীতি ও আচরণীয় কর্ম জড়িত। ধর্মের পালনীয় বিধি নিজের প্রয়োজনেই সংগঠন গড়তে পারে। সংগঠন ধর্মের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করে, তাকে স্থায়ী ও নির্দিষ্টরূপ দেয় এবং প্রচারের ব্যবস্থা করে। সংগঠন ব্যতীত ধর্ম-প্রকাশের ব্যবস্থা অনেকাংশেই অসম্ভব মনে হয়।

সাধারণভাবে যে কোনো ধর্মের আচরণীয় বিধিকেই সংগঠিত রূপ দেওয়া যায়। কিন্তু সংগঠন বলতে এখানে অন্য অর্থ বোঝা হচ্ছে। সংগঠন কেবলমাত্র বিধিবদ্ধ কর্মই নয়, সংগঠন লোকদের সচেতন প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে তাদের বক্তব্য প্রকাশিত হবে। এই অর্থে ধর্মের সঙ্গে সত্যিই সংগঠনের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে কিনা সন্দেহ। এ বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন মত তবে অধিকাংশ য়ুরোপীয় দার্শনিক ধর্মের সঙ্গে সংগঠনকে এক করে দেখেন। কারণ, খৃষ্টধর্মের সঙ্গে সংগঠনের গভীর যোগ। বা আমরা বলতে পারি যে সংগঠন ব্যতিরেকে খৃষ্টধর্মের চরিত্রই নষ্ট হয়।

অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি বলেছেন 'It is natural that the religious attitude, especially on its more social side should lead to the establishment of special institution, for its support and application ; just as the other aspects of human nature do" এই উদ্ধৃতিতে অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি কয়েকটি মূল কথা বলেছেন। প্রথমত তিনি ধরে নিয়েছেন যে এটা ধর্মীয় মনোভাবের পক্ষে স্বাভাবিক যে তা সংগঠন তৈরি করবে। কিন্তু তিনি বলেননি কেন স্বাভাবিক। ধর্মের সঙ্গে সংগঠনের কি যোগ তাও তিনি স্পষ্ট করেন নি। তিনি শুধু ধরে নিয়েছেন যে নিজের সমর্থন ও প্রয়োগের জন্য তার সংগঠনের প্রয়োজন। এই বক্তব্যের পেছনে অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির মনে কয়েকটি প্রচলিত য়ুরোপীয় ধারণা কাজ করে। কারণ তিনি সংগঠনের প্রয়োজন বলছেন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য। অর্থাৎ ধর্ম প্রচারশীল হবে এবং তা প্রচার চাইবেই। যেমন

খৃষ্টধর্ম। প্রচার ও প্রচারের জন্য অবধারিত ভাবে তাকে সংগঠনে গড়তে হবে।

অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি কিন্তু খোঁজ করে দেখেননি যে পৃথিবীতে সমস্ত ধর্মই প্রচারশীল নয়। কাজেই সমস্ত ধর্মকে সংগঠন গড়তে হয়না এবং তাই ধর্মের সঙ্গে সংগঠনের কোনো মৌলিক যোগ নেই। খৃষ্টধর্ম নিঃসন্দেহেই প্রচারশীল কারণ ইহুদীরা মনে করতেন তারাই ঈশ্বরের বরপুত্র। তাদের ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং তাদের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর, অন্য সবার দেবদেবীদের হারিয়ে তাদের নিয়ে আসবে তাদের কামনার স্বর্গরাজ্যে, যে রাজ্যটি ঈশ্বর তাদের জন্য বেছে রেখেছেন। তাদের সামনে ছিলো তাদের শ্রেষ্ঠ ধর্মকে সারা বিশ্বব্যাপী প্রচারের কামনা ও লক্ষ্য। এজন্যে তারা নানা অত্যাচার সহ্য করেছে এবং অত্যাচার সহ্য করে বিশ্বজয়ের 'ভ্রাতৃত্ব' প্রতিষ্ঠা করেছে গীর্জায় গীর্জায়। খৃষ্টধর্ম একারণে গীর্জার বাইরে কল্পনা করাই যায় না। খৃষ্টধর্মের মতোই ইসলাম। ইসলামও প্রচারশীল ধর্ম, ইসলামেও শ্রেষ্ঠতার কল্পনা। ইসলামে তাই দৃঢ় সংগঠনের প্রয়োজন করে। এই সংগঠন মসজেদকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়। গীর্জা ও মসজেদের প্রথম কাজ তাদের নিজস্ব ধর্মের বীজমন্ত্র রক্ষা করা, যে বীজমন্ত্র সমস্ত বিশ্বাসীদের বেঁধে রেখেছে। বীজমন্ত্রের সঙ্গেই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের কল্পনায় খৃষ্টধর্ম ও ইসলাম দিকে দিকে বিস্তৃত হবার কল্পনাকে জিইয়ে রাখে।

কিন্তু ভারতীয় ধর্ম, (যা ম্যাকেঞ্জি বলেন না,) কখনোই সংগঠনের কথা ভাবেনা। কারণ ভারতীয় ধর্ম নিজেকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে পৃথিবীতে ছড়াবার কল্পনা করেনা। নিজেতেই ভারতীয় ধর্ম আত্মস্থ। সত্তা আবিষ্কারের কথা যে ধর্ম বলে তার নিজস্ব কোন নির্দিষ্ট বীজমন্ত্র থাকেনা ও সেই মন্ত্রগুলি প্রচারের প্রয়োজন করেনা। ভারতীয় ধর্ম এমনকি নিজেকে ঈশ্বরের বাছাই করা বক্তব্যও মনে করেনা। বরং বারবার ঘোষণা করে যে প্রতিটি মানুষের আত্মপ্রকাশের পথ ও পদ্ধতি ভিন্ন। কোন একটি নির্দিষ্ট পথে তাকে বোঝা যায় না। ব্যক্তির সমস্ত বৈচিত্র্যের মতোই তার বিশ্বাস ও বীজমন্ত্র অনন্ত হতে পারে। আর তাই ধর্মকে প্রচার করবার কিছু নেই। সুতরাং তার নিজের জন্য কোন সংগঠনও দরকার করেনা।

অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি খৃষ্টধর্মের সংগঠনকে এমন মৌলিক মনে করেন যে মানুষের অন্যান্য সংগঠনের মতো ধর্ম সংগঠনকেও মানুষের চরিত্রে স্থাপন

করেন। কিন্তু তিনি ভুলে যান যে ধর্ম সামাজিক কর্ম নয়। সামাজিক কর্মের প্রয়োজনেই মানুষেরা নানা সংগঠন গড়েছে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সংগঠনের আর কোনো সার্থকতা থাকে না। ধর্ম তেমনি সামাজিক কর্ম নয় সুতরাং মানুষের ধর্ম সংগঠন প্রয়োজন নেই। এই ব্যাখ্যা মানলে বলতে হবে যে ধর্ম ব্যক্তিগত নয় এবং ধর্মের সঙ্গে সত্তার ক্রম উদ্বর্তনের কোনো সম্পর্ক নেই। এই বক্তব্যেও ম্যাকেঞ্জি একই ভুল করেন খৃষ্টধর্ম প্রভাবের কারণে।

তিনি আরো লিখেছেন যে "The reality which the mythologies have pictured in so many different forms, but which in the objective, universal and eternal cause of those sensation, *sui generis*, which make up the religious experience, is society," সমাজ ও ধর্মের এই যোগকে অধ্যাপক জন ম্যাকমুরে স্পষ্ট করেন 'the function of religion is to increase the scope and complexity of human coperation by creating, sustaining and expressing man's union in a spiritual brotherhood" সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে সমাজের ভিত্তি আছে পারস্পরিক সম্পর্কে এবং ধর্ম সেই সম্পর্কের দ্রষ্টা। কারণ ধর্মই প্রতিটি ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ সত্তা হিসেবে শ্রদ্ধা করতে শেখায়।

অবশ্য একদল জড়বাদী পণ্ডিতের মতে ধর্ম জীবনের সমূহ ক্ষতি করেছে। এই মতের আধুনিক সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হলেন কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস। মার্কসের মতে ধর্ম মানুষকে সত্যভ্রষ্ট করেছে কারণ সামাজিক শোষণের চরিত্র ধোঁয়াটে করে দিয়ে পরজগতেই একমাত্র মুক্তির পথ খুঁজতে বলেছে। কার্যত তাই পৃথিবীতে শোষণ স্থায়ী হয়ে রয়েছে। ধর্ম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চিরকাল শোষণকে সমর্থন করে যাচ্ছে।

৫। ধর্মের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা (Marxist Interpretation of Religion):

সমাজ বিপ্লবের কার্যকারণ খুঁজতেই কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস সমাজ ও ধর্মের চরিত্র পরীক্ষা করেন। সমাজ বিষয়ে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে সমাজ কার্যত বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভক্ত এবং এই শ্রেণী বিভাগ সমাজিক উৎপাদন যন্ত্রকে স্বাধিকারে রাখবার জন্য তৈরি হয়েছে।

যাদের হাতে উৎপাদন যন্ত্র তারাই ক্ষমতাবান শ্রেণী ও তারাই সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের জীবনে একটিই লক্ষ্য কেমন করে বৃহত্তম জনসংখ্যাকে শোষণ করে তাদের শ্রমলব্ধ ফল নিজের কুক্ষিগত করা যায়। শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী শোষণ কায়েম করবার জন্য তারা নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করে। একদিকে থাকে শক্তির দাপট ও অন্যদিকে আরো গভীরে মানুষকে পদানত করা হয়। নানাভাবে প্রচার করে মানুষকে বিশ্বাস করানো হয় যে তারা অত্যাচারিত হতে বাধ্য, এই তাদের ভাগ্য। বর্তমান জীবনে তাদের কর্তব্য পালন করলে, বিনা প্রতিবাদে ভাগ্য মেনে নিলে তারা পরজন্মে ঈশ্বরের কাছে তার প্রতিদান পাবে। কারণ বর্তমান কালে তারা ভাগ্য মেনেছে, বিদ্রোহে ও প্রতিবাদে সমাজকে বিশৃঙ্খল করেনি। আগামী জন্মে তার ফল পাবে। কিন্তু যারা ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধে যাবে তাদের সমূহ অমঙ্গল। ধর্ম তাই মানুষকে পদানত রাখবার মস্তোবড়ো হাতিয়ার। ধনিক শ্রেণী ধর্মকে সর্বদাই অন্ধতার পর্দা হিসেবে ব্যবহার করে ও সম্ভাব্য প্রতিবাদকে থামিয়ে রাখে।

সমাজ চালায় ক্ষমতাবান শ্রেণী

মার্ক্‌স তাই বলেন যে এই কথাটা সম্পূর্ণ ভুল যে, ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করেছেন। জগত সৃষ্টি হয়েছে প্রাকৃতিক কার্য কারণে। তিনি বিজ্ঞানের ওপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, চৈতন্য থেকে জড় নয়, জড় থেকেই চৈতন্য এসেছে। জড়ের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আছে এবং তার পর্বে পর্বে ঈশ্বরকে কখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই প্রমাণ হচ্ছে ঈশ্বর মানুষের সৃষ্টি। মানুষ নিজের কল্পনা অনুযায়ী নিজের রূপেই ঈশ্বরকে গড়েছে। মার্ক্‌স তাই বাইবেলের দুটি বক্তব্য সম্পূর্ণ পাল্টে দেন 'ঈশ্বর নিজের প্রতিরূপে মানুষ সৃষ্টি করেছেন' এবং 'একদিন বললেন, আলো হোক আর অমনি আলো হলো', এবং বলেন এই বাক্য দুটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক।

জগত সৃষ্টি ঈশ্বর করেনি

মার্ক্‌স এই বক্তব্যে ঈশ্বর জন্মের ইতিহাসকে জানালেন, কিন্তু ধর্ম কি? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান যে ধর্মের জগতটা আসলে সমাজের উল্টো প্রতিচ্ছবি। সমাজে যা যা ঘটছে ও ঘটছে না তাকেই মানুষ ইচ্ছা পুরণের আনন্দে স্বর্গে ও ঈশ্বরের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে। ইহ জীবনে, জাগতিক বিশ্বের অন্যায়, অভাব, অনটন, শোষণ ও মৃত্যু এতো সত্য যে স্বাধিকারের

ধর্ম জগতের উল্টো প্রতিচ্ছবি

বাসনাহীন মানুষ অন্যত্র এমন একটি জগতের কল্পনা করেছে যেখানকার অবস্থা সম্পূর্ণ উল্টো। সেখানে কোনো অন্যায়ের কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু মানুষ এমন কল্পনা করে কোনো ? মার্কস বলছেন বিভিন্ন প্রচার ও শিক্ষার যুগসঞ্চিত মিথ্যায় মানুষের মন এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যে সে উপস্থিত চিত্রটিকেই ধর্মের নামে জগতের স্থায়ী সত্য মনে করে। যেহেতু এটাই ধর্মের নিদান সুতরাং সে নিজ বাহুবলে, সংঘবদ্ধতায় এই অবস্থা পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারেনা, ভাবতে রাজী নয়। কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাথা তুললে তার সমূহ ক্ষতি। ঈশ্বর তার মাথায় তখন চূড়ান্ত শাস্তি বর্ষণ করবেন। উদাহরণত যেমন প্রমিথিউসের বিখ্যাত গল্প। প্রমিথিউস দেবতা ছিলেন। তিনি মানবপ্রেমে স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে মানুষকে দান করেন। দেবরাজ জিউস জানতে পেরে তাকে চূড়ান্ত শাস্তি দেন।

এই কাহিনীটি ব্যাখ্যা করে মার্কস বলেন যে যুগযুগ ধরে কেমন মানুষকে এই সব কাহিনীর মধ্য দিয়ে ভয় দেখিয়ে রাখা হচ্ছে। পাছে তারা কখনো প্রতিবাদ করতে পারে এই ভয়ে পরজন্মের সুখস্বপ্ন তৈরি করে দিয়েছে। মার্কস তাই ধর্মকে 'বিপরীত চৈতন্য' নাম দিয়েছেন। যা সত্য তা সঠিকভাবে না দেখে ধর্ম ভুল পথে মানুষকে পরিচালিত করে।

মার্কস আরো একটি আপত্তি করেন। তিনি বলেন প্রত্যেক ধর্মই সত্তা আবিষ্কারের কথা বলে। কিন্তু সত্তা কি ? সত্তা কি কোনো অতি-প্রাকৃত বিষয় ? মার্কসের মতে সত্তা হলো সামাজিক অস্তিত্ব। সমাজেই মানুষের মনুষ্যত্ব অর্থাৎ সত্তা গড়ে ওঠে, কোনো ঈশ্বরের খেয়াল খুশিতে নয়। তাই সত্তার প্রসঙ্গ ধর্মের হাতে ছেড়ে দেবার কোনো কারণ নেই। ধর্ম বরং মানুষকে তার প্রকৃত সত্তা থেকে বিচ্যুত করে। সামাজিক পরিবেশে সমাজের সত্যে অধিষ্ঠিত হলেই সত্তার সার্থক মূল্য প্রতিষ্ঠিত হতো অথচ ধর্ম তাকে অতীন্দ্রিয় ও অপ্রাকৃত করে তুলছে। সে স্বর্গের কল্পনা করছে কিন্তু নিজের অধিকারের কথা ভাবছে না। সে কাঁদছে অভাবে কিন্তু নিজের জোরে দাবি করছে না।

সত্তা অতিপ্রাকৃত নয় সামাজিক

মার্কস তাই ধর্মকে বলেন 'জনতার আফিং'। কারণ ধর্ম মানুষকে আত্মসচেতনতার বদলে ঘুম পাড়িয়েছে, জানতে দিচ্ছেনা তার মুক্তির

স্বরূপ। মার্কস উদাহরণ স্বরূপ বাঙালী কবি নজরুল ইসলামের উদ্ধৃতি দিতে পারতেন। নজরুল লিখেছেন 'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছো মহান'। মার্ক্স বলবেন দারিদ্র্য বিষয়ে এই আত্মরতি ও মোহ সভ্যতার শত্রু। অন্যায়, অবিচার ও শোষণকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করবার পেছনে যে মন কাজ করে তা নিজের স্বার্থ বিষয়ে সম্পূর্ণ অচেতন। কারণ, দারিদ্র্য দূর করবার কথা নেই এই বক্তব্যে, তার বদলে দারিদ্র্যকে চিরস্থায়ী করবার সমস্ত রকম মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে, বর্ণাঢ্য ভাবে লোকেদের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে। মার্ক্স তাই চমৎকার বলেন যে 'Religion is only the illusory sun which revolves round man as long as he does not revolve round himself'। এই উদ্ধৃতিতে বোঝা যাচ্ছে মার্ক্স বলছেন ধর্মে মানুষের আত্মবিশ্বাস জয় করবার পরিকল্পনা নেই, আছে কেবল অনির্বচনীয় কোনো শক্তির খেয়াল খুশির সামনে মাথা নিচু করবার কথা। মানুষই যেনো স্বভাবতই দীন, তার পরাজয় সর্বত্র স্বীকৃত। অথচ মানুষ অন্য কোনো শক্তির পদনত নয়, মানুষ নিজের কল্পনার ঐশ্বর্যেই প্রকৃতিকে জয় করে। প্রকৃতিকে নিজের ছাঁচে গড়ে নেবার চেষ্টাতে নিজের ভাগ্য ও চরিত্রকে বদলায়। ধর্ম প্রতিমুহূর্তে ভরসা নষ্ট করে ইহ জাগতিক সত্য বিষয়ে কারণ ইহ জগত চলে ধনিক শ্রেণীর শোষণ ও স্বার্থপরতায়। মানুষ নিজের কেন্দ্রে ঘুরলে, নিজের ভাগ্যচক্রকে হাতের মুঠোয় ধরতে পারলে আর অত্যাচারীর ক্ষমতা থাকেনা। তাই ধর্মের চেষ্টা কেমন করে মানুষকে পরজগতের নামে নিজেদের স্বার্থে চালিত করা যায়।

ধর্ম জনতার আফিং

মার্কস তাই লেখেন 'Thus the criticism of heaven turns into criticism of the earth, the criticism of religion into the criticism of right and the criticism of theology into the criticism of politics.' কার্যত মার্কসের মতে ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কথায় নয়, কর্মে। কর্মের মাধ্যমে পৃথিবীকে বদলাতে পারলেই ধর্মের অবসান ঘটবে কারণ ধর্ম ইহজগতের অপ্রাপ্তি থেকেই পরজগতের প্রাপ্তির স্বপ্ন তৈরি করে। ধর্ম যেহেতু শোষণকে কায়েম করার ব্যবস্থা, তার সমালোচনা হলো রাজনীতির সমালোচনা। মার্কসের মতে 'দার্শনিকরা এতোকাল প্রচুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন, এবার কর্তব্য হলো জগত পরিবর্তন করা'।

সমালোচনা—মার্কসের সমালোচনায় শোষণের নিগূঢ় সত্য সর্বপ্রথম স্পষ্ট হয়ে প্রতীয়মান হয়। দারিদ্র্য, অন্যায় ও শোষণের কথা বহুকাল ধরেই মানুষের পরিচিত ছিলো কিন্তু মার্কস তার শিকড়ের সন্ধান করেন এবং কার্যকারণ সমেত তাকে বদলাবার পরিকল্পনা তৈরি করেন। এককথায় মার্কসের চিন্তায় নিপীড়িত জনগণ সর্বপ্রথম মুক্তির সম্ভাবনা দেখতে পেলো।

মার্কসের বক্তব্য মতো এ-কথাও ঠিক যে ধর্ম বহুক্ষেত্রেই শোষণকে সমর্থন করেছে এবং সমাজের প্রতিপত্তিশালী অংশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ধর্ম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহজগতিক সমস্যা বিষয়ে কম চিন্তিত থেকেছে, পর জগতের বিষয়েই মাথা ঘামিয়েছে বেশি। (এই অর্থে নিশ্চয়ই ধর্ম আফিংয়ের কাজ করেছে।) সামাজিক শ্রেণীবিভেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি।

তবু মার্কসের বক্তব্য সম্পূর্ণ স্বীকার করা যায় না। মার্কসের মূল প্রতিবাদ যদিও ধর্মের বিরুদ্ধে তবু আসলে তা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নয়, সংগঠিত ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের বিরুদ্ধে। মার্কস ধর্ম বলতে এই সাংগঠনিক ধর্ম, যেমন ক্যাথলিক বিশ্বাস ইত্যাদিকেই বুঝেছেন। য়ুরোপের ধর্ম সুরু থেকেই সংগঠন-কেন্দ্রিক এবং সংগঠনের স্বার্থেই প্রতিপত্তিশালীদের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক হয়েছে কারণ সংগঠন রক্ষার জন্য নানাবিধ সাহায্যের প্রয়োজন। মধ্যযুগের পূর্বে খৃষ্টধর্ম রাষ্ট্রের ধর্ম হয় ও পরে মধ্যযুগে সামন্ত প্রভুদের মতো জমিজমা নিয়ে কর্তা হয়ে ওঠে। গীর্জা ও তৎসংক্রান্ত ধর্ম যদি জমিদারী ব্যবস্থার সমর্থক হয় তবে স্বভাবতই সেই ধর্ম জমিদারীর বিরুদ্ধে যাবে না। পয়সার জন্য পোপরা একটা অবস্থায় মিথ্যার বেসাতি খুলে অজ্ঞ ধর্মভীরু জনতাকে 'মুক্তিপত্র' বিক্রী করেছেন। কাজেই গীর্জা সংগঠনের সঙ্গে শোষণের যোগ দৃঢ় হয়ে উঠেছিলো। মানবমুক্তির ধর্ম খৃষ্টধর্ম কালক্রমে মানব শোষণের ব্যবস্থা পাকা করে তোলে। মার্কসের প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ এই সংগঠন মূলক ধর্মের বিরুদ্ধে।

মার্কসের আপত্তি সংগঠনের বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে নয়

কিন্তু আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করলে ধর্মের বিরুদ্ধে মার্কসের আপত্তি দাঁড়ায় না কারণ সত্তাকে আবিষ্কার করাই যদি ধর্ম হয় তবে তার সঙ্গে সংগঠন ও স্বার্থের যোগ নেই। সংগঠন ছাড়াই ধর্মকে আচরণ করা যায় এবং ধর্মই বলবে অত্যাচার ও শোষণে ব্যক্তির সত্তা পরিপূর্ণতা লাভ

করতে পারছে না। কাজেই সত্তার মুক্তির জন্যই শোষণকে খর্ব করা যায়, শোষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানো যায়। প্রকৃত পক্ষে মার্কসবাদ ও ধর্মে কোনো মৌলিক বিরোধ নেই। বরং সত্তার আত্ম-প্রকাশের প্রশ্নে মার্কসবাদ ধর্মের মতো কথাই বলবে।

মার্কসবাদের আপত্তি হবে ঈশ্বর বিষয়ে। মার্কস ঈশ্বরের জায়গায় মানুষকে বসাতে চান কারণ মানুষের কল্পনার আদর্শেই ঈশ্বর সৃষ্ট হয়েছেন। ঈশ্বরের স্থানে মানুষ ও মানবতাবাদকে বসানোই মার্কসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনি বলেন মানুষে মানুষে সম্প্রীতির জন্য কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তা ও সম্পর্কের প্রয়োজন নেই। মানুষ সামাজিক কারণেই মানুষের প্রতি অনুরক্ত ও ঘনিষ্ঠ। তার জন্যে একজন স্রষ্টা ঈশ্বরকে প্রয়োজন করে না। কিন্তু মার্কসের এই বক্তব্য মানা সম্ভব নয়। মানবতাবাদ ধর্মের বা ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করতে পারে এ-কথা ভাবা যায় না।

মানবতাপদ মানুষের সভ্য প্রকাশ করতে সক্ষম

মানবতাবাদে দুটি মানুষ সত্য। তাদের বিরোধ ঘটতে পারে কিন্তু বিরোধের মধ্যেই মিলনের বীজ আছে। সুতরাং মানুষেরা পরস্পরকে ভালোবেসেই ঈশ্বরের স্থান দখল করতে পারবে। মার্কস কিন্তু দেখেননি যে শুদ্ধ মানবতাবাদে মানুষের কোনো প্রয়োজন মেটে না। মানুষকে স্বীকার করবার জন্যে অন্য কোনো একটা বড়ো আদর্শের দরকার। মানুষ ভালোমন্দ ন্যায় অন্যায় মিলিয়ে মানুষ। নিজেকে কেন্দ্র করে চলতে চাইলে হয়তো তার স্বার্থপরতা ও আত্মবোধই বাধা হবে। যেমন হব্‌স ভেবেছিলেন যে মানুষ কেবল নিজের স্বার্থই খোঁজে। অথচ সমাজবন্ধনের জন্য নিজেকে কিছুটা খর্ব করতে হয় অর্থাৎ স্বার্থত্যাগ করতে শিখতে হয়। মার্কস বলতে পারেন যে সমাজের কেন্দ্রে মানুষকে বসালে, মনুষ্যত্ব বিকাশের সুস্থ সামাজিক পটভূমি তৈরি করলেই স্বার্থবোধ কমে যাবে। কিন্তু এ-কথায় কোনো ভিত্তি নেই। মানুষ কেনো মানুষকে ভালোবাসবে, কেনো অন্যের জন্য আত্মত্যাগ করবে? এই প্রশ্নের জবাব মার্কস দেননা। মানবতাবাদে মানুষের স্বীকৃতি আছে কিন্তু মানুষকেই একমাত্র সত্য ধরে নিলে কি স্বার্থপরতা দূর হয়? আমাদের বক্তব্য, হয় না। তার জন্যে প্রয়োজন অন্য কোনো একটা বড়ো আদর্শ। সেই বড়ো আদর্শের বিশ্বাসে মানুষ নিজের আত্মপরায়ণতাকে ত্যাগ করতে শেখে। শুধুমাত্র নিজেকেই বিশ্ব সংসারের মূল ভাবে না।

পরিণতিই মানুষের লক্ষ্য এ-কথা এরিস্টটল বলেছেন। অন্যান্য দার্শনিকরাও মানুষের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের আলোচনা করেছেন। কিন্তু মানুষের এই পরিণতির বোধ কে স্থির করবে? মার্কসের মতে ধর্ম মানুষকে মিথ্যায় নিয়ে যায়। অর্থাৎ মানুষ নিজে থেকেই সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে পরিণতির কল্পনা করে। আমরা মার্কসের এই বক্তব্য স্বীকার করতে পারি না। ধর্মই মানুষকে উদ্দেশ্য ও কল্পনা দেয়। সমাজে মানুষ সম্পর্কের জগত তৈরি করে কিন্তু নিজের ক্রম-উদ্‌বর্তনের কল্পনা গ্রহণ করে ঐতিহ্য থেকে। ঐতিহ্যের পেছনে আছে ধর্মের বীজ কারণ ধর্মই শিখিয়েছে বিরাট বিশ্ব-জগতের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের কথা।

ধর্ম কেবলমাত্র শোষণের মুখোস হলে বুঝতে হবে ধর্মের আদ্যন্ত চরিত্রই অন্যায়ের। তবে ধর্ম মানুষের সম্ভাবনা ও চেষ্টাকে সমূলে নষ্ট করে। অথচ সভ্যতা সংস্কৃতির দিকে তাকালে জানতে পারা যায় যে এমন কোনো একটা বিভাগ নেই যেখানে ধর্ম ছাপ ফেলেনি। সঙ্গীত, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্র ও কাব্য—সংস্কৃতির প্রতিটি বিভাগেই মানুষের বিরাটত্বের কল্পনা এনে ধর্ম সৃষ্টির বৈচিত্র্যকে মানুষের মনে উন্মোথিত করেছে। ধর্মের সার কথাই—মনুষ্যত্বের বহুবিচিত্র প্রকাশ—সংস্কৃতির মুখ্য বিষয়। শোষণ-ভিত্তিক সমাজজীবন ধর্মের লক্ষ্য মনে করলে সংস্কৃতির চরিত্রকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

মার্কস বলেছেন ধর্ম ইহ জাগতিক সত্যের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ায়। নিজের শক্তিতে অন্যায় অবিচারের মূলোচ্ছেদ করতে দেয় না। ধর্ম মোহ বিস্তার করে ও পর জীবনকে কল্পনার রঙ লাগিয়ে মনোহর করে। কিন্তু মার্কস লক্ষ্য করেননি যে ধর্মের প্রকৃত সত্তার সঙ্গে বিপ্লবের কোনো বিরোধ নেই। ধর্ম মানুষকে মনুষ্যত্বের পথ দেখায়, মনুষ্যত্বের অবমাননা শেখায় না। অন্যায় ও অবিচারে মনুষ্যত্ব নষ্ট হলে ধর্ম আত্মাকে রক্ষা করবার কথাই বলে। স্বভাব নষ্ট করতে বলে না। সামাজিক অন্যায় ও শোষণকে ধর্ম স্বীকার করে না। ইহ জীবনকে অস্বীকারের প্রসঙ্গে মার্কস জানেন না যে ভারতবর্ষের শাস্ত্রে বারবার ঘোষণা করা হয়েছে ‘জীবন্মুক্তি’ লাভ করা যায়, যে-মুক্তি ব্রহ্মর্ষি জনকের মতো ইহ জীবনেই সম্ভব। জীবনযাত্রার লক্ষ্য ও নীতি বিষয়ে বলা হয়েছে, জীবনের চতুর্বর্গ হলো ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। অর্থ ও কাম, যা ইহ জীবনের মূলমন্ত্র,

ধর্ম মোহগ্রস্ত করে না, মনুষ্যত্ব শেখায়

এই বক্তব্যে যথোচিত মূল্য পাচ্ছে। কখনোই বলা হয়নি যে সবকিছু ত্যাগ করতে হবে। বরং বলা হচ্ছে ইহ জীবনের কর্তব্য না-করাটাই অন্যায়।) স্বভাবের পরীক্ষা ও প্রকাশ স্থান কালেই হবে, পর জীবনে নয়। শুধু ধর্মকে আশ্রয় করে চলতে হবে। অর্থাৎ যতোদুর সম্ভব মোহকে ত্যাগ করতে হবে। মোহেই আত্মরোধ ও স্বার্থপরতা। কাজেই নির্মোহ চিত্তে কর্ম করতে পারলেই জীবন ও সংস্কৃতির প্রতি নিজের কর্তব্য করা হয়। ধর্মের এই বক্তব্য মার্কসের কথাকে সম্পূর্ণ অপ্রমাণ করে।

৬। **শিক্ষা ও ধর্ম (Religion in Education)**

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ ও য়ুরোপে শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিলো। য়ুরোপে শিক্ষা ব্যবস্থা চালাতেন গীর্জার আনুকুল্যে ধর্মযাজকরা, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও পরিচালিত হতো ধর্মযাজকদের দ্বারা। ভারতবর্ষে শিক্ষায় প্রধান ছিলেন ব্রাহ্মণেরা। তাঁরা শাস্ত্রসম্মতভাবে শিক্ষার্থীদের পরা ও অপরা বিদ্যায় পারদর্শী করে দিতেন। ধর্ম জীবনের সমস্ত স্তর ব্যেপে থাকায় ধর্মের পরিমণ্ডলের বাইরে কোনো শিক্ষাই পূর্ণাঙ্গ ছিলো না। কিন্তু বর্তমান কালে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ধর্মকে শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেবার কথা উঠেছে। বিজ্ঞানবাদী তাত্ত্বিকরা ঘোষণা করেছেন যে শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের কোনো যোগ নেই, শিক্ষা ব্যবহারিক জ্ঞানার্জনের বিষয়। ইহজগতে মানসিক ও প্রাকৃতিক বিষয়াদি সম্পর্কে জানলেই চলে। ধর্মের সঙ্গে এই সমস্ত শাস্ত্রের কোনো যোগ নেই। ধর্ম কিছু প্রাচীন, অর্থহীন, মৃত বিষয়কে বোঝার মতো মাথায় চাপাবে।

দ্বিতীয়ত ওঁরা বলেন যে বিভিন্ন ধর্মের প্রচার থাকলে শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মীয় রেষারেষির স্থান হয়ে উঠবে। শিক্ষার্থীদের মন সঙ্কীর্ণ ও পরশ্রী-কাতর হবে। কারণ যে যার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে এবং প্রমাণ করতে চাইবে। এক কথায় শিক্ষা থেকে তখন সুস্থ, পরিচ্ছন্ন ও গণতান্ত্রিক আবহাওয়াটি দূরীভূত হবে।

তৃতীয়ত বলা হচ্ছে যে শিশুমনে ধর্মের শিক্ষা সমস্ত সৃষ্টিশীলতা নষ্ট করে। যেমন অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জ লিখেছেন 'The attempt to impart particular creeds to immature minds is evidently open to serious objection. If it succeeds in its object, it tends to produce an attitude of mind to which religion is rather a

deadening tradition than a living inspiration, and a force that separates individual from his fellows instead of uniting him with them.' শিশুর মনে ধর্ম বোঝা চাপায় ও তাকে বর্তমানের জীবন-প্রবাহ থেকে তফাতে সরিয়ে এনে সমাজের সমগ্র জীবন যাত্রার সঙ্গে একটা বিরোধ তৈরি করে।

চতুর্থত অনেক বলছেন যে শিক্ষার উদ্দেশ্য ভেতর থেকে উন্নতি ও বিকাশ, বাইরের থেকে নয়। অর্থাৎ শিশু যেমনভাবে বিকাশ পায় তার ব্যবস্থাই করতে হবে। ধর্ম বাইরে থেকে অনুশাসন ও পাঠের বোঝা চাপায়, তাই ধর্ম শিশুর পক্ষে বাধা স্বরূপ।

এই সমস্ত কারণেই বর্তমান কালে পণ্ডিতরা শিক্ষাকে secular বা বস্তুনিষ্ঠ করতে চাহেন। অনেকে এই শব্দটির দ্বারা 'ধর্মনিরপেক্ষতা'ও বোঝেন। অর্থ যাই হোক, বর্তমানের প্রধান ঝোঁকই ধর্মকে সম্পূর্ণ বাদ দেবার দিকে।

কিন্তু এই বক্তব্যগুলির একটিকেও সমর্থন করা যায় না। কারণ এই সমস্ত প্রতিবাদের একটিও ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে সত্য ধারণায় পৌছোয়নি। ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞতা থেকেই নানা অবান্তর আপত্তি তোলা হয়েছে।

আমরা ধর্ম বলতে কিছু তৈরি তত্ত্ব বুঝিনি। ধর্মকে বলেছি ব্যক্তির আত্ম আবিষ্কারের কথা, সত্তার প্রকৃত উদ্বোধনের কথা। সত্তার প্রসঙ্গ একটি জাতির সমগ্র মানস ও সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে থাকে। প্রত্যেক ঐতিহাসিক ধর্মের নিজস্ব পৃথক পৃথক কিছু বক্তব্য থাকে, আচরণীয় কর্মও থাকে। যেমন খৃষ্টতত্ত্বে সৃষ্টির কারণ মানুষের আদি পাপ, আর সৃষ্টি ভারতীয় তত্ত্বে আনন্দের প্রকাশ। তৎসত্ত্বেও কিন্তু ধর্মের আত্যন্তিক চরিত্রের কারণে ভারতীয়তত্ত্বের মতোই খৃষ্টধর্ম মনুষ্যত্ব ও সত্তার কথা বলে, আত্মাবিষ্কারকেই জীবনের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করে। কারণ খৃষ্টতত্ত্বের মতে ঈশ্বর নিজের রূপেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ভারতবর্ষে বলা হচ্ছে মানুষ অমৃতের সন্তান। সুতরাং খৃষ্টধর্মে মানুষকে যেমন তাদের সৃষ্টিকর্তা পিতার কাছে ফিরে যেতে হবে, তেমনি ভারতীয়রা জানে আনন্দেই তারা লীন হবে। সুতরাং বর্তমানের পণ্ডিতরা যখন বলেন ধর্মের সঙ্গে ইহ জাগতিক, প্রাকৃতিক ও মানবিক শাস্ত্রের কোনো যোগ নেই তখন ওঁরা জীবনের সঙ্গে জ্ঞানকে নিছক ব্যবহারিক অর্থে দেখেন। শিক্ষাকে

ধর্ম ব্যক্তি সত্তার উদ্বোধন

মনে করেন সঙ্কীর্ণ ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধির বাহন। প্রয়োজন আবার মনুষ্যত্বের প্রতিমানে নয়, শুধুই বিত্তসঞ্চয়ের অর্থে। একারণেই দেখেছি যে, বর্তমানে বিজ্ঞানের প্রচণ্ড উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষের নৈতিক-বোধের উন্নতি হয়নি। বৈষয়িক প্রাচুর্যের চূড়ায় বসে মানুষ অন্য মানুষকে না-খাইয়ে মারতে পারে বা মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতায় সমস্ত সভ্যতাকে ধ্বংস করার স্বপ্ন দেখতে পারে।

ধর্মই একমাত্র মনুষ্যত্বের অভিজ্ঞান দেয়। শিক্ষা থেকে মানুষ যেদিন ধর্মকে বাদ দিয়েছে সেদিন থেকেই মনুষ্যত্বের অবমাননা বিরাট হয়ে দেখা দিয়েছে।

ধর্মশিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় রেষারেষির কোনো সম্পর্ক নেই। ধর্ম শিক্ষার অর্থ বিভিন্ন ধর্মের সার সত্যকে প্রকাশ করা, স্বভাবের নিজকথা শোনানো। তার সঙ্গে হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টধর্মের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। খৃষ্টভক্ত ছাত্র যেমন স্থিরভাবে জগতে ধর্মের মূলীভূত সত্যকে জানতে পারবে, তেমনি মুসলমান ছাত্রও একই রকমে আত্মবোধের কথা জানবে। সেক্ষেত্রে কোরাণ, বাইবেল বা গীতাকে বাছাই করবার কোনো কারণ নেই। সর্বত্রই একই কথা কমবেশি উচ্চারিত। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে-সংঘর্ষের কথা ভাবা হচ্ছে তার কারণ রাজনৈতিক। বাড়তি কোনো উদ্দেশ্যের চাপে ধর্মকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করা হলেই গোলোযোগ দেখা দেয়। তার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নেই, সম্পর্কিত ব্যক্তিরাই সেখানে প্রধান। একটি উদাহরণ দিলে কথাটা বোঝা যাবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকে আগে 'শ্রী' শব্দটি বসানো ছিলো। অবিভক্ত বাঙলায় মুসলিম লীগের প্ররোচনায় 'শ্রী' উঠিয়ে দেবার আন্দোলন চলে এবং শেষ পর্যন্ত 'শ্রী' উঠে যায় কারণ মুসলিম লীগের মতে 'শ্রী' শব্দটির অর্থ সরস্বতী। সরস্বতী বলায় পৌত্তলিকতার নাকি পরিপোষকতা করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত ধর্মের প্রতিষ্ঠান সুতরাং পৌত্তলিকতা চলবে না। সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় যে 'শ্রী' ও পৌত্তলিকতা কার্যত রাজনীতির লীলায় এক হয়ে গেছে। ধর্মের প্রকৃত সত্তা এই বক্তব্যে ব্যাহত। এখানে ইসলামের যেমন সত্য প্রকাশিত নয়, তেমনি ভারতীয় ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞতাও প্রকট। কাজেই এই আপত্তিটি যুক্তিসিদ্ধ নয়। কারণ শ্রীর অর্থ কল্যাণ ও সুষমা। 'শ্রী' শব্দটি কোনো পৌত্তলিকতার নির্দেশক নয়।

ধর্ম-শিক্ষা ও ধর্মীয় রেষারেষির যোগ নেই

অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি ধর্মশিক্ষা বলতে কিছু আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি ও পুঁথিগত আলোচনা বুঝেছেন। তাই মনে করেছেন যে এমন ধর্ম শিক্ষায় শিশুর মন সংস্কারে ভারাক্রান্ত হবে। যেমন, বাইবেলে বলা হচ্ছে ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করেছেন অথচ আমরা ডারয়ুইনের তত্ত্বে শিখেছি বাঁদরজাতীয় জীব বিবর্তনে মানুষ হয়েছে। বাইবেলের কথা মানলে বিজ্ঞানকে অস্বীকার করতে হয়। এই বিষয়ে সবচেয়ে বিখ্যাত কাহিনী মার্কিন আমেরিকার একটি রাষ্ট্রের ঘটনা যেখানে বাইবেল ও ডারয়ুইন নিয়ে বিরাট মামলা হয়েছিলো। ওই রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী ডারয়ুইনের কথা ছাত্রদের বলা নিষিদ্ধ ছিলো। একজন শিক্ষক সে-কথা বলায় মামলার সূত্রপাত। ধর্মকে শুধুমাত্র এভাবে দেখলে নিশ্চয়ই অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির কথা সত্য। একথাও মানতে আপত্তি নেই যে ধর্মের সঙ্গে নানা অবান্তর সংস্কার জড়িয়ে আছে। কিন্তু আমরা বলছি প্রকৃত ধর্মের কথা। যে-ধর্মে মনুষ্যত্ব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, যে-ধর্মে অনুষ্ঠান ও আচার বড়ো কথা নয়। সত্তার কথাই প্রধান। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য আচার অনুষ্ঠানের কোনো প্রয়োজন নেই। তারা ধর্মের মূল কথাটুকু শিখবে মাত্র।

ধর্ম-শিক্ষা পুঁথিগত নয়

শিক্ষার অর্থ যদি অন্তরের উন্নতি হয় তবে একমাত্র ধর্মই তা পারে। কারণ, ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার কথা একমাত্র জানায় ধর্ম। শুধু জানায় না, তা পরিপূর্ণ করবার দিকে আমাদের সাহায্য করে।

ধর্মের স্বপক্ষে আরো বলবার কথা থাকে। কোনো দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক, জীবনের লক্ষ্য, বিশ্বাসের নানা স্তর—সবই ধর্ম প্রকাশ করতে পারে। ধর্মকে বাদ দিলে জীবনযাত্রার কোনো আচার অনুষ্ঠান ও সংগঠনকেই পূর্ণ অর্থে জানা যাবে না। যেমন ধরা যাক ভারতীয় বর্ণাশ্রম প্রথা। সমাজতাত্ত্বিকেরা এর মধ্যে শোষণ, অবিচার, শ্রেণীভেদ ইত্যাদি অনেক কিছু দেখেছেন। কিন্তু আমাদের মতে বর্ণাশ্রমের প্রকৃত তাৎপর্য ভারতীয় ধর্ম ছাড়া স্পষ্ট হয় না। কারণ তার সঙ্গে জড়িত আছে কর্মবাদ ও কর্মচক্রের কথা, আছে জীবনের লক্ষ্য ও বৃত্তি-নির্ভর মনুষ্যত্বের কথা। এমন কি অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জিকেও মানতে হয়েছে যে, 'To know about the Greeks, for instance, one must have some sympathy with their outlook on the universe',

সাহিত্য শিল্প বিষয়েও একই কথা। ধর্মের চাবিকাঠি ছাড়া তাদের রহস্যপুরী কিছুতেই খুলতে পারে না। দান্তের 'দিব্যজীবন' কাব্য বা আমাদের 'গীতা' নিশ্চয়ই নিছক কাব্য হিসেবে মন মাতাতে পারে কিন্তু তার পূর্ণ উপলব্ধি কখনোই সম্ভব নয় যদি না আমরা খৃষ্টতত্ত্ব ও ভারততত্ত্ব বিষয়ে অবহিত হই। গীতা বা দান্তের অন্তরে প্রবেশ করতে হলে আমাদের ধর্মের পাঠ গ্রহণ করতেই হবে।

সবশেষে একথা মনে রাখা দরকার যে ভবিষ্যৎ সৌভ্রাত্রের ভিত্তিও ধর্ম যেহেতু ধর্মেই ক্ষুদ্র স্বার্থ পেরিয়ে যাবার কথা থাকে। ধর্মেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথা মতো, জীবনে পাঁকাল মাছের মতো থাকবার শিক্ষা লাভ করা যায়। মোটামুটি নিঃস্বার্থভাবে কাজের শিক্ষা ধর্ম দেবে।

৭। ধর্মের ত্রুটি (Defect of Religion)

অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি ধর্মের ত্রুটি বিষয়ে একটি তালিকা তৈরি করেছেন। এই তালিকায় আছে—

(ক) কুসংস্কার—প্রত্যেক ধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই কিছু কিছু বিশ্বাস জড়িয়ে গেছে যা যুক্তিতে সমর্থন করা যায় না বা যার প্রয়োজন জীবনের দিক থেকে, আত্মাবিষ্কারের দিক থেকে নিছক শূন্য। ওই সংস্কারগুলো জীবনকে অগ্রগমনে সাহায্য করবার বদলে বন্ধনের সৃষ্টি করে। জনসাধারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সংস্কারগুলোকেই ধর্ম মনে করে। লোকাচার, দেশাচার ইত্যাদিতেই এই সংস্কারগুলোর প্রকাশ। যেমন ধরা যাক, ভারতীয় ধর্মের সঙ্গে হাঁচি, কাশি, টিকটিকি ইত্যাদি জড়িয়ে আছে। শনি মঙ্গলবার যেমন লাউ বা বেগুন খাওয়া নিষিদ্ধ ইত্যাদি। সত্তা বা আত্মাবিষ্কারের সঙ্গে এদের কোনো যৌক্তিক সম্বন্ধ নেই।

(খ) পৌত্তলিকতা—বহু ক্ষেত্রে ধর্মের মৌলিক চরিত্র ভ্রষ্ট হয় এবং পরিবর্তে নানাজাতের বস্তু ও দ্রব্যকে ধর্মের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করবার চেষ্টা করা হয়। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির এই বক্তব্য নিতান্তই অস্পষ্ট ও অর্থহীন। কারণ প্রত্যেক ধর্মের সঙ্গেই কিছু না কিছু প্রতীকী ব্যাপার থাকে। প্রতীকের মাধ্যমেই ধর্মের সত্যকে প্রকাশ করা হয়। যেমন ধরা যাক ভারতীয় ধর্ম। দার্শনিক হেগেল মনে করেছিলেন যে ভারতীয় হিন্দুরা বিবর্তনের নিম্নস্তরের জীবকে যেহেতু শ্রদ্ধা করে, পুজো করে সেহেতু তারা নিম্নস্তরের মানসিকতা ও পৌত্তলিকতার পরিচয় দিচ্ছে।

পৌত্তলিকতা শব্দটি পুতুলের সঙ্গে জড়িত। ভারতীয়েরা সত্যি সত্যিই পুতুল পুজো করে কিনা এ-বিষয়ে হেগেল বিশেষ ভাবার চেষ্টা করেননি। কারণ, ভারতীয়রা সমস্ত বিশ্বচরাচরে ব্রহ্মের প্রাণের লীলাকে উপলব্ধি করেছে। তাই তাদের কাছে এমন কোনো বস্তু বা প্রাণী নেই যা ঈশ্বরের প্রকাশ নয়। সুতরাং নিম্ন স্তরের জীবকে যদি পূজো করাই হয় (যেমন গরু) তবে তা প্রতীক হিসাবেই করা হয়, প্রাণের সঙ্গে যার যোগ অত্যন্ত গভীর। আর প্রতিমা পূজোর ক্ষেত্রে আমরা জানি যে জড় প্রতিমা পুতুলই বটে কিন্তু ভারতীয়রা পূজোর পূর্বে প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেই অর্চনা করে। তেমনি প্রাণকে বিসর্জন দিয়েই প্রতিমাকে বিসর্জন দেওয়া হয়।

(গ) অন্ধতা—সমস্ত ধর্মেই আপ্তবাক্যে বিশ্বাস মূল কথা। আপ্তবাক্যে বিশ্বাসের ফলে মানুষের বিচার বুদ্ধি জাগ্রত হয় না। এ-কথা নিশ্চয়ই সত্য যে ধর্মের সঙ্গে নানা অন্ধতা ইতিহাসে স্বাক্ষর রেখেছে কিন্তু ধর্ম অর্থেই অন্ধতা বোঝায় না। অন্ধতা ব্যক্তি-সাপেক্ষ ও লোকাচার-সাপেক্ষ। ধর্ম বরং সমস্ত সময়েই সত্যকে মিথ্যা থেকে, আলোকে অন্ধকার থেকে তফাৎ করতে নির্দেশ দেয়। আপ্তবাক্য নিশ্চয়ই ধর্মে স্থান পেয়েছে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ব্যক্তিরা নিজস্ব উপলব্ধির পথে এগোবে না। ভারতীয় ধর্মে যেমন তিনটি প্রস্থানকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই প্রস্থানত্রয়, উপনিষদ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রকে মূল্য দেবার অর্থ এই নয় যে সমস্ত কিছুই চোখ বুঁজে মানতে হবে। বারবার বেদজ্ঞ জ্ঞানীরা বলছেন যে নিজের মতো ধর্মের সত্যকে মেনে নিতে হয়। মানলেই সত্য লাভ হয় না, বিচার করতে হয়, শঙ্করাচার্য যেমন নেতি নেতি করে ব্রহ্মজ্ঞানে পৌছতে চেয়েছেন ; বা, স্বামী বিবেকানন্দ যেমন যাচাই করে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে স্বীকার করেছিলেন। আমরা আপ্তবাক্য শুনি পূর্বসূরীদের সাধনার তাৎপর্য বুঝবার জন্যে, তাঁদের ধ্যানের আলোকে জীবনযাত্রা নতুন ভাবে ছকে নেবার জন্যে। য়ুরোপে যেমন সন্ত ফ্রান্সিস বা সন্ত বেনেডিক্টের জীবন কথা অনেকের পালনীয়। ওঁরা নিজের মতো সত্যকে জেনেছিলেন বলেই পরবর্তীরা তাঁদের সাধনার পথে নিজেদের জীবনকে গড়বার কথা ভাবে। অন্ধের মতো অনুসরণে নিশ্চয়ই সত্যের কাছে পৌছোনো যায় না। সুতরাং অন্ধতা বাদ দিয়ে নিজের চর্চায় সত্যকে খোঁজার কথাই ধর্ম জানায়।

(ঘ) সঙ্কীর্ণতা—ধর্মের সঙ্গে সঙ্কীর্ণতা এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে যে এক ধর্মাবলম্বী অন্য ধর্মের সত্যকে স্বীকার করতে চায় না। এই মনোভাব নিঃসন্দেহেই ক্ষতিকর। কারণ, ধর্মের মূল চরিত্রের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলতেন 'যতো মত ততো পথ'। উদাহরণ দিয়েছিলেন যে এক জলকেই কেউ বলে পানি, কেউ ওয়াটার ও কেউ একোয়া। কার্যত জল কিন্তু জলই। নাম ভেদে তার চরিত্র বদলায় না। প্রত্যেক ধর্মেই ঈশ্বরে পৌছাবার কথা আছে সুতরাং প্রত্যেক ধর্মই শ্রেষ্ঠ।

(ঙ) গোঁড়ামি—সঙ্কীর্ণতার সঙ্গেই গোঁড়ামি থাকে। অন্যের সত্যকে স্বীকার না করাতেই গোঁড়ামির প্রকাশ। গোঁড়ামি ধর্মের চরিত্র নয়, ধার্মিক বা ধর্ম প্রবক্তাদের কীর্তি।

(চ) ভণ্ডামী—ধর্মের নামে অনেক জাল জোচ্চুরি চলে। যেমন ভণ্ড সাধু, গণৎকার ইত্যাদির ব্যবসা; তাগা তাবিজ মাদুলীর প্রচার ভারতীয় ধর্মের সঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু এসবও ধর্ম নয়, ধর্ম-ভীরুতার সুযোগ নিয়ে ব্যবসায় ও লাভের কথা।

(ছ) ব্যক্তিত্ববাদ—কখনো কখনো কেউ প্রবহমান ধর্মের ধারা থেকে সরে একে ব্যক্তিগত ভাবে কোনো ধর্মের প্রচলন করতে পারে। কিন্তু এইসব ব্যক্তিরা প্রতিভাবান না-হলে জীবনের সমূহ ক্ষতি হয়। বাঙলা দেশে যেমন রাজা রামমোহন রায় বুদ্ধি বিবেচনায় ভারতীয় হিন্দু ধর্মের সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। ব্রাহ্ম আন্দোলনের চরিত্র বিষয়ে বর্তমান পণ্ডিতদের প্রচুর মতভেদ। কেউ বলেন এই আন্দোলনে উনিশ শতকে বাঙলাদেশে প্রচুর উন্নতির সূত্রপাত হয়েছে যাকে বলা হয় 'বাঙলার নব জাগরণ'। অন্যদল বলেন যে ব্রাহ্ম আন্দোলন ভারতীয় জীবনের বিরাট ক্ষতি করেছে।

(জ) অতীন্দ্রিয়তাবাদ—ব্যক্তিগত ধর্মের সঙ্গে অতীন্দ্রিয়তাবাদ জড়িত। অতীন্দ্রিয়তাবাদের নামে নানা অসত্য প্রচলিত হতে পারে। কিন্তু ম্যাকেঞ্জি যেমন অতীন্দ্রিয়তাবাদকে মনে করেন 'মানবতার সংগ্রাম-বিচ্যুত' তা ঠিক নয়। সাধকদের অতীন্দ্রিয়তাবাদ দৈনন্দিনের সত্যের বাইরে ধর্মের সত্যকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সাধারণের জন্য স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করে।

(ঋ) প্রচলিত ক্রিয়াকলাপ—ধর্মের মূলসত্য জীবন থেকে মুছে গেলে পড়ে থাকে বাহ্য ক্রিয়াকলাপ। বহু ব্যক্তিই জীবনে এই ক্রিয়াকলাপ আচার অনুষ্ঠান নিয়েই ব্যাপৃত থাকেন কিন্তু ধর্মের সত্যকে জীবনে প্রকাশ করবার কথা ভাবেন না। যেমন খৃষ্ট ভক্তরা রোববার গীর্জায় যান, আমরা পথেঘাটে ঠাকুরকে হাত তুলে নমস্কার করেই খালাস। কিন্তু চুরি, জোচ্চুরি, প্রতারণা কিছুই বাদ দিইনা।

(এ) অধর্ম—ধর্মের বিপরীত অবস্থা অধর্ম। অধর্মে মানুষ কোনো কিছুতেই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সমর্পণ করতে চায় না। এই বক্তব্য কিছুই সত্য নয়, কিছুই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

1. How far do you think Religion is a cohesive force? (C. U. 1962)

2. What is the social value of Religion? Is religion the opium of the masses? (C. U. 1992)

3. Explain and Examine the Marxist view of religion.

4. 'Education must be secular'—Do you accept the statement? Show your own arguments for the education to be religion-oriented,

5. What is the meaning of religion? What are its chief aspects?

6. What are the defects of religion? Are they inherent in religion?

7. What should be the relation between religion and organisation? Is there any religion without any organisation?

8. Discuss—'Its (religion) meaning to man is not dependent upon what it is, so much as upon what he is?'

9. Is religion only 'propitiation or conciliation of powers superior to man'? Show reasons for the position you will take.

10. Critically examine certain definitions of religion and try to arrive at your own.

দ্বাদশ অধ্যায়

সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির সংগঠন

১। সংস্কৃতির অর্থ (Meaning of Culture) :

সংস্কৃতি শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সঙ্গে সংস্কার জড়িত। সংস্কার অর্থাৎ পরিমার্জনা। যা আছে বা ছিলো তাকে নতুনরূপ দেবার সঙ্গেই সংস্কৃতির যোগ। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, কি আছে বা ছিলো যাকে সংস্কার করতে হবে? প্রশ্নটির জবাবে আমাদের ধরে নিতে হয় যে পূর্ববর্তী এমন কোনো অবস্থা বা বক্তব্য আছে যা বর্তমানের প্রয়োজনের সঙ্গে পরিবর্তিত হওয়া উচিত। কারণ, লুকোনো অবস্থা বা বক্তব্য আর বর্তমানের সত্যকে প্রকাশ করছে না। এ-কথা মানলে আরো একটি বাড়তি প্রশ্ন ওঠে যে কেমনভাবে বা কোন্ নীতিতে সংস্কার করা হবে? প্রশ্নটির তাৎপর্য খেয়াল করতে হয় যেহেতু প্রত্যেক সংস্কারের সঙ্গে ভবিষ্যত বা বর্তমান জড়িত। বর্তমান ও ভবিষ্যতের কষ্টিপাথরেই পরিবর্তনকে বিচার করতে হয়। অতীতে যা ছিলো তা বর্তমানে কতোটুকু প্রয়োজনে আসছে জানবার জন্যে আমাদের স্বীকৃত নীতির সাহায্যে মনস্থির করতে হয়। প্রতিটি সংস্কারের সঙ্গে যেহেতু গ্রহণ ও বর্জন জড়িত থাকে।

সংস্কার ও সংস্কৃতি

অতীতে কি ছিলো বা আছে এই প্রশ্নটিকেও সম্পূর্ণ বর্তমানের সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত অবস্থায় জবাব দেওয়া যায় না। কারণ, সমস্ত প্রসঙ্গটাই জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে হয়। জীবন একটানা প্রবহমান, তার রূপভেদ আছে, সম্বন্ধ ভেদ আছে, তার প্রয়োজন সদাই পরিবর্তিত হচ্ছে স্থানকাল পাত্রের চাপে। জীবন যদি বিচারের পট হয় তবে অতীতের প্রসঙ্গে আমরা জীবনকেই নানাভাবে বুঝতে চাই। জীবনের প্রকাশ হয় কর্মে এবং কর্ম তখনিই কর্ম যখন তা সচেতন ও স্বাধীন। প্রকৃতির অনুবর্তী ও প্রকৃতির নিয়ন্ত্রিত কর্মের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। তা আমরা করতে বাধ্য। আর যা প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তার ভালোও নেই, মন্দও নেই। যেমন ক্ষুধাদ্রেক হয় প্রকৃতির জীবন-ধর্মের নিয়মে। তাকে আমরা কখনোই বিচার করতে বসিনা। এই ক্ষুধাদ্রেকের সূত্রে যে-কর্মে মানুষ আত্মপ্রকাশ করে, তারই ভালোমন্দ থাকে। ক্ষুধাকে প্রকাশিত

সংস্কৃতির সঙ্গে বর্তমানের যোগ

করবার জন্যে কেউ চুরি করতে পারে, কেউ দোকান লুঠ করতে পারে, আবার কেউ ন্যায্য মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করতে পারে। এই তিনটি কর্মের কোন্‌টি কে করবে তা সাধারণতই নির্ভর করে ব্যক্তির স্বকীয় চিন্তার ওপর। একটি পথকে সে বেছে নিলে সেই মুহূর্তে অন্য পথগুলো বাতিল হয়ে যায়। এখানে ব্যক্তিটি স্বাধীন কর্মে নামছে সুতরাং তার কর্মের বিচার আলোচনায় স্বীকৃত হচ্ছে।

স্বাধীন কর্মের সূত্রে ব্যক্তি তার জীবনের প্রয়োজনকে নানাভাবে মেটায়। প্রথমত তাকে বস্তু সংগঠন ও জীবন সংগঠন তৈরি করতে হয়। বস্তুসংগঠনে তার প্রাথমিকভাবে বাঁচাটাই থাকে আর জীবন সংগঠনে ওই বাঁচার প্রসঙ্গটিকে আরো কিছুটা সম্প্রসারিত করা হয়। তখন আর বাঁচার কথা তেমন প্রত্যক্ষ থাকে না, অন্যান্য অনেক সংগঠন জীবনের নানা দিক প্রকাশ করবার জন্য তৈরি হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আমরা বস্তুসংগঠন বলি আর জীবন সংগঠন হচ্ছে পরিবার, গোষ্ঠী, সংঘ, সমিতি ইত্যাদি বিভিন্ন সংগঠন। এগুলো বাঁচার জন্যেই প্রয়োজন কিন্তু বাঁচার উদ্দেশ্য এখানে শুধু বাঁচাই নয়, এ্যারিস্টটল কথিত ভালোভাবে বাঁচা। অর্থাৎ জীবনের লক্ষ্য প্রত্যক্ষ প্রাথমিক স্তর থেকে এখানে অনেক সরে এসেছে, পরোক্ষ হয়ে উঠেছে।

এই দুটি সংগঠনের সঙ্গে ভালোভাবে বাঁচার কথাতেই মানুষের সংস্কৃতির কথা। কারণ শুধু বাঁচাই যেহেতু সব নয়, মানুষ বাঁচাব প্রকরণে তার স্বাধীনতার ছাপ ফেলে। পূর্ববর্তী উদাহরণে যেমন বলা হয়েছে বাছাইয়ের সঙ্গে মানুষের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়। প্রকৃতির নিয়মে বাঁচাটা সিদ্ধ হলে বা বাঁচবার প্রয়াসেই মানুষ প্রকৃতি থেকে যেহেতু তফাতে সরে এসেছে এবং বিশ্বজগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষয়ে চিন্তিত হয়েছে, মানুষ বাঁচাটাকে নিজের মতো করে রূপ দিতে চায়। এই রূপটার সঙ্গে নিছক স্বার্থ বা প্রয়োজনের কোনো যোগ নেই। যোগ আছে 'ভালোভাবে'র সঙ্গে। এই ভালোর অর্থ মানুষেরাই খুঁজে বের করে। ভালোর সঙ্গেই তাদের জীবনের সমগ্র কল্পনা জড়িয়ে থাকে। যেমন আলটামিরার গুহার দেয়ালে চিত্র যে-মানুষেরা এঁকেছে, তারা কুড়ি হাজার বছর আগেই বাঁচার সঙ্গে ভালোভাবে বাঁচার যোগ আবিষ্কার করেছে। প্রথমে তাই আমরা বলবো ভালোভাবে বাঁচার সঙ্গে আশু স্বার্থের কোনো যোগ নেই, নিছক প্রয়োজনটুকু মেটাবার জন্য তারা তৈরি

হয়নি। বিশ্বজগতের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক ভাবতে ভাবতেই তারা নানা রূপের প্রকাশ আরম্ভ করে এবং প্রকৃতি নির্দিষ্ট বস্তুকে ভেঙেগড়ে নতুন রূপ দিতে থাকে। যেমনটি তারা প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণকে স্বীকার করেই নিজেদের প্রকৃতির নিয়মের বাইরে দাঁড় করাতে চায় স্বাধীন ইচ্ছা ও সঙ্কল্পের প্রকাশে। প্রকৃতিকে ভেঙে গড়বার সূত্রেই ভালোভাবে বাঁচা তৈরি হয় অর্থাৎ নিজেদের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় স্পষ্ট হয় এবং সংস্কৃতি গড়তে থাকে। কার্যত তাই একটি সুন্দরপাত্রই সংস্কৃতি নয়, সংস্কৃতি নিজের স্বাধীনতার প্রত্যয়।

আমরা পূর্বেই যেমন সংস্কৃতিকে সংস্কার বলেছি এখন তার উৎস বুঝবার সময় নিশ্চয়ই ধরতে পারবো যে সংস্কার কার্যত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাকৃতির নিয়মকে ভাঙা ও নিজের মতো গড়া। ধরা যাক একটি মাটির পাত্রের কথা। মাটি জুগিয়েছে প্রকৃতি। মাটির নিজস্ব রঙ আছে, এবং নিজস্ব টানও আছে তার। অর্থাৎ যেমন খুশি তাকে দিয়ে সব কাজ করানো যায় না। মানুষ সংস্কার করলো এইভাবে যে সে নিজের কল্পনার ছাঁচে মাটির রঙ ও প্রকৃতি পালটে দিয়ে একটি পাত্র বানালো। এই পাত্রটিতেই তার সঙ্কল্পের প্রকাশ এবং পাত্রটিই সংস্কৃতির ফল।

সংস্কৃতি তাহলে মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা। স্বাধীনতায় আছে প্রকৃতিতে নিজের নিয়ম দাঁড় করানো। মানুষের এই নিজস্ব নিয়মগুলো সমাজ সঞ্চয় করে রাখে এবং যুগে যুগে তার পরিচয় আমরা সমাজ থেকেই গ্রহণ করি। এই যুগসঞ্চিত সংস্কৃতিকে মানুষ বিভিন্নকালে নিজের সঙ্কল্প অনুযায়ী পরিবর্জন ও গ্রহণ করে। এই বর্জন ও গ্রহণেও একই স্বাধীনতার প্রকাশ অর্থাৎ সংস্কৃতির পরিচয়। যেদিন মানুষ আর স্বাধীনতাকে রূপ দিতে পারবেনা সেদিন প্রকৃতিকেও ভেঙে গড়তে পারবেনা এবং সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিও নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের এই তত্ত্বটি বুঝলেই নজরে আসবে কেনো মানুষের সংস্কৃতি আছে।

সংস্কৃতি জীবনের সমস্ত স্তরে পরিব্যাপ্ত। পোষাক থেকে খাদ্যপ্রণালী, মন্দিরের ভাস্কর্য থেকে দার্শনিক চিন্তা সমস্ত কিছুতেই মানুষের স্বাতন্ত্র্যের ছাপ পড়ে, সুতরাং সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। জীবনের যে-কোন পর্বেই কমবেশি সংস্কৃতির স্বাক্ষর থাকে। সংস্কৃতি ও জীবন যেহেতু অভিন্ন তখন বোঝা দরকার জীবনের চূড়ান্ত কল্পনা সংস্কৃতিকে পুষ্টি দেয় অর্থাৎ যেমন জীবনের ভাবনা

সংস্কৃতি জীবনের সমস্ত স্তরে ব্যাপ্ত

তেমনি স্বাধীনতার প্রকাশ, তেমনি সংস্কৃতির মান। যাদের চিন্তায় জীবনের লক্ষ্য বিরাট, চৈতন্যের স্তর অতলস্পর্শী ও সচেতনতা দিগন্তব্যাপী তাদের সংস্কৃতির ঐশ্বর্য তেমনি বিরাট মাপের। আমাদের সংজ্ঞার সূত্রে তাই ম্যাথ্যু আর্নল্ডের সুবিখ্যাত কয়েকটি উক্তিকে গ্রহণ করা যায়।' 'কালচর এবং এনার্কি' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন 'Culture being a pursuit of our total perfection by means of getting to know, on all the matters which most concern us, the best which has been thought and said in the world ; and through this knowledge turning a stream of fresh and free thought upon our stock notions and habits, which we now follow staunchly but mechanically, vainly imagining that there is a virtue in following them staunchly which makes up for the mischief of following them mechanically.'। অর্থাৎ তিনি ঠিকই বলেছেন যে 'সংস্কৃতি আমাদের পূর্ণতার অন্বিষা'। সংস্কৃতি আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী যেহেতু মানুষের স্বাধীনতার প্রকাশ, স্বাধীনতার তাৎপর্য বুঝতে পারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। স্বাধীনতা যেমন খুশি যা খুশি করা নয়, স্বাধীনতার অর্থ আপন স্বভাবকে প্রকাশ করা। নিজের স্বভাব ও স্বধর্মই সংস্কৃতিতে প্রকশিত হয়, সে স্বভাব ও স্বধর্ম একমাত্র সচেতন মানুষের থাকতে পারে। কাজেই প্রতি মুহূর্তে সচেতনভাবে এই স্বাধীনতার চর্চা করতে হয়, অন্ধের মতো গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে নয়, অন্যের দম দেওয়া কলের পুতুলের মতো নয়। সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায়, আত্মজ্ঞানে নিজেকে প্রকাশ করতে পারলেই সংস্কৃতির দায়িত্ব পালন করা সম্ভব।

সংস্কৃতি প্রাণধারার খোঁজ দেয়

আর্নল্ড তাই সঠিক বলেন যে চৈতন্যের স্রোত শুকিয়ে গেলে, জীবন যান্ত্রিক অভ্যাসে পরিণত হলে, সংস্কৃতির প্রাণধারাকে ভগীরথের মতো খুঁজতে যেতে হয় এবং তাকে বইয়ে দিতে হয় শুষ্ক-শূন্য-দগ্ধ জীবনের ওপর দিয়ে। কারণ একমাত্র সংস্কৃতিই আমাদের সত্তার আভাস দিয়ে ত্রাণ করতে পারে। কারণ 'Culture, which is the study of perfection, leads us...to conceive of true human perfection as a harmonious perfection, developing all sides of our humanity ; and as a general perfection, developing all parts of our society'. সংস্কৃতিকে আমরা স্বাধীনতা বলেছি, এই

স্বাধীনতা একদিকে যেমন ব্যক্তির, অন্যদিকে তেমনি সমগ্র সমাজের। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কই সমাজ গড়ে কিন্তু সমাজ একবার গড়া হয়ে গেলে ব্যক্তিকে তার আশ্রয়েই পুষ্ট হতে হয়। সংস্কৃতি সমাজের কেন্দ্রেই স্ফটিকাকারে থাকে। ব্যক্তিরা সমাজ-ভাণ্ডার থেকেই সংস্কৃতির দান গ্রহণ করে। সংস্কৃতিকে নতুনভাবে ভেঙে গড়ে আবার সমাজের কাছেই ব্যক্তিরা গচ্ছিত রাখে কারণ সমাজই যুগযুগান্তর ধরে সংস্কৃতির পরিচয়কে বক্ষে বহন করবে এবং ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে যাবে। যেমন মা ঠাকুরমার মুখে শুনে শুনেই আমরা প্রথম রামায়ণ মহাভারত ও ভারতবর্ষ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠি।

প্রশ্ন উঠতে পারে সংস্কৃতিকে কেমনভাবে চিনবো? আর্নল্ড তার চমৎকার জবাব দিয়েছেন "Culture says, 'Consider these people then, their way of life, their habits, their manners, the very tones of their voice ; look at them attentively ; observe the literature they read, the things which give them pleasure, the words which come forth out of their mouths, the thoughts which make the furniture of their minds', ইত্যাদি। এক কথায় আর্নল্ডের বক্তব্যকে আমরা বলতে পারি সংস্কৃতি হলো জীবনের একটি 'বিশেষ ভঙ্গি'। একটি মানুষের চলনে বলনে, ব্যবহারে, কর্মে সর্বত্রই সংস্কৃতির ছাপ থাকে বা থাকে না। যদি থাকে তবে তার আত্ম-প্রকাশের বিশিষ্ট ভঙ্গিটিকেই আমরা সংস্কৃতি বলবো। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন কথাটি সত্য, তেমনি সমগ্র জাতির ক্ষেত্রেও তা সত্য।

'জীবন ভঙ্গির' সঙ্গে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখতে হবে যে সংস্কৃতি হলো মনের সাড়া দেবার ক্ষমতা। যে যেমন সাড়া দিতে পারে তার সাংস্কৃতিক সচেতনতা তেমনি। আমরা যে অসংস্কৃত তার প্রমাণ, আমরা আমাদের ঐতিহ্যের কোনো কিছুতেই সাড়া দিতে পারি না। তা মন্দিরের ভাস্কর্য থেকে দৈনন্দিন ব্যবহার পর্যন্ত সর্বত্রই প্রকট। সুতরাং সংস্কৃতিবান ও অসংস্কৃত মানুষদের চিনতে কোনোই অসুবিধে নেই। মনের সাড়া দেবার এই ক্ষমতা ম্যাথ্যু আর্নল্ডেরও স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি তাই লিখেছেন 'The culture we recommend is above all, an inward operation......culture...places human perfection in an *internal* condition.'

সংস্কৃতির পরিচয় আমরা সাধারণত ব্যক্তিতেই গ্রহণ করি। এবং ব্যক্তিদের পরিচয়েই জাতির সংস্কৃতির কথা বলি। কিন্তু এ-বিষয়ে আমাদের প্রথম ভ্রান্তিটি এই যে, সংস্কৃতির পরিচয় সমগ্র জাতির মধ্যে না পেলে শুধু ব্যক্তির পরিচয়েই সংস্কৃতিকে প্রমাণ করা যাবে না। যেমন বাঙালীর বর্তমান সংস্কৃতি কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখিয়ে প্রমাণ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের পরিচয় তখনই সত্য হবে যখন জাতি হিসাবে বাঙালীরা তাদের নিত্য দিনে রুচি ও সংস্কৃতিকে প্রমাণ করতে পারবে। দ্বিতীয়ত সংস্কৃতি সমগ্র জীবন ও জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হলে শুকিয়ে যায়। কারণ, সমগ্র জাতির চিন্তা, ভাবনা ও জীবনযাত্রাই প্রাণরসে সংস্কৃতিকে পুষ্ট করে। আর্নল্ড চমৎকার বলেন তাই 'Perfection, as culture conceives it, is not possible while the individual remains isolated. The individual is required, under pain of being stunted and enfeebled in his own development if he disobeys, to carry others along with him in his march towards perfection, to be continually doing all he can to enlarge and increase the volume of the of the human stream sweeping thitherward.'

সংস্কৃতির পরিচয় ব্যক্তিতে

সংস্কৃতিই জীবনকে পরিপূর্ণতা দেয় এবং সমগ্র সমাজ জীবনকে অগ্রগমণের লক্ষ্য নির্দেশ করে।

২। সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য (Difference between Culture and Civilization)

যে কোনো আলোচনাতেই সংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রত্যয় দুটি ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমনভাবে আমরা শব্দ দুটি ব্যবহার করি যে তাদের অর্থের ভিন্নতা অস্পষ্ট থাকে এবং বহু ক্ষেত্রেই তারা সমার্থক হয়ে ওঠে। যখন বলি 'লোকটি অত্যন্ত অসভ্য' তখন আমরা সভ্যতার অনুপস্থিতিকে সংস্কৃতির অর্থে ব্যবহার করি। বোঝাতে চাই যে লোকটির ব্যবহারে রুচির অভাব ঘটেছে। সাংস্কৃতিক ব্যবহার ও জীবনযাত্রার মানদণ্ডে তার ব্যবহার বা ভঙ্গি বা কোনো উক্তি সামাজিকভাবে স্বীকৃত নীতির (norm) সীমা লঙ্ঘন করেছে। একটু তলিয়ে দেখলেই কিন্তু বোঝা যায় যে দৈনন্দিন ব্যবহারে সভ্যতা প্রত্যয়টি আমাদের মনে কোনো নির্দিষ্ট অর্থে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নয়।

মোটামুটিভাবে আমরা বলতে পারি সভ্যতা প্রত্যয়টি, ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংস্কৃতির অর্থেই প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু সমগ্র জাতি বা দেশের ক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ ভিন্ন। কারণ আমরা যখন বলি 'ফরাসীরা সুসভ্য জাত' তখন আমরা শুধু সংস্কৃতিই বোঝাই না, তার অন্য কিছু তাৎপর্যও থাকে।

বর্তমানে যেমন তেমনি অতীতকালেও পণ্ডিতরা এই প্রত্যয় দুটি বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন। তাঁরা প্রত্যয় দুটির অর্থ পৃথক করতে চেয়েছেন। স্পেঙলার, টএনবী প্রমুখ পণ্ডিতেরা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তফাৎ করবার সময় বহুক্ষেত্রেই তাদের চরিত্রকে বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ দিতে পারেন নি। যেমন অনেকের মতে সভ্যতা বাইরের দিক আর সংস্কৃতি ভেতরের। কেউ কেউ বলেছেন সভ্যতা বাহ্যিক তাই আমাদের বাইরের প্রকৃতি সভ্যতায় প্রকাশিত আর সংস্কৃতি হচ্ছে আমরা যা তাই।

এভাবে ব্যাখ্যা করবার নিশ্চয়ই একটা সুবিধে আছে। সুবিধেটা হলো আভাসে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্বন্ধে কিছু একটা ধারণা তৈরি করা যায় এসব বক্তব্যে। খুব স্পষ্ট নয়; কিন্তু আমরা সাধারণভাবে চলনসই একটা ধারণা গড়তে পারি। তবু এমন ব্যাখ্যায় প্রচুর ত্রুটি থাকে। যদি বলি সংস্কৃতি হচ্ছে 'আমরা যা তাই' (what we are) তবে বর্তমান অবস্থার সঙ্গে অতীতের যোগ ও ফারাকটা বোঝা যায় না। যেমন ধরা যাক আমরা বাঙালীরা বর্তমান কালে বিশেষ একটি মানসিক অবস্থায় আছি। আমাদের রুচিতে, শিক্ষা দীক্ষায়, আচরণ ও কর্মে নির্দিষ্ট একটা ভঙ্গি নিশ্চয়ই প্রকাশিত হচ্ছে। তাকে ভালোও বলা যায়, মন্দও বলা যায়। যদি মন্দ বলি, তা হলেও বর্তমান অবস্থা সংস্কৃতির পরিচায়ক, ভালো হলেও পরিচায়ক। ভালো বা মন্দ যাই হোক, বাঙালীর সংস্কৃতি বলতে আমরা কতোটুকু বোঝাবো? কবেকার কথা বোঝাবো? শুধু বর্তমানের অবস্থা বললে বাঙালীর পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হবে না। তার জন্যে তার অতীত সিদ্ধির প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। কারণ বাঙালীর ইতিহাস দীর্ঘ হাজার বছরের। বর্তমানের অবস্থা যদি আমার বক্তব্যে সম্পূর্ণ সত্যও হয় তবে তার ভালো মন্দের বিচার কেবলমাত্র বর্তমান দিয়ে সম্ভব নয়। সম্ভব নয় এ-কারণে যে সংস্কৃতির বিচার মূল্যের বিচার। মূল্য বিচারে মানদণ্ডের প্রয়োজন করে। মানদণ্ড কখনোই পাওয়া যায় না যদি না পূর্ববর্তী অবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব

সংস্কৃতি ও 'আমরা যা তাই'

জানা যায়। শ্রেষ্ঠত্বের পটেই বা কষ্টি পাথরেই বর্তমানের তাৎপর্য বিচার হয়। কাজেই আমরা যা তাই বললে বক্তব্যটি অত্যন্ত ধোঁয়াটে লাগে।

আর এক অর্থে 'আমরা যা তাই' এর ব্যাখ্যা করা যায়। এই ব্যাখ্যায় আমরা যা হতে চাই তাতেই আমাদের পরিচয়। অর্থাৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে আমরা পূর্ণ নই। আমরা অতীতে ছিলাম, বর্তমানে আছি ও ভবিষ্যতে হবো। সুতরাং 'আমরা যা তাই' কখনো বর্তমানের সীমায় স্পষ্ট হতে পারে না। ভবিষ্যতের কল্পনা ও লক্ষ্যের সঙ্গে তাকে মেলাতে হয়। কাজেই সংস্কৃতি বলতে এইসব পণ্ডিতদের মতো আমরা যা তাই' বুঝলে প্রত্যয়টির অর্থ কোনোদিনই বোধগম্য হতে পরে না। সংস্কৃতি জীবনের প্রকাশ, ব্যক্তি ও জাতির স্বভাব সংস্কৃতিতেই পরিস্ফুট হয়। প্রকাশের সঙ্গে জীবনের অবস্থা ও লক্ষ্য জড়িত থাকে। জীবনের অবস্থা বদলায় কিন্তু লক্ষ্য সাধারণতই নির্দিষ্ট থাকে। লক্ষ্য ও অবস্থার টানাপোড়েনে সংস্কৃতির চরিত্র প্রত্যক্ষ হয়। একবার সংস্কৃতির লক্ষ্য তৈরি হলে জীবনযাত্রার মধ্যে তার প্রবাহ থাকে। পরবর্তী কালে এই লক্ষ্য ও সিদ্ধির সঙ্গে মিলিয়ে বর্তমান অবস্থার পরিমাপ হয়। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পাশাপাশি যেমন বর্তমান কালকে বিচার করা হচ্ছে।

আমাদের এই বক্তব্যটি যদি বোঝা যায় তবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির তফাৎটা স্পষ্ট হবে। একটি আদিম গোষ্ঠীকে আমরা অসভ্য বলতে পারি, কিন্তু সংস্কৃতিহীন বলতে পারি না। সাঁওতালরা যেমন আমাদের তুলনায় অসভ্য কিন্তু আমাদের তুলনায় সত্যিই অসংস্কৃত কিনা বলা মুশকিল। সভ্যতার বিচারে তাই তুলনামূলক মানদণ্ড ব্যবহৃত হতে পারে। তুলনার ক্ষেত্রে আমরা সংখ্যা পরিমাণকে প্রয়োগ করি। পরিমাণের আলোচনায় সর্বদাই হিসাবের ব্যবস্থা থাকে। সভ্যতার ক্ষেত্রে এই পরিমাণের কথা ওঠে কারণ সভ্যতাকে নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজতাত্ত্বিকরা বোঝেন প্রয়োগ কৌশলের নজীরে। মানুষের প্রয়োগ বিদ্যা ব্যবহারিক। তার পরিচয় থাকে হাতিয়ারে। হাতিয়ার ব্যবহার করে মানুষ প্রকৃতি থেকে আদায় করে ও নিজের অবস্থা ফেরায় প্রকৃতির জ্ঞানে। হাতিয়ার ও জ্ঞান তাই একই সঙ্গে চলে। যেমন হাতিয়ার তেমনি জ্ঞান। হাত ও মাথার এই যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলেই পুরাতত্ত্ববিদরা সমাজ বিবর্তনের স্তরকে

সভ্যতা যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত

হাতিয়ারের দ্বারা চিহ্নিত করেন। হাতিয়ার ও হাতিয়ার-জাত জ্ঞানে জীবন সংগঠন ও সমাজ সংগঠন নির্ভর করে। জীবনযাত্রার যাবতীয় উপকরণ তার সঙ্গে জড়িত। কাজেই আমরা বলতে পারি সভ্যতার সঙ্গে হাতিয়ারের যোগ। অর্থাৎ সভ্যতার ভিত্তি মানুষের কলাকৌশল ও যন্ত্র (হাতিয়ার)।

হাতিয়ারের তুলনামূলক বিচার সম্ভব। বিচার এক্ষেত্রে ফলের। ফলের তাৎপর্য প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে। যে হাতিয়ার প্রকৃতি থেকে যতো বেশি আদায় করতে পারে, সে ততো বেশি মূল্যবান ও ততো বেশি দক্ষ আমাদের জীবন সংগঠন। সুতরাং হাতিয়ার আমাদের সভ্য করে তুলছে। পুরোনো পাথুরে যুগে পাথর ছিল মানুষের হাতিয়ার। তৎকালীন উপকরণের পরিমাণ মতো ছিলো সভ্যতা। বর্তমানকালে হাতিয়ার ইস্পাত, সুতরাং জীবনযাত্রার উপকরণ অনেক বেশি ব্যাপ্ত ও জটিল। মানুষের জ্ঞানও সেই পরিমাণে বিস্তৃত। সুতরাং বর্তমানের সভ্যতা প্রাচীন সভ্যতা থেকে শ্রেষ্ঠ। কারণ ইস্পাত অনেক বেশি দৃঢ় ও স্থায়ী এবং ইস্পাতের ব্যবহার জীবনের সমস্ত স্তরেই ব্যাপ্ত এই মানদণ্ডের প্রয়োগে আল্টামিরার আদিম মানুষ আমাদের তুলনায় অসভ্য।

সংস্কৃতির সঙ্গে যন্ত্র ও উপকরণের ঘনিষ্ঠ কোনো যোগ নেই। কারণ মানুষ সংস্কৃতি তৈরি করে স্বাধীন কর্মে আত্মপ্রকাশের টানে। কাজেই তার সঙ্গে উপকরণের সম্পর্ক পরোক্ষ। বর্তমানের মতো সূক্ষ্ম তুলি ও বিচিত্র রঙ আলটামিরার আদিম মানুদের ছিলো না তবু তারা অত্যাশ্চর্য ছবি এঁকেছে। সভ্যতার হিসাবে যদিও তারা হীন তবু সংস্কৃতিতে কোনো অর্থেই ছোটো নয়।

যন্ত্রের সঙ্গে জ্ঞান জড়িত, জ্ঞানের সঙ্গে সভ্যতা। কিন্তু সংস্কৃতির সঙ্গে জ্ঞানের যোগ (ব্যবহারিক অর্থে) সামান্য। সংস্কৃতি জ্ঞানকে প্রয়োগ করে না, জ্ঞানের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টিকে খোঁজে। সংস্কৃতিতে মানুষ আত্মপ্রকাশ করে আর সভ্যতায় মানুষ বিস্তৃত হয়। জ্ঞানকে জমা করা যায়, সভ্যতার শিক্ষা মানুষ তাই জোগাড় করতে পারে এবং প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারে। সংস্কৃতির শিক্ষা জমা করা যায় না কারণ সংস্কৃতি বোধের ব্যাপার। কর্মে বোধের প্রকাশ ঘটলে সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কেউ ইচ্ছা করে সংস্কৃত বা অসংস্কৃত হতে পারেনা। সংস্কৃতির প্রকাশ তার স্বভাবে। সভ্যতা মানুষ ইচ্ছে করলেই প্রকাশ করতে পারে।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির যোগ আছে কিন্তু তারা কখনোই হাত মিলিয়ে চলে না। সভ্যতা উন্নত হলেই যে সংস্কৃতি উন্নত হবে তার কারণ নেই। সংস্কৃতি উন্নত হলেই যে সভ্যতা উন্নত হবে তারও কোনো কারণ নেই। কারণ সভ্যতা ব্যক্তির জীবনের কথা নয়, সামগ্রিকভাবে একটি জাতির বৈষয়িক উন্নতির কথা। সংস্কৃতি ব্যক্তির বোধ ও স্বীকৃতির ওপর নির্ভর করে। সমগ্র জাতির বোধের ওপরেও নির্ভর করে। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই ব্যক্তি ও জাতিকে উভয়তই সত্য হতে হয়। জাতি সংস্কৃতিবান হলেই ব্যক্তি যে তা প্রকাশ করবে এমন নয়। অথচ সভ্যতার ফল একটি ব্যক্তি 'সভ্য' না হয়েও পেতে পারে যেহেতু সভ্যতা হাতিয়ারের সঙ্গে জড়িত।

৩। সাংস্কৃতিক সংঘ (Cultural Associations)

সমাজের মধ্যে সংগঠিত সংঘের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই সংঘগুলো গড়ে ওঠে। যেমন পাঠাগার, রবীন্দ্র সঙ্গীত আলোচনা চক্র ইত্যাদি। সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে তেমনি বিভিন্ন সংঘ তৈরি করা যায়। সংস্কৃতির সংঘ বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক ম্যাকাইভর ও পেজ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন।

(ক) সাংস্কৃতিক সংঘ একটি প্রাথমিক গোষ্ঠী হতে পারে আবার অনেকগুলো গোষ্ঠীর সমবায়ও হতে পারে। তাদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণও থাকতে পারে। কিন্তু সাংস্কৃতিক সংঘের সভ্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক সর্বদাই প্রত্যক্ষ। অন্য যেকোনো সংগঠন, যেমন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক, পরোক্ষ সম্পর্কের ভিত্তিতেও সংগঠিত হতে পারে। যেমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক দল। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক দলের প্রতিটি সভ্যের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়াই তাদের কার্যক্রম চলতে পারে কিন্তু সাংস্কৃতিক সংঘের অস্তিত্ব নির্ভর করে সক্রিয় অংশ গ্রহণের ওপর। কারণ সংস্কৃতি বাহ্যত কাউকে পেশ করা যায় না। অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে তার জন্যে প্রস্তুত করতে হয়।

(খ) সাংস্কৃতিক সংঘের কোনো কেন্দ্রিকতা থাকা সম্ভব নয়। বিভিন্ন সংঘের বিভিন্ন কার্যক্রম ও বক্তব্য। সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী তারা

নিজের মতো চলতে পারে। কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক ও কেন্দ্রিকতা তাদের চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। যেহেতু তাদের অস্তিত্ব বাইরের অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেমন একটি রাজনৈতিক দলকে অন্য দলের সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কিত হতে হয়। ইচ্ছে না থাকলেও তাদের অন্য সবাইকে স্বীকার না করে উপায় নেই। অবশ্য বিভিন্ন সংস্কৃতিক সংঘের মধ্যে আদানপ্রদান চলতে পারে। যেমন রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানগুলো পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনা চালাতে পারে, অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান করতে পারে।

অর্থাৎ মনে রাখা দরকার যে সংস্কৃতিতে স্বভাবের প্রকাশ এবং স্বভাব একমাত্র স্বাধীনতাতেই পরিস্ফুট। কোনো বন্ধন ও বাধ্যবাধকতায় সংস্কৃতি স্ফূর্ত হতে পারে না।

অনুশীলনী

2. Define culture and distinguish it from civilization.

1. Discuss why culture depends on the state of freedom.

3. Define culture and write a short note on the cultural associations.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কয়েকটি সামাজিক প্রত্যয় ও আদর্শ

১। সামাজিক আদর্শ ও প্রত্যয় (Social Ideals and Concepts)

ইতিপূর্বেকার আলোচনায় আমরা সমাজের স্বরূপ ও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের ক্ষেত্র ও তাৎপর্য বিষয়ে মোটামুটিভাবে ধারণা তৈরি করেছি। সমাজকে আমরা বলেছি ব্যক্তির জীবনের অন্তর্লীন সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের সূত্রেই গড়েছে নানা সংগঠন। সমাজতাত্ত্বিকরা নানা ভাবে এই সম্পর্ককে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। নানা গোষ্ঠীর পণ্ডিত এবং দার্শনিকরা আলোচনায় বিভিন্ন প্রত্যয় তুলেছেন। এই সমস্ত প্রত্যয়ের গুণাগুণ বিচারের জন্য আমাদের সমাজ বিষয়ে মানদণ্ড তৈরি করতে হয়। সাধারণভাবে প্রত্যয় বিচারের মানদণ্ড সামাজিক আদর্শাবলী। আদর্শের

বিষয়েও অবশ্য দার্শনিকদের কোনো মতৈক্য নেই। তবু আমরা স্থির করেছি যে সমাজ ও ব্যক্তির ঐক্যস্থাপন করা আমাদের লক্ষ্য এবং এই ঐক্য ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশের সঙ্গে জড়িত। ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশকেই মঙ্গল বলা যায়। মঙ্গলের লক্ষ্যেই ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক আমরা বিচার করতে পারি।

দার্শনিক টমাস হব্‌স মঙ্গলকে ব্যাখ্যা করেছেন কামনার অর্থে। তিনি লিখেছেন 'whatever is the object of any man's appetite or desire that is what he for his part calleth good'. তিনি অবশ্য ন্যায্য যুক্তির কথাও বলেছেন, শুধুই কামনার কথায় থামেন নি। ন্যায্য যুক্তির সঙ্গে শান্তির বোধ জড়িত। শান্তিকে রক্ষা করবার কথায় শুধুমাত্র বাহ্য নিয়ম পালনের সর্তটই নেই, বিবেকের কথাও আছে। যেমন, বলা হয় এমন কোনো কাজ অন্যের ওপর কোরো না যা তুমি নিজের ওপর করতে পারো না। বেণ্টাম কর্তব্যের আলোচনায় অন্তর্নিহিত যুক্তির চাইতে ঝোঁক দিয়েছিলেন শাসক বা আইন প্রণেতার ওপর। তাঁর মতে আইন প্রণেতার চেষ্টা হবে ব্যক্তিদের বিভিন্ন অভিপ্রায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকরা। তাই তিনি উপযোগিতার তত্ত্বকে আইন প্রণেতার উচিত কর্তব্য হিসেবে উপস্থিত করেছিলেন। ওয়েস্টারমার্ক ও আলেকজাণ্ডার নৈতিক জীবনের তথ্যকে ব্যাখ্যা করেছেন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কোনো কর্ম বিশেষকে সমর্থন বা অসমর্থনের সঙ্গে মিলিয়ে। এই বিচারে শ্রেণীবদ্ধ কর্ম তালিকার কথা থাকে অর্থাৎ কোন্ কোন্ কর্ম প্রসঙ্গে কে কি বলবে। গ্রীণ ভেবেছেন ব্যক্তির ক্রমোন্নতির কথা। যে কাজে ক্রমোন্নতি তা-ই গ্রহনীয়।

হব্‌স: কামনার সঙ্গে মঙ্গল জড়িত

আর কাণ্ট অগ্রসর হয়েছেন কর্তব্য ও দায়িত্বের বিবেচনা নিয়ে। যুক্তির বিচারে বাটলার মানুষের 'নিম্ন' ও 'উচ্চ' মনের কথা বলেছেন। ওঁর মতে সমগ্র চরিত্রের সঙ্গে মনের বিভিন্ন অংশের যোগ স্থাপন করাই কর্তব্য। সুতরাং এই আলোচনা থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে দার্শনিকরা নীতির প্রসঙ্গে আদর্শের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। আদর্শের সঙ্গে স্বাধীনতা প্রত্যয়টির অন্তর্নিহিত যোগের কথা বলেন কাণ্ট। স্বাধীনতার আলোচনায় আমরা সবাই জানি যে এ-বিষয়ে দার্শনিকদের কোনো স্থির

কাণ্ট: মঙ্গল ও কর্তব্য জড়িত

বক্তব্য নেই। তবে হেনরী সিজহুইকের সংজ্ঞাটি আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য। তিনি বলেন 'it must be reasonable to treat any one man in the same way as any other if there be no reason apparent for treating him differently.'

আমরা সামাজিক আদর্শের প্রসঙ্গে দার্শনিকদের বক্তব্য ও কান্টের স্বাধীনতা প্রত্যয়টি এ-কারণেই আলোচনায় তুলেছি যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতার মুক্ত পরিবেশেই সম্ভব এবং তার কর্মের এবং আচরণের স্বাধীনতাতেই সামাজিক সংগঠনের চরিত্র পরিস্ফুট হয়। বিভিন্ন আদর্শ ও প্রত্যয় বিচারের পূর্বে সে-কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। কারণ বহু সমাজতত্ত্ববিদ সমাজকে এতো বেশি ব্যক্তির ওপর পৃথকভাবে চাপাতে চান যে স্বাধীনতার কোনো প্রয়োজনকেই তাঁরা স্বীকার করে না। তেমনি উল্টো কথাটাও সত্য যে ব্যক্তি সম্পূর্ণই সমাজবিহীন বিচ্ছিন্ন স্বাধীন পুরুষ নয়। ব্যক্তি সমাজেই ব্যক্ত এবং সমাজের সম্পর্কেই তার পরিচয়। কার্যত, আমরা বারংবার তাই ব্যক্তি ও সমাজের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা বলেছি।

সামাজিক আদর্শের ক্ষেত্রে আরো একটা কথা মনে রাখতে হয়। আমরা যখন আদর্শের কথা ভাবি তখন ব্যক্তির কথা ভুলে শুধুমাত্র সমগ্র কিন্তু নির্বিশেষ সমাজটির কথা ভাবি। অথচ ব্যক্তিদের স্বীকৃতি ছাড়া সামাজিক আদর্শ অর্থহীন ও মৃত। যে-কোনো সামাজিক আদর্শের ভালোমন্দই ব্যক্তিদের জীবনে পরীক্ষিত হয়। ব্যক্তিদের ভুললে কর্মের উৎস ও সম্পর্কের কেন্দ্র বিষয়ে মৌলিক অজ্ঞতা পরিস্ফুট হয়। আবার তেমনি কোনো আদর্শই নিছক একজন ব্যক্তির জন্য নয়। সামাজিক জীবন যাত্রায় একই সঙ্গে বহু ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ পরিবেশেই আদর্শের প্রয়োগ হতে পারে।

২। যূথবৃত্তি (Herd Instinct)

সামাজিক জীবনযাত্রা যেহেতু সংঘবদ্ধ জীবযাত্রা, কিছু কিছু সমাজতাত্ত্বিক তার স্বরূপ বুঝবার জন্য যূথবৃত্তি নামে একটি মানসিকতার প্রসঙ্গ তুলেছেন। মনস্তাত্ত্বিক ট্রটার সর্বপ্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি প্রাণীজগতের সংঘবদ্ধতাকে মৌলিক শক্তি মনে করে মানুষের সংঘবদ্ধতার কার্যকারণ খুঁজেছেন মনস্তত্ত্বে। তিনি বলতে

চেয়েছেন মানুষও যে একই সঙ্গে বাস করে তার কারণটা বাইরে থেকে তৈরি হয়নি, আসলে তা তার মানস-গঠনের অংশ। যেমন, ভেড়ার পাল একসঙ্গে চলে। কারণ তাদের মনে যূথবদ্ধতা কাজ করছে। মানুষের ক্ষেত্রেও দেহাতী গ্রামীন লোকদের দেখা যায় শহরে এসে যেমন দলবদ্ধ হয়ে চলাফেরা করে। তফাৎ করে দিলেই তারা নিতান্ত অসহায় বোধ করে। সুতরাং ট্রটারের বক্তব্য মতো যেকোনো সমাজবদ্ধতার পেছনে এই যূথচারী মনোভাব বৃত্তির মতো উপস্থিত।

অনেকটা এই জাতীয় বক্তব্য বলেন টার্ডে ও লিবঁ। ওঁদের মতে সমাজ-বদ্ধতা ও পরিবর্তনের মূল কারণ নিহিত আছে অনুকৃতিতে। ট্রটারের যূথবদ্ধতার তত্ত্বে মনস্তাত্ত্বিক বৃত্তির কথা সাধারণভাবে যুক্তিসিদ্ধ নয়। কারণ যূথবদ্ধতা মানুষের কোনো মানসিক বৃত্তি নয়। আমরা যেমন দেখছি মানুষ স্বতন্ত্রভাবে আত্মস্থ থাকতে চায়। অবশ্য এ-কথাও ঠিক যে মানুষের সমাজ তার গোষ্ঠীবদ্ধতার প্রমাণ। কিন্তু তাকে আমরা মনস্তাত্ত্বিক কারণ বলিনা। সেটা তার সমাজিক অভ্যাস এবং সমাজে জন্মাচ্ছে বলেই মানবশিশু মানুষ হচ্ছে।

মনস্তত্ত্ব বাদ দিলে এটুকু স্বীকার করা যায় যে সামাজিক অবস্থানের কারণে যূথবদ্ধতা মানুষের জীবনে অনেকটাই সত্য। তার প্রমাণ মেলে ভিড় বা জনতায় (crowd)। জনতার এমনই চরিত্র যে সুস্থ সচেতন ব্যক্তিকে দিয়েও সে যা খুশি কাজ করিয়ে নিতে পারে। যূথ ও জনতা প্রায় সমগোত্রীয়। তফাৎ শুধু এইটুকু যে যূথবদ্ধতা একটা মোটামুটি ভাবে স্থায়ী বোধ আর জনতার সম্পর্ক গতিশীল (fluid) অর্থাৎ তার কোনো স্থিরতা নেই। যে কোনো কারণেই জনতা গড়তে পারে, আবার কারণটি অনুপস্থিত হলেই জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু জনতার মধ্যে যূথবৃত্তির মতো কোনো একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের স্থিরতা থাকলে সচেতন কোনো বোধ তৈরি হতে পারে। যেমন রাজনৈতিক দল বা ধর্মীয় গোষ্ঠী। জনতা শৃঙ্খলাহীন মত্ত বা আবেগচালিত অবস্থায় উন্মত্ত জনতায় (Mob) পরিণত হয়। জনসাধারণের যে কোনো সমাবেশকেই আমরা জনতা বলি আর তার উদ্দাম অবস্থাকে উন্মত্ত জনতা বলি।

উন্মত্ত জনতার কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ আছে। যেমন, উন্মত্ত জনতা সর্বদাই আবেগ চালিত। তার কোনো স্থির ও স্থায়ী লক্ষ্য নেই। ট্রামে বাসে যেমন পকেটমার ইত্যাদি নিয়ে হঠাৎ ভিড় জমে যায়। আবেগ-

চালিত হওয়ায় জনতার কোনো বিচার বা বিবেচনা থাকেনা। সর্বদাই তারা তখন সামাজিক নিয়মকানুন ভাঙে ও নিজেদের হাতে আইনকে গ্রহণ করবার চেষ্টা করে। উন্মত্ত জনতা সাধারণতই সমাজবদ্ধতার পরিপন্থী। জনতার মধ্যে ব্যক্তির বিচারবুদ্ধি প্রকাশিত হতে পারে কিন্তু উন্মত্ত জনতায় ব্যক্তি মুছে যায়, একমাত্র থাকে একটি অন্ধ আবেগ।

অধ্যাপক দুর্খাইম যূথবদ্ধতার তিনটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। (ক) 'the similarities of social thought or behaviour which are the result of the working of similar forces on all the individuals' —সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর যেহেতু একই চিন্তা ও সংগঠন ছাপ ফেলে তাই তারা পরস্পর সন্নিবিষ্ট হয় এবং একই রকমে ভাবতে থাকে। এই সম্ভাবনার সূত্রেই সম-কর্মের সূত্রপাত হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে মানুষের যূথবদ্ধতা প্রাকৃতিক নিয়মের কার্যকারণে ইতিহাসের দীর্ঘ পর্বে স্থিরীকৃত হয়ে আছে। কারণ, মানুষ কোনদিনই একা থাকবার সুযোগ পায়নি বা থাকলে তার মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব। (খ) 'the similarities of behaviour which come from the acceptance of customs, traditions or fashions'। প্রাথমিকভাবে প্রাকৃতিক প্রভাবের পর আমরা জানি মানুষ সচেতনভাবেও অনেকটা সামাজিক রীতিনীতিকে স্বীকার করে এবং বিধি ও নিষেধকে মানে। প্রতিটি ব্যক্তিই সমাজের মধ্যে জন্মায় এবং সামাজিক ভাবনা চিন্তার অংশীদার হয়। পরিবার তাকে নানাভাবে সমাজের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে ব্যক্তিরা সমাজের প্রতিটি বক্তব্য গ্রহণ বা বর্জন করতে অভ্যস্ত হয়, কিন্তু কখনোই সমাজের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে না। (গ) "the reproduction of actions which we have seen or heard about merely for the sake of imitating them—'aping for its own sake'." এই অংশে দুর্খাইম সম্পূর্ণ সচেতন অনুকৃতির কথা বলেছেন।

যূথবদ্ধতার প্রাথমিক কারণ হিসাবে আমরা গিডিংসের 'সমর্থনের' কথা উল্লেখ করতে পারি। যূথবদ্ধতার ভিত্তি হিসেবে অধ্যাপক ম্যাকাইভর ও পেজ 'সমস্বার্থ' ও 'সাধারণ স্বার্থে'র কথা বলেছেন। সমস্বার্থে 'সবার' বোধটা কম। নিজেদের বিবেচনায় আত্মগত ভাবটাই

প্রধান। 'সাধারণ স্বার্থে' ব্যক্তির নিজস্ব 'আমি'র বোধটা কম, সাধারণ ভাবেই নৈর্ব্যক্তিক লক্ষ্যে তখন তারা পরিচালিত।

যূথবদ্ধতার বক্তব্যে অনেকে প্রমাণ করতে চান যে জৈব বৃত্তিমূলক কারণ উপস্থিত থাকায় আদিম সমাজ অনেক বেশি সংহত ছিলো কিন্তু বর্তমানকালে বিচ্ছিন্নতা এতো বেশি প্রাধান্য পেয়েছে যে সংহতি নষ্ট হচ্ছে। আমরা আগেই বলেছি যে যূথবৃত্তি নামক কোনো বৃত্তি মানুষের নেই। সামাজিক কার্যকারণেই মানুষ সংঘবদ্ধ এবং এই সংঘবদ্ধতা বর্তমানে তার অভ্যাস। যদিও মনে রাখা দরকার এই অভ্যাসে তার সচেতন বক্তব্যের কোনো অবকাশ নেই যেহেতু মানুষ সমাজহীন অবস্থা থেকে সমাজ গড়বার কোনো সুযোগ পায় নি বা বর্তমানেও সমাজ ভেঙে দেবার সামর্থ্য তার নেই। এই বক্তব্যটিকেই টার্ডে 'অনুকৃতি' বলেছেন। ওঁর উদ্ধৃতিতে জানতে পারা যায় যে, জন্মই যেহেতু সমাজে সেহেতু মানুষের সর্ববিধ কাজেই সমাজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ছায়া থাকবেই থাকবে। একধরণের ব্যবহার না-করে আমরা যে অন্য ধরণের ব্যবহার করি তার কারণও সামাজিক চাপ ও কার্যকারণ। ব্যক্তি নিজের সচেতনতায় তাকে গড়ে ভাঙে কিন্তু কখনো অস্বীকার করতে পারে না।

৩। সাধারণ স্বার্থ (Common Interest)

সমাজ-সম্পর্কে দু-তরফা আদান প্রদান থাকে। একদিকে সমাজ তার প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ও বক্তব্য নিয়ে উপস্থিত এবং অন্যদিকে ব্যক্তি তার স্বকীয়তার নতুনত্ব নিয়ে হাজির। কোনো একটি কেন্দ্রে আলোচনা আবদ্ধ থাকলে পূর্ণ সত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। সমাজও যেমন সত্য, ব্যক্তিও তেমন। এই দুইয়ের টানাপোড়েন, সংঘর্ষ ও মিলনেই নতুন সংগঠন ও লক্ষ্য তৈরি হয়।

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ককে দুভাবে দেখা যায়। (ক) মন্ময় ভঙ্গি (Subjective attitude) ও তন্নিষ্ঠ ভঙ্গি (Objective attitude)। মন্ময় ভঙ্গিতে থাকে কেবলমাত্র সম্পর্কিত ব্যক্তির নিজস্ব বোধ ও বিচার, আর তন্নিষ্ঠ ভঙ্গিতে আছে নিজের বাইরেকার বস্তু ও বিষয়। সমাজের শুদ্ধ মন্ময় ও শুদ্ধ তন্নিষ্ঠ বিচার বলতে কিছু সম্ভব নয়।

ব্যক্তি ক্ষেত্রে সমাজ যতোটুকু তার প্রতিষ্ঠিত প্রথা ও ঐতিহ্য নিয়ে উপস্থিত ততোটুকু আমরা তথ্যকে উপস্থিত করতে পারি। কিন্তু

ব্যক্তির মানসিকতা ও সেই তথ্যের সঙ্গে যোগাযোগের ঘটনাটা সম্পূর্ণই তার নিজস্ব বিচারের ক্ষেত্র। ব্যক্তির বিচারে থাকে তার নিজস্ব ঝোঁক ও স্বার্থের বোধ। যখন কেবলমাত্র নিজের মানসিকতার কথা বলা হয় তখন তাকে আমরা ঝোঁক বলতে পারি। যেমন, আমার ঝোঁকই হচ্ছে ভালোবাসা ইত্যাদি। স্বার্থের কথায় অন্যের উপস্থিতি থাকে অর্থাৎ তাদের বিষয়ে চিন্তা না করে উপায় থাকে না। সমাজে সর্বদাই কর্মের কেন্দ্র ও লক্ষ্য থাকে। কেন্দ্রের স্থিরতা আসে বস্তু বা বিষয়ের নির্দিষ্টতায় আর তার সঙ্গে জড়ায় বিষয়ীর বা কর্তার মনোভাব ও ঝোঁক। সে কতোটুকু এগোবে বা পেছোবে, কতোটুকু গ্রহণ করবে বা বর্জন করবে।

কাজেই সাধারণ স্বার্থ আমরা তাকেই বলি যা ব্যক্তি নিজের ঝোঁক ও মনোভাব বাদ দিয়ে স্বীকার করে। যেমন ধরা যাক সাম্যবাদী দল। এই দলের বক্তব্যে মানব কল্যাণের কথা আছে। কিন্তু মানব কল্যাণের পথ তারা স্থির করেছেন বিপ্লব এবং বিপ্লবের জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাসের কোনো প্রয়োজন নেই। বহু ব্যক্তি মানব কল্যাণের সঙ্গে নিজের স্বার্থের লক্ষ্যকে মিলিয়েছেন এবং সাম্যবাদী দলকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু তাঁদের ঝোঁক হতে পারে কিছুটা কম রক্তপাত বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করা। তবুও সবার স্বার্থের সঙ্গে তাঁর স্বার্থের অভিন্নতাই সাম্যবাদের লক্ষ্যকে সাধারণ স্বার্থে রূপান্তরিত করে।

সাধারণ স্বার্থকে দুভাবে দেখা যায়। কেবলমাত্র নিজ গোষ্ঠীর কথা থাকতে পারে, যেমন আমরা ভাবলাম কেবলমাত্র বাঙালী বা হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষা করাই সবার বা আমার কর্তব্য। অন্যভাবে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকেই আদর্শ করা যায়। যেমন সাম্যবাদ। এই মতে কোনো বিশেষ গোষ্ঠী ইত্যাদির কথা ভাবা হচ্ছে না শুধু মানবের স্বাধীনতা ও সুখের কথা ভাবা হচ্ছে।

সাধারণ স্বার্থকে আবার সমস্বার্থের সঙ্গে তফাৎ করা উচিত। সমস্বার্থে আমরা সবাই সমান সমান অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকেরই স্বার্থ একই রকমে সিদ্ধ হবে। যেমন একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর সাধারণ অংশীদারবর্গ। কোম্পানীর লাভ হলে আমরা অংশীদাররা সবাই সমান লভ্যাংশ পাবো। এই বক্তব্যে প্রতিটি ব্যক্তিই উপস্থিত অথচ তাদের সবার স্বার্থ মিলিয়েই কোম্পানীর সংগঠনটি রক্ষিত হচ্ছে। সাধারণ স্বার্থের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের লাভালাভের কথা ওঠে না।

কারণ, সাধারণ স্বার্থের হিসেবে হয়তো দেখা যাবে যে অনেক ব্যক্তির যথেষ্ট লাভ যেমন হয়েছে তেমনি অন্যদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমগ্র গোষ্ঠীর উপকারেই তা আসছে। যেমন সাম্যবাদীরা বলে সাম্যবাদী শাসন ব্যবস্থার পত্তন হবে ধনিক শ্রেণীকে নির্মূল করতে পারলে অর্থাৎ তাদের হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিতে পরেলে। সুতরাং আমরা বলতে পারে যে ধনীদের ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চয়ই প্রচুর ক্ষতি হবে। কিন্তু সমগ্র সমাজের কল্যাণে তাদেরও শেষ পর্যন্ত অকল্যাণ হবার কোনো কারণ থাকবে না।

সমস্বার্থের সংগঠনে তাই সবটাই ব্যক্তিগত চিন্তা আর সাধারণ স্বার্থের সংগঠনে সবার কথা। কার্যত সমাজে কিন্তু এই দুটি ধারাই উপস্থিত। ব্যক্তি নিজের কথা যেমন ভাবে, তেমনি গোষ্ঠীর কথাও ভাবে; পরিবারে যেমন। সাধারণ স্বার্থের বোধ থেকেই পরিবারে সংহতি আসে। যদিও কিন্তু পরিবারে ব্যক্তি তার নিজস্ব মঙ্গলামঙ্গলের কথাও আলাদা করে ভাবে।

অনেক দার্শনিক বলতে চেয়েছেন যে ব্যক্তি কেবল নিজের কথাই ভাবে, অন্যের জন্য সে চিন্তিত নয়। কিন্তু এই দার্শনিকদের কথা আমরা গোড়াতেই অস্বীকার করেছি। কারণ ওঁরা দাঁড়ান একটা ভুল মনস্তত্ত্বের ওপর। কোনো ব্যক্তিই সম্পূর্ণ নিজের কথা ভাবতে পারে না। সামাজিক মানুষ হিসেবে অন্যদের কথা মানতেই হবে যেহেতু তার কর্মের টানেই অন্যের অসংখ্য কর্ম তৈরি হয়। সুতরাং সামাজিক প্রতিটি সংগঠনই সমস্বার্থ ও সাধারণ স্বার্থের সমন্বয়। সমস্বার্থে ব্যক্তি স্বকীয় কর্মের প্রেরণা পায় আর সাধারণ স্বার্থে সে বাঁচার স্থিতি সংগ্রহ করে।

৪। সামাজিক উদবর্তন (Social Development)

সামাজিক উদ্‌বর্তন একটি মূল্যবিচারের প্রত্যয়। উদ্‌বর্তনের সঙ্গে পরিবর্তন জড়িত। কিন্তু সমস্ত পরিবর্তনই উদ্‌বর্তন নয়। উদ্‌বর্তনের সঙ্গে লক্ষ্য জড়িত। লক্ষ্যবিচারের মানদণ্ডও থাকে। মানদণ্ডের মাপেই ভালোমন্দ, শ্রেয় ও প্রেয়র ছক তৈরি করা হয়। তারপর পরিবর্তন ঘটলে দেখা হয় কল্পনা অনুযায়ী উদ্দেশ্য কতোটুকু সিদ্ধ হয়েছে বা হয়নি। উদ্‌বর্তনের হিসেব সময়ের ছকে করা হয় বলে তার পর্ববিভাগ থাকে। পরিবর্তনে দুটি অবস্থার কথা আছে। অতীত ও বর্তমান। অতীত থেকে

বর্তমানের অবস্থান্তরটুকু ঘোষণা করলেই পরিবর্তনকে বোঝা যায়। কিন্তু উদ্‌বর্তনে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত জড়িত। অতীত থেকে বর্তমানের অবস্থান্তরে উদ্‌বর্তন বোঝা যায় না। অতীতের সঙ্গে মূল্যবিচার অর্থাৎ আদর্শ ও লক্ষ্যের মাপটা থাকে। অর্থাৎ প্রতিবারই অতীত অবস্থাকে তার সম্ভাব্য রূপ অর্থাৎ ভবিষ্যতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়। যেমন বর্তমানের বিচার চলে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভেবে। উদ্‌বর্তনে অতীত তাই সর্বদাই বর্তমানে প্রবাহিত এবং বর্তমান ভবিষ্যতের অন্তর্ভুক্ত।

সমাজের ক্ষেত্রে উদ্‌বর্তনের প্রসঙ্গ কার দিক থেকে বিচার করা হবে এই প্রশ্নে অনেক সমাজতত্ত্ববিদ চিন্তিত হয়েছেন। প্রসঙ্গটি ব্যক্তির দিক থেকে উঠতে পারে, সমগ্র সমাজের দিক থেকেও উঠতে পারে। কিন্তু আমাদের মতে ব্যক্তি ও সমাজে যেহেতু কোনো মৌলিক বিরোধ নেই আমরা হবহাউসের মতো বলবো যে, 'Social development is the development of men in their natural relation'। অর্থাৎ সমাজ ছাড়া উদ্‌বর্তনের তাৎপর্য স্পষ্ট হয় না। এডমণ্ড বর্কও তাই লিখেছেন। বর্ক আরো সরাসরি বলেছেন যে মনুষ্যত্বের পূর্ণতার কোনো সম্ভাবনাই সমাজ ছাড়া অর্থহীন।

অধ্যাপক হবহাউস উদ্‌বর্তনের চারটি লক্ষণ স্থির করেছেন। (ক) প্রসার (Scale), (খ) দক্ষতা (efficiency), (গ) স্বাধীনতা (freedom) ও (ঘ) পারস্পরিকতা (mutuality)। এই চারিটি বৈশিষ্ট্যের কোনো একটি বাদ দিলেই উদ্‌বর্তনের চরিত্র ভ্রষ্ট হবে। কারণ বিরাট জনতার মধ্যে হয়তো দক্ষতা ছড়িয়েছে কিন্তু তাদের কোনো কর্মের স্বাধীনতা নেই সেক্ষেত্রে ওই সমাজের চরিত্র কখনোই উন্নতির পরিচায়ক নয়। যেমন গ্রীক সমাজে দাসদের শ্রমের ওপরেই, তাদের দক্ষতার ওপরেই মানসিক উন্নতির ফল ফলেছে। তবু গ্রীক সভ্যতার মহত্ব স্বীকার করেও বলতে হবে যে দাসপ্রথার কারণে তার সামগ্রিক উদ্‌বর্তন হয়নি। বহুক্ষেত্রেই উদ্‌বর্তনের প্রকাশ দেখা যায় আংশিক। হবহাউস উদ্‌বর্তন বলতে বোঝেন 'full social cooperation'। অর্থাৎ যে সমাজে সহযোগিতাই প্রধান কথা, হবহাউস তাকে বলবেন সার্থকভাবে উদ্‌বর্তিত সমাজ। অধ্যাপক হবহাউস যদিও সামাজিক উদ্‌বর্তনের চরিত্র নির্দেশ করেছেন 'সহযোগিতা'র পূর্ণতাকে, কিন্তু অন্য আর একদল

দার্শনিকের মতে সমাজে বিরোধটাই গতি ও পরিবর্তনের নিয়ন্তা। হবহাউসের বক্তব্যে সহযোগিতা যে কেবলমাত্র সামাজিক তথ্য হিসেবে সত্য তা নয়, সহযোগিতাকেই তিনি লক্ষ্য বলতে চাচ্ছেন। অচেতন ও সচেতনভাবে সমাজ ও ব্যক্তি যতোই সম্পর্কের পারস্পরিক সঙ্গতিতে স্থিত হবে, হবহাউস ততোই সেই সমাজকে শ্রেষ্ঠ সমাজের সম্মান দেবেন। কিন্তু হবহাউসের বক্তব্যের সবচেয়ে বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন ম্যালথস। ম্যালথসের মতে বিরোধটাই প্রকৃতির নিয়ম এবং প্রকৃতি প্রতিবার সঙ্গতির সৃষ্টি করে সমাজের মধ্যে দুর্বল ও অসহায়দের উচ্ছেদ করে। ইব্‌ন খালদুন ও র্জ্য বোদাঁ বহিঃস্থিত সংঘাতকেই সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি মূল্য দেন। গামপ্লোভিকজের মতে সমগ্র ইতিহাসকে বুঝতে হবে বিচ্ছিন্ন জাতির পারস্পরিক সংঘর্ষের নজীরে। শক্তিশালীরাই সেই সংগ্রামে জয়লাভ করে ও বিস্তীর্ণ রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করে। র‍্যাটজেনহফারও একই রকমে সংঘর্ষকে সমাজ বিবর্তনের নিয়ন্তা বলেন। তিনি শুধু গোষ্ঠীর বদলে ব্যক্তিকে একক হিসেবে গ্রহণ করেন। সমাজতাত্ত্বিক নভিকভ যেমন লিখেছেন: "The universe is an area of endless combats and alliances......The struggle for existence is universal phenomenon. It is in turn and succesively chemical, astronomical, biological and social......

The struggle for existence, in eliminating those least adapted to the cosmic environment, brings about an increasingly perfect harmony between the subject and the object.'

এই সব সমাজতাত্ত্বিকদের বিরোধ ও সংঘর্ষকে প্রাধান্য দেবার কারণ এই যে তাঁরা হর্বর্ট স্পেনসরের মতো সমাজকে দেখেছেন 'homogeneity to heterogeneity' অর্থাৎ সংহতি থেকে বিশ্লেষীকৃত অবস্থায়। ওঁরা সমাজে বিভিন্নতার কার্য-কারণ ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, তাই সংহতির বদলে বিরোধকে বেশি মূল্য দিয়েছেন। সমাজ একাধারে ঐক্য ও বিরোধ, আবার বিরোধেই ঐক্য। শুধু ঐক্যকে প্রাধান্য দিলে ব্যক্তির স্বকীয়তা মুছে যায় আর বিরোধকে প্রাধান্য দিলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দ্বন্দ্বটা প্রায় হব্‌সের প্রাকৃতিক পর্যায়ে পৌঁছোয়। হবহাউস যখন বলেন সমাজের পূর্ণতা বা ক্রমিক উদ্বর্তনের লক্ষ্য পূর্ণ সহযোগিতা তখন তিনি ধরে নেন যে মানুষ সচেতনভাবে নিজেদের মধ্যে বিরোধের উৎসকে দূর করে।

কার্ল মার্কসও অনেকটা এই কথা বলেন যে সমাজে বিরোধের কারণ অর্থনৈতিক শোষণ। সুতরাং অর্থনৈতিক শোষণের কারণ দূর করতে পারলে সমাজে ঐক্য ফিরে আসবে। মানুষে মানুষে ঐক্যই প্রধান কথা কিন্তু ঐক্যে পৌঁছবার পথ নিছক মেনে নেওয়া ও স্বীকৃতি নয়। ঐক্যের পথে বিরোধও সত্য। শুধু সমাজের সংহতি নির্ভর করে বিরোধের মধ্যেই ঐক্য স্থাপনের ওপর।

ঐক্যের কথা আসে সমাজের মৌলিক চরিত্রের প্রয়োজনে। সমাজে গোড়া থেকেই ঐক্য আছে কারণ সমাজ একান্তভাবেই সংঘবদ্ধতা। এই সংঘবদ্ধতা মানুষ সচেতনভাবে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গড়েনি। সমাজ ও মানুষের চরিত্রে নিহিত সম্পর্কের মৌলিক সত্যকেই কর্মে প্রকাশ করা হচ্ছে। বলা চলে মানুষ জন্মেই সামাজিক বা সামাজিক বলেই মানুষ প্রকৃত মানুষ। সুতরাং ঐক্যবোধ তার জীবনের প্রাথমিক ভিত্তি। হবহাউস শুধু এই ঐক্যবোধকে সচেতনার স্তরে তুলতে চাচ্ছেন। যা ছিলো জীবনের সত্য তাকে তিনি নৈতিক কর্ম অর্থাৎ ঔচিত্যের পর্যায়ে তুলছেন। বলছেন মানুষের সচেতন ও স্বাধীন কর্মই হবে সহযোগিতা। সমাজে বিরোধ নিশ্চয়ই থাকবে কিন্তু তা শক্তিশালীর দুর্বলকে নিষ্ঠুরের মতো দমন নয়। বিরোধিতার অর্থ ব্যক্তির স্বকীয়তার প্রতিষ্ঠা। প্রমাণ করা যে সে অন্যের মতো নয়।

হবহাউসের সূত্রে তাই আমরা বলতে পারি যে ক্রম-উদ্‌বর্তনের তত্ত্বটি কার্যত মূল্যের বিচার এবং এই বিচারে সমাজদর্শন নীতি-শাস্ত্রের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। র‍্যাটজেনহফার, গামপ্লোভিকজ বা অন্যান্য দার্শনিকরা সমাজের আংশিক বিরোধকে পূর্ণ সত্যের মর্যাদা দিয়ে প্রচুর অনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করেছেন।

এক্ষেত্রে একটিমাত্র প্রশ্ন উঠতে পারে যে কেনো সমাজদর্শনে নৈতিক মানকে ব্যবহার করা হবে। ইতিপূর্বে নীতিশাস্ত্র ও সমাজদর্শনের সম্পর্ক আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি যে মানুষ কেবলমাত্র প্রবৃত্তির দাস নয় বা যন্ত্রের মত সামাজিক নির্দিষ্ট কর্ম করে না। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, মানুষ কোনো এক মুহূর্তেই পরিপূর্ণ নয়। তাকে মুহূর্তে মুহূর্তে পূর্ণ হতে হয়। এই পূর্ণতার সাধনা সমস্ত জীবন ধরে চলে। তার পূর্ণতার আদর্শেই তার এই নিরন্তর মানুষ হবার চেষ্টাকে বোঝা যায়। সুতরাং

ক্রম উদবর্তন ও নৈতিকমান

সমাজবদ্ধজীব হিসেবে মানুষকে কোনো একটি সংগঠন ও কর্মের মধ্যে যেহেতু পুরো জানা যাচ্ছে না, তাকে তার সম্ভাব্য পরিণতির মধ্যেই বিচার করতে হয়। অর্থাৎ বিচারটা শুধু সে এই মুহূর্তে কী তাই নয়, সে কি হতে চাচ্ছে তা-ও। তার অস্তিত্বের সঙ্গে তাই স্বভাবতই ঔচিত্য জড়িয়ে যাচ্ছে। কাজেই সমাজদর্শন ক্রম উদ্‌বর্তনতত্ত্বে নৈতিক মানের প্রসঙ্গ তুলছে। অধ্যাপক হব্‌হাউস চমৎকার বলেন তাই যে 'Anlaysing a society as an existent fact, we find in it a co-operative principle. Analysing the good as a system of values we again find the co operative principle.' যে দিক থেকেই আলোচনা করা হোক আমরা সহযোগিতায় ফিরে আসছি। সামাজিক সহযোগিতা থেকে আসে কল্যাণের আদর্শ আর কল্যাণের প্রতিষ্ঠা সম্ভব একমাত্র সহযোগিতাতেই। এই বিরোধ ও সহযোগিতার সম্পর্ককে জর্মন দার্শনিক কাণ্ট চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন 'Man wishes concord; but Nature knows better what is good for his species, and she will have discord. He wishes to live comfortably and pleasantly; but nature wills that turning from idleness and in active contentment he shall throw himself into toil and suffering even in order to find out remedies against them, and to extricte his life prudently from them again.'

৫। সামাজিক উদ্‌বর্তনের সর্ত (Condition of Social Development):

অধ্যাপক হবহাউস উদ্‌বর্তনের চারটি শর্তের কথা বলেন। (ক) পরিবেশমূলক (খ) জৈবিক (গ) মনস্তাত্ত্বিক ও (ঘ) সমাজতাত্ত্বিক। এই চারটি সর্তের ছুটি সমগ্র সংগঠনের অর্থাৎ সমাজের সঙ্গে জড়িত ও অন্য ছুটি ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত।

(ক) পরিবেশমূলক সর্ত—একথা আমরা জানি যে মানুষের ওপর প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক প্রভাব পড়ে। ইতিপূর্বে বোদাঁ ও মণ্টেস্কুর উদ্ধৃতিতে আলোচনা করা হয়েছে (খ) কেমন করে একটি জাতির মানসিকতা প্রাকৃতিক কার্যকরণে গড়ে উঠছে। ব্যক্তির সমস্ত চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে তার স্বাধীনতা জড়িত কিন্তু প্রকৃতি তার জীবনের মৌলিক নিয়মাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃতির নিয়ম মেনেই মানুষ প্রকৃতির ওপর

প্রভাব বিস্তার করে। জড়বাদী ও আচরণবাদী দার্শনিকরা দেখিয়েছেন ব্যক্তির ওপর প্রাকৃতিক ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কেমন প্রভাব।

পরিবেশের প্রভাবকে স্পষ্টভাবে বুঝবার জন্যে পরিবেশের প্রকৃতি জানতে হয়। পরিবেশ হয় দু'ধরণের, (ক) প্রাকৃতিক ও (খ) মানুষী। প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে বোঝা যায় স্থানের প্রভাব ও প্রকৃতির নিজস্ব ভৌত-রাসায়নিক নিয়ম। ভৌত-রাসায়নিক নিয়মের প্রভাব সবার ওপর প্রযোজ্য। মাধ্যাকর্ষণের হাত থেকে যেমন কারোর রেহাই নেই। কার্যত সমাজতত্ত্বে কিন্তু এই সর্বত্র স্বীকৃত প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ে আলোচনা করা হয় না। প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে ভৌগোলিক আঞ্চলিক মাধ্যমিক প্রভাবকেই বোঝায়। ভূগোলের প্রভাবের কথা আমরা সাধারণভাবেই জানি যে সমুদ্রোপকূলবর্তী জাতিরা নৌবিদ্যাবিশারদ হয়। হিমাঞ্চলের লোকেরা কর্মঠ হয় বা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকেরা তুলনায় শ্রমবিমুখ হয় ইত্যাদি। কার্ল রিটার নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত এ বিষয়ে চমৎকার লিখেছেন।

পরিবেশ দু'রকমের, প্রাকৃতিক ও মানুষী

'Man cannot be regarded as dissociated from those things which cover the earth and occupy space. He belongs to the earth, and to the three kingdoms, the mineral, the vegetable and the animal, having, virtue of his form by characteristics found in all of those. And yet man, whether regarded as an individual or as having collective, natural existence, is not bound to one sopt as are the members of the three natural kindoms; still he is very much modified by his surrounding, both in his physical and intellctual nature.'

এই বক্তব্যের স্বপক্ষে অন্যত্র উদাহরণ দেখিয়েছেন বর্তমানের বিখ্যাত ইতিহাসিক আর্নল্ড টএনবী। তিনি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে গ্রীসে, যেমন এথেন্স ও স্পার্টা নগরে, দুই জাতের সংবিধান গড়ে ও মানুষ বিষয়ে কল্পনা বিভিন্ন হয়। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও যেমন বলা যায় যে ভারবর্ষের প্রধান বক্তব্য 'ত্যাগ' ও 'বৈরাগ্য' সম্ভবত এখানকার বিরাট বিস্তীর্ণ প্রান্তর ও আকাশ, উর্বর জমি ও অফুরন্ত খাদ্যশস্যের প্রাচুর্যের কারণে গড়েছে। অথচ পশ্চিম মহাদেশে এই কারণগুলো অনুপস্থিত থাকায় তার ত্যাগের

কথা এমনভাবে বলতে পারেনি। বহু আদিমগোষ্ঠী আছে যারা পরিবেশে বদলাবার তাগিদ না পাওয়ায় অনাদিকাল থেকেই প্রায় সভ্যতার একটি পর্যায়ে স্থির হয়ে আছে। তাদের জীবনযাত্রা অনড় ও অটল, পরিবর্তনের কোনো সাড়াই তাদের জীবনে নেই। অথচ পরিবেশের চাপ থাকায় অন্যান্য দেশ ও গোষ্ঠী ক্রম-উদ্‌বর্তনের ধারায় এগিয়ে যেতে পেরেছে।

(খ) মানুষী—মানুষী পরিবেশ বলতে বুঝি যে পরিবেশ মানুষেরাই সৃষ্টি করেছে অর্থাৎ সমাজে প্রত্যক্ষত যে মানবগোষ্ঠীসমূহ আছে তাদের জীবনযাত্রা ও তৎপ্রসূত প্রভাবাদি। মানুষী পরিবেশের পরিচয় মেলে সংস্কৃতিতে। সংস্কৃতি একটি জাতির অন্তর্নিহিত সত্যকে যেমন প্রকাশ করে তেমনি যুগযুগান্ত ধরে জিইয়ে রাখে। মানুষী পরিবেশের চাপ প্রচণ্ড। কারণ প্রতিটি পরিবার ও গোষ্ঠী-সংগঠন সংস্কৃতির পরিমণ্ডলেই গড়ে ও বাঁচে। ব্যক্তিরা জন্মায় পরিবারে এবং জন্মেই সংস্কৃতির পাঠ পেয়ে যায়। সংস্কৃতির ছাঁচে কমবেশি তাদের মান তৈরি হয় এবং সেই মাপে পরিবর্তনের কথা ভাবে, নতুন চিন্তা আনে সমাজে। সাধারণভাবে পাড়াপড়শীদের দিয়েই আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের কাজকর্মের ওপর কেমন অকথিত চাপ তাদের থাকে। কতো কাজ আমরা তাদের ভয়ে করতে সাহসী হইনা, কতো কাজ তাদের ভরসাতে করে ফেলি। পাড়াপ্রতিবেশী ছাড়িয়ে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এসে বোঝা কিছু কঠিন হয় না যে সংস্কৃতিই জীবনযাত্রার লক্ষ্য নির্দেশ করে এবং আমাদের কর্মে প্রেরণা দেয়। তখন কর্মের সূত্রেই সমাজ বিবর্তনের সূত্রপাত ঘটে এবং মানুষ দিনে দিনে অতীত ও বর্তমানে টানাপোড়েনে ক্রমশ তার নিজস্ব লক্ষ্যের দিকে উদ্‌বর্তিত হতে থাকে।

(গ) জৈবিক সর্ত—বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারয়ুইনের নামের সঙ্গে পরিবর্তনের জৈব নিয়মাবলী জড়িয়ে আছে। তিনি বংশ পরম্পরার কথা ব্যাখ্যা করবার বাসনায় অভিযোজনতত্ত্বটি (adaptation to the environment) উপস্থিত করেন। ওই তত্ত্বে তিনি বলেন যে প্রকৃতি জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমকে বাছাই করে নেয়। ডারয়ুইন অবশ্য এমন কথা বলেননি যে যোগ্যতমের বাছাই কার্যত সংঘর্ষ বা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্থির হবে। তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে পিতৃপুরুষের সঙ্গে তুলনায় সন্তানসন্ততি পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে বেশী খাপ খাওয়াতে পারে কারণ বংশধারায় তারা কিছুটা অভিজ্ঞতা পাচ্ছে, আর বাকিটুকু নিজেরাই

গড়ছে চারপাশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টায়। অথচ তৎসত্ত্বেও বহু প্রাণী এবং উদ্ভিজ্জ পৃথিবী থেকে মুছে গেছে। ডারয়ুইন তার কারণ নির্দেশ করেন প্রকৃতির বাছাই তত্ত্বে (Natural selectiou)। যারা নিজেদের ভিতরে বাঁচার উপকরণ তৈরি করতে পারে না তারা মুছে যাবে।

ডারয়ুইনের এই তত্ত্বকে নানা জাতের পণ্ডিত সমাজতত্ত্বে উপস্থিত করেন। তাঁদের বক্তব্য, যেমন গামপ্লোহ্বিকজ বা র‍্যাটজেনহফার বলেছেন, সামাজিকভাবে পরগাছা তৈরি বন্ধ করতে হবে। কারণ দুর্বল ও হীন গোষ্ঠীকে যদি বাঁচতে না দেওয়া হয় তবেই বিশ্বের মঙ্গল। অর্থাৎ প্রকৃতির নির্বাচনকে তাঁরা নিজেদের হাতে তুলে নিতে চান। ওঁরা যাকে মনে করবেন যোগ্যতম তাকেই কেবল রাখবেন। স্পার্টা নগরীতে যেমন দুর্বল ও অসুস্থ শিশুদের মেরে ফেলা হত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হয় ফ্যাসীবাদী হিটলারের নয়া জাতিতত্ত্বে। হিটলারও ডারয়ুইনের নাম নিয়ে অভিযোজনতত্ত্বের সাহায্যে জর্মন জাতিকে (নর্ডিক) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি বলে হুঙ্কার দিয়েছিলেন। এই বক্তব্যের অবধারিত সিদ্ধান্তে এই হয় যে, একমাত্র জর্মনজাতিই পৃথিবী শাসনের যোগ্য।

ইংরেজ দার্শনিক ব্র্যাডলী একবার নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় এ-জাতীয় মন্তব্য করেছিলেন যে অসুস্থ শিশুদের মেরে ফেলবার অধিকার সবার আছে।

সুতরাং জৈব নিয়মের চাপেই সমাজ পরিবর্তিত হতে বাধ্য।

(গ) মনস্তাত্ত্বিক সর্ত—মনস্তাত্ত্বিক সর্তটি ধরা হচ্ছে এই কারণে যে মানুষের মন আছে এবং সে ভাবনার সূত্রেই কাজ করে। সচেতন-ভাবনার ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বের যোগ ততো নেই। কিন্তু অচেতন ও অবচেতন বিষয়ে মনস্তত্ত্ববিদদের বক্তব্য আছে। মানসিক কার্য কারণে সমাজ-জীবনে নানা পরিবর্তন ঘটতে পারে। স্বয়ং ফ্রয়ড যেমন দাভিঞ্চি ও মোজেসের আলোচনা করে দেখান। সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে ঘটনাটি যে অত্যন্ত মূল্যবান সে কথা গ্রীক গ্রকন ও এডিম্যানটাস বলেছিলেন এবং হব্‌স চমৎকারভাবে তার প্রসঙ্গ তুলেছেন যে সমাজের ভিত্তি মনস্তাত্ত্বিক। শুধু হব্‌সের কথাই নয়, সম্পর্ক যেহেতু মানুষ গড়ে এবং মননের দ্বারা পরিচালিত করে তখন এই কার্যকারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সর্ত।

(ঘ) সমাজতাত্ত্বিক সর্ত—সমাজতত্ত্ব ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করে। আমরা সমাজতত্ত্ব থেকে জেনেছি যে সমাজটা হলো সম্পর্ক এবং ব্যক্তিদের সক্রিয় সহযোগিতায় এই সমাজের অস্তিত্ব নির্ভর করে। সুতরাং সমাজ বিবর্তন ও ক্রম-উদ্‌বর্তনের জন্য সমাজ-তত্ত্বকে স্বীকার করতেই হয়। সমাজতত্ত্ব শেখায় ব্যক্তির মানস বলতে কি বোঝায়, সমাজমন বলতেই বা আমরা কি বুঝি। ব্যক্তির জীবন সমাজের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তি আবার সচেতনভাবে সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সমাজতত্ত্বের কাছে আমরা সংগঠনের রূপের বিষয়ে জানতে পারি। হবহাউস তাই বলেন যে 'Generally the character of a resultant of the character of component individuals in the interactions which belong to the group at that time.' প্রতিটি ব্যক্তিকেই এ সম্বন্ধে জানতে হয় কারণ সমাজে জন্মে, সমাজের বিভিন্ন প্রত্যয় বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে সে সমাজের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থির করে। সম্পর্ক স্থির হলেই তবে ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পায়। অধ্যাপক গিন্সবের্গ যেমন বলেন যে ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভিন্ন সামাজিক উন্নতি অসম্ভব। পারস্পরিক সহযোগিতাই সমাজকে সংঘবদ্ধ রাখে। ব্যক্তির নিছক একক অস্তিত্বে জাতির মঙ্গল সৃষ্ট হয় না। সমাজতত্ত্ব মঙ্গলের সঙ্গে সংগঠনের সম্পর্ক নির্ধারণ করে এবং ব্যক্তির মনে মঙ্গলের বোধকে সদাজাগ্রত রাখতে সাহায্য করে। তাই সমাজ-তত্ত্বের সূত্রেই সমাজ পরিবর্তনের প্রসঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কবি জন মিল্টন এই বক্তব্যটিকেই চমৎকার ব্যাখ্যা করেন যে, কোন ব্যক্তিই, যার মনে ঔচিত্যের বোধ জাগ্রত, বোকার মতো বলতে পারে না যে সে জন্মেই স্বাধীন বা মুক্ত। এককভাবে তার ভাবনা পরিচালিত হলে সে কেবল ধ্বংসের পথেই এগোয় তাই মিল্টনের মতে 'they agreed by common league to bind each other from mutual injury, and jointly to defend themselves against any that gave disturbance or opposition to such agreement. Hence came cities, town and commonwealths.' জীবনের প্রয়োজনেই যে সংঘবদ্ধতা এ কথা আমরা সমাজতত্ত্বের কাছ থেকে শিখি। সমাজতত্ত্ব শেখায় বলেই কখনো সচেতনভাবে এবং কখনো অজ্ঞাতেই মানুষ সমাজের ভিত্তিকে রক্ষা করে।

প্রকৃতির নিয়মে মানুষ বড়োজোর বাঁচার কথা জানে কিন্তু এরিস্টটল কথিত ভালোভাবে বাঁচা বা শুভজীবনের আদর্শ সে জানতে পারে সমাজবদ্ধ অস্তিত্বে। আমাদের মানুষ হিসেবে বাঁচার প্রথম শিক্ষাই প্রচার করে সমাজতত্ত্ব। নইলে ব্যক্তিরা যে যার মতো চলতে চলতে নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলতো। দার্শনিক স্পিনোজা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমাদের প্রাকৃতিক নিয়মে বাঁচা ও যুক্তির সামাজিক নিয়মে বাঁচাকে তফাৎ করে বুঝিয়েছেন। তিনি লিখেছেন 'By the light and ordinance of nature, I mean merely those natural laws werewith we conceive every individual to be conditioned by nature, so as to live and act in a given way'। এই প্রাকৃতিক নিয়মে বাঁচার কোনো তাৎপর্য নেই কারণ মাছেরাও প্রাকৃতিক নিয়মে বাঁচে, জলে সাঁতার দেয় ও বংশ বিস্তার করে। মানুষ যদি কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মে বাঁচে তো তার শুধু বাঁচাটাই সত্য, বংশবিস্তারটাই সত্য। এই বাঁচায় প্রকৃতির অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে তার কোনো মৌলিক তফাৎ নেই। অথচ আমরা জানি মানুষ ঠিক প্রকৃতির নিয়মে অন্য প্রাণীর মতো বাঁচে না। তার বাঁচার নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। এবং সেই লক্ষ্য অনুযায়ী সে জীবনের সংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে, সচেতনভাবে আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করে। স্পিনোজা তাই মানুষের মতো বাঁচা অর্থাৎ সামাজিক নিয়মে বাঁচার অর্থকে ব্যাখ্যা করেন।

মানুষ প্রকৃতির নিয়ম মতো চলে না

'Wherefore among men, so long as they are considered as living under the sway of nature, he who does not yet know reason or who has not yet acquired the habit of virtue, acts solely according to the laws of his desire' অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে বাঁচাটা কেবলমাত্র কামনা-বাসনার ব্যাপার, আর মানুষের মতো বাঁচাটা 'ভার্চু' বা সততা ও ন্যায়ের সঙ্গে বাঁচা। এই ন্যায় ও সততার জন্য 'man must necessarily come to on agreement to live together as securely and well as possible if they are to enjoy as a whole the rights which naturally belong to them as individuals'.

ন্যায় ও সততাতেই ব্যক্তির মনুষ্যত্ব। জীবন ও সমাজের ক্রম-উদ্বর্তনে ন্যায় ও সততাই একমাত্র লক্ষ্য। সমাজতত্ত্ব এ বিষয়ে আমাদের অজ্ঞান

দূর করে তাই সামাজিক সর্ত ছাড়া ক্রম-উদ্‌বর্তনের মূল্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

সামাজিক প্রগতি (Social Progress)

সামাজিক আদর্শের সূত্রেই প্রগতি তত্ত্বটি আলোচনায় উঠেছে। পরিবর্তন বা বিবর্তন মানুষের সমাজের ক্ষেত্রে একটি স্বীকৃত তথ্য কারণ পরিবর্তন বিশ্বজগতের নিয়ম। পরিবর্তনের চরিত্র মানুষের ইন্দ্রিয়লব্ধ বোধ ও অভিজ্ঞতা। কিন্তু ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ থেকেই মানুষ জানে যে পরিবর্তন ও প্রগতি সমার্থক নয়। পরিবর্তনে আমরা মূল্য আরোপ করিনা কিন্তু প্রগতিতত্ত্বটি সম্পূর্ণতই মূল্য বিচারের বিষয় যেহেতু প্রগতি বিচারে মানুষকে বাহ্য মানদণ্ড প্রয়োগ করতে হয় এবং সেই মানদণ্ডটি কখনোই স্বীকৃত ও সর্ববাদীসম্মত নয়।

পরিবর্তন বা বিবর্তন বলতে আমরা অবস্থান্তর বুঝি। যেমন সকাল-বেলা কুঁড়ি থেকে ফুল ফুটলো আর সন্ধ্যেবেলা ঝরে গেলো। এখানে স্পষ্টতই ফুলের দুটি অবস্থা। এই দুটি অবস্থাকে জুড়তে পারলেই আমরা বলবো পরিবর্তন বা ফুলের বিবর্তন। অথবা যেমন শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতির উদ্ভব হলো। যা পূর্বে ছিলো না অথচ বর্তমানে ঘটলো এবং পরে আর থাকবে না তাকেই আমরা বিবর্তন বলছি।

সমাজতাত্ত্বিক হর্বর্ট স্পেনসর বিবর্তনে তিনটি স্তরের কথা ব্যাখ্যা করেন। (ক) সংহতি (খ) বিশ্লেষীকরণ ও (গ) নির্দিষ্ট স্থিতি। সংহতির প্রক্রিয়ায় প্রথমে বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলো একত্রিত হয়ে একটি 'তন্ত্র' (System) তৈরী হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ওই তন্ত্রের সংহতির মধ্যেই বিশ্লেষী-করণ চলতে থাকে। যেমন গোষ্ঠীর সংহতির মধ্যে নানাজাতের ছোট ছোট সংগঠন তৈরি হয়, যেমন পরিবার ইত্যাদি। তৃতীয় পর্যায়ে বিশ্লেষীকরণের একটি নির্দিষ্ট স্থির পরিচয় জানা যায়, যা নিয়মের অধীন। সমাজে, স্পেনসর বলেছেন, বিবর্তনের ধারা সরল থেকে জটিলতার দিকে, সমতা থেকে অসমতার দিকে। স্পেনসর যদিও প্রগতিতত্ত্ব বিষয়ে মনস্থির করতে পারেননি তবুও ওঁর ধারণায় বিবর্তন ও প্রগতি সম্পর্কিত। যে কোনো বিবর্তনই প্রগতির স্বাক্ষর বহন করে কারণ, ওঁর মতে, বিবর্তনে সমাজ এগোয় বৃহত্তর সংগঠন, সমতা, বহুরূপত্ব ও নির্দিষ্টতার দিকে ('there is progress towards greater size, coherence, multiformity and definiteness')।

অধ্যাপক ম্যাকাইভর ও পেজ স্পেনসরকে সমর্থন করেন না। ওঁদের মতে বিবর্তন ও প্রগতি ভিন্ন। বিবর্তন ওঁদের মতে একটি তন্ত্রের মধ্যে অঙ্গের বিশিষ্টতার ক্রমবর্ধমান রূপ। নতুন অবস্থা ঘটলে আর তাকে ওঁরা বিবর্তন বলতে রাজী নন। বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় আছে সংহতি ও বিশ্লেষী-করণ। বিশ্লেষীকরণেই সমাজ বিবর্তনের নিয়ামক শক্তিকে পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্লেষীকরণে ফলে পাই: (ক) ব্যাপক শ্রম বিভাগ (খ) বৃত্তিমূলক সংগঠনের বৃদ্ধি ও সামাজিক আদান প্রদানের মাধ্যমের বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি।

অনেক সমাজতাত্ত্বিক যদিও সমাজ বিবর্তনের একটি বিশ্বব্যাপী ধারা পেয়েছেন, আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়েছি যে এমন ধারণা সত্য নয়। গিন্সবের্গ বিবর্তনে নতুনত্ব পান এবং নতুনত্বের মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধক্রমকে উপলব্ধি করেন। গিন্সবের্গের ক্রমকে অবশ্য মানুষ রক্ষা করে কারণ একমাত্র মানুষই ইতিহাস জুড়ে একটানা তার জীবনকে সৃষ্টি করে চলেছে। কার্যত কিন্তু আমরা কেবলমাত্র বলতে পারি যে সমাজে পরিবর্তন আসে এবং পরিবর্তনের কোনো নির্দিষ্ট একরৈখিক গতি নেই।

য়ুরোপে প্রগতির কথা বিস্তারিত তোলেন মতাঁঞ (Montaigne), বেকন (Bacon) ও দেকার্তে (Descartes)। ওঁদের তিনজনারই মতে সমাজ চলে উন্নতি থেকে উন্নতিতে। প্রগতির সবচেয়ে বিখ্যাত তথ্যটি তৈরি করেন ইতালীয় দার্শনিক ভিকো। ভিকো জানতেন যে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা ঐশ্বরিক নিয়মের দ্বারা চালিত। তিনি লিখেছেন 'The entire course of historical development he held to have been determined by certain principles, chief among which are the belief in Divine Providence', ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থেকেই বিশ্বজগতে উদ্‌বর্তনের ক্রমিকতা আসে কারণ ঈশ্বরের নিয়মেই সবকিছু পরিণতিতে পৌঁছোচ্ছে। ভিকো-পরবর্তী ফরাসী পণ্ডিত টার্গো প্রগতিতত্ত্বকে আধুনিক রূপ দেন। ওঁর ভাষায় 'and mankind, viewed from its origin, appears to the eyes of a philosopher as one vast whole, which itself, like each individual, has its infancy and its growth.'

টার্গোর মতে বিভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শেই ইতিহাসের গতি তৈরি হয় এবং প্রত্যেক সাংস্কৃতিক উন্নতির সঙ্গে প্রগতি জড়িত থাকে। প্রগতি-

তত্ত্বের সঙ্গে টার্গো একটি 'চূড়ান্ত পরিণতিতত্ত্ব' গড়েন। হেলভেটিয়স, কনডর্সে ও গডয়ুইন টার্গোর এই বক্তব্যকে বিশেষ রূপ দেন। কোঁৎ প্রগতিতত্ত্বকে দাঁড় করান মানুষের সভ্যতা-বিবর্তনের নিয়মের সঙ্গে। কনডর্সের মতে মানুষের প্রগতির কোনো সীমা নেই, কারণ মানুষকে আর কারোর ওপর নির্ভর করতে হবে না। কনডর্সের ভাষায় 'that nature has assigned no limit to the perfecting of the human faculties, that the perfectability of man is truly indefinite; that the progress of this perfectibility, henceforce independent of any power that might wish to arrest it, has no other limit......Doubtless this progress can be more or less rapid; but never will men retrograde'.

এই সব দার্শনিকদের আলোচনা দেখে বোঝা যায় যে তাঁরা শুদ্ধ পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করবার জন্যে একটি তত্ত্ব খুঁজতে থাকেন। কারণ লক্ষ্যহীন পরিবর্তনের কোনো তাৎপর্য বোঝা যায় না, জীবন বিষয়ে কেনো এবং কী এর জবাব মেলে না। এছাড়াও ওঁরা দেখেছেন যে মানুষের চেষ্টায় কেমন যুগে যুগে জ্ঞানের সঞ্চয় হচ্ছে, মানুষ আগে যা জানতো তার চেয়ে অনেক বেশি জানছে। সুতরাং এই যে অবস্থান্তর তা তো উন্নতিরই সূচক! স্বভাবতই তখন এই দুটি মনোভাবের থেকে প্রগতির তত্ত্ব তৈরি হয়। দার্শনিকরা ভাবলেন যে মানুষী উন্নতির নিশ্চয়ই কোনো লক্ষ্য আছে এবং উন্নতিই, ক্রম-উদবর্তনই নিশ্চয়ই তার আদর্শ। এই বক্তব্যের সঙ্গে মেলে ধর্মের প্রস্তাব। খৃষ্টধর্মে ঈশ্বরের পুত্রের শ্রেষ্ঠত্ব মানুষকে আদর্শ চরিত্র হবার কল্পনা দেয়। সুতরাং এবার প্রগতিতত্ত্বে জীবনের শুরু ও অন্তকে যেমন ক্রম-উদ্‌বর্তনের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়, তেমনি সমাজ জীবনকেও বলা যায় একটানা প্রগতির ধারা যেহেতু প্রগতিশীল মানুষের সম্পর্ককেই প্রকাশ করে বিভিন্ন সংগঠন।

প্রগতিতত্ত্বটি নৈতিক আদর্শ এবং তা মূল্য বিচারের সূত্রেই তৈরি হয়েছে। দার্শনিকভাবে প্রগতিতত্ত্বের প্রয়োজন জীবনকে নির্দিষ্টতা দেবার জন্য। কারণ বিরাট বিশ্বজগতে ক্ষুদ্র এককণা প্রাণের যদি কোনো নিহিত মূল্য ও তাৎপর্য না থাকে তবে সমস্ত কর্ম ও ভাবনার উৎস শুকিয়ে যায়। কিন্তু গোড়াতেই মানুষ যদি জানে যে বিশ্বজগতে এমন একটি নিয়ম কাজ করছে যে সবকিছুই উন্নত হবে তবে সে তার নিজের

জীবনেও সাহস পায়, ভরসার সঙ্গে কর্মে লিপ্ত হয় এবং উত্তরোত্তর সচেতন প্রয়াসে জীবনকে গড়ে তোলে।

প্রগতিতত্ত্ব বিষয়ে মনে রাখতে হবে যে মূল্যের যে-কোনো প্রত্যয়ই প্রাকৃতিক অমোঘ নিয়ম নয়। কাজেই তাদের উত্থান পতন আছে। মানুষের ক্ষেত্রে আমরা টার্গো, কনডর্সে বা কোঁতের মতো প্রগতির কোনো অনিবার্য নিয়ম দেখতে পাই না। জীবনযাত্রায় এটুকু শুধু বোঝা যায় যে জীবনকে লক্ষ্যের দ্বারা চালাতে হয় কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে প্রতিটি জীবন ও সংগঠনই একটানা প্রগতির দিকে চলেছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতির শ্রেষ্ঠ বিচার হয়। মানুষের যদিও জ্ঞান ভাণ্ডার বাড়ছে তবু সেই তুলনায় সঙ্গে সঙ্গেই সংস্কৃতি গড়ছে না। অথচ প্রগতির নিয়ম অনুযায়ী সংস্কৃতিরও উন্নতি হওয়া উচিত ছিলো। কাজেই প্রগতিকে বুঝতে হবে লক্ষ্যের অর্থে, কোনো নির্দিষ্ট নিয়মের অর্থে নয়। কিন্তু যে কোনো সমাজের চরিত্র আমরা স্থির করি আমাদের নৈতিক আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে।

৬। সামাজিক প্রগতির মানদণ্ড (Criterion of Social Progress)

প্রগতিকে লক্ষ্য-নির্দিষ্ট বিচার মনে করলে বিচারের মানদণ্ড দরকার করে। দার্শনিক হেগেল বিশ্বকে দেখেছেন স্বাধীনতার ক্রম-উদ্‌বর্তনের ছকে। ওঁর মতে এই স্বাধীনতার মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশ। ওঁর ব্রহ্ম বা পরম ভাবনা ধাপে ধাপে বিভিন্ন পর্বে বিকশিত হয়, কিন্তু লক্ষ্য থাকে ক্রমিক উন্নতি। ওঁর মতে 'The culture of every people—its art, religion, political institutions—express a particular stage in the activity and revelation of the absolute idea'. প্রত্যেক জাতির আত্ম-প্রকাশের ক্রম-উদ্‌বর্তিত পর্বে পর্বে বিশ্ব-আত্মার প্রকাশ চলতে থাকে। বিশ্ব আত্মা ও স্বাধীনতার প্রকাশকে হেগেল দেখেন চারিটি সংস্কৃতির ক্রম বিবর্তনে, প্রাচ্য, গ্রীক, রোমক ও জর্মন। এই চারিটি ধাপে স্বাধীনতা তার চূড়ান্তরূপ পায়।

হেগেলের বিচারে প্রগতির তাৎপর্য স্থির হয় স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠায়। আর সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক ব্লাকমার ও গিলিন বলেন সামাজিক প্রগতির বিচার হবে (ক) সমাজের ঘনিষ্ঠ সংহতি, (খ) সংগঠনের গড়ন ও কর্মের পার্থক্য, (গ) অংশের আত্মস্থ বিকাশ, (ঘ) বংশ পরম্পরায় জীবনের শুভ অবস্থা, (ঙ) জাতি ও গোষ্ঠীর উন্নতি, (চ) সমসুযোগ, (ছ) সাধারণ স্বার্থে

ধনের প্রয়োগ, (জ) ব্যক্তির স্বার্থে সমাজের কার্যক্রম, ও (ঝ) প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির দ্বারা।

অধ্যাপক গিডিংসের মতে ব্যক্তির দিক থেকে বিচার করলে সহানুভূতি ও বিচারবুদ্ধিকেই মানদণ্ড বলতে হবে। সামাজিকভাবে দেখলে প্রগতি বলতে বুঝতে হবে ইহ জাগতিক কল্যাণের বৃদ্ধি, জনসংখ্যার বিস্তার ও বুদ্ধি চালিত আচরণ ইত্যাদি। আমরা অবশ্য প্রগতির দুটি লক্ষণ নির্দেশ করতে পারি। বাহ্যত, সভ্যতার দিক থেকে ও সংস্কৃতির দিক থেকে অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে। শুধুমাত্র সভ্যতার কথা ভাবলে একটি জাতির সমগ্র পরিচয় পাওয়া যায় না। তেমনি শুধু সংস্কৃতিকে বিচার করা সম্ভব নয়। কারণ সভ্যতার ভিত্তিতে সংস্কৃতির ফসল ফলে। সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ফারাক সর্বদাই থাকে; কিন্তু সংস্কৃতি কখনোই সভ্যতার বনিয়াদ ছাড়া গড়ে না। কারণ জীবন সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের স্বভাব প্রকাশিত হতে থাকে সংস্কৃতিতে এবং সংস্কৃতিই যেমন প্রগতির সবচেয়ে বড়ো মানদণ্ড তেমনি আমরা জীবন সংগঠন বলতে সভ্যতাই বুঝি।

অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি কয়েকটি নীতির কথা বলেছেন; (ক) প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ, (খ) সামাজিক চেতনায় ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও (গ) আত্ম নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি 'নিয়ন্ত্রণ'কেই প্রগতি মনে করেন। প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব বিস্তারে মানুষের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা ইতিপূর্বেই তাকে জীবন সংগঠন বলেছি। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে করতেই মানুষের জ্ঞান বাড়ে এবং বর্ধিত জ্ঞান অনুযায়ী মানুষ সভ্যতা তৈরি করে। সভ্যতা তাকে পুরোনো জীবন সংগঠন থেকে বিস্তৃত, জটিল ও সুখকর জীবন সংগঠনে নিয়ে আসে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে ম্যাকেঞ্জি বোঝেন সংগঠনগুলোর জনকল্যাণকর কর্তব্যের কথা। কিন্তু এই বক্তব্যটির সঙ্গে প্রগতির কোনো গভীর যোগ নেই। সংগঠনগুলো বিশেষভাবে জনকল্যাণের আদর্শ অনুকরণ করলে ভালো, না করলে মানুষের সভ্যতা যে বন্ধ হয় তা নয়। তবে এ-কথা নিশ্চয়ই সত্য যে মানুষের সর্ববিধ মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রয়োজন। ম্যাকেঞ্জি হেগেলের মতো স্বাধীনতার প্রসঙ্গ তোলেন নি। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কতোটুকু জনকল্যাণ করবে তার চেয়ে বড়ো কথা হলো প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের সত্তাকে প্রকাশ করবে কিনা। যদি

প্রকাশ করে, যেমন হেগেল বলেছেন করতে হয়, তবে প্রগতি আসতে বাধ্য।

আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। ম্যাকেঞ্জি বলছেন আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ প্রবৃত্তির নিরোধ। বিচার বুদ্ধির সঙ্গে তাদের ব্যবহার করতে হবে। ম্যাকেঞ্জি কিন্তু ব্যক্তির স্বভাবের কথা তোলেন নি। শুধু নিয়ন্ত্রণের কথা বলছেন প্রবৃত্তি দমনের অর্থে। কিন্তু প্রবৃত্তি দমন কেনো? আমরা বলতে চাই যে প্রবৃত্তি দমন ব্যক্তির স্বভাবকে জানবার জন্যে। তার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। হেগেল এ কথাই বলেন যে ব্যক্তি ধাপে ধাপে আত্ম আবিষ্কার করে বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে। বিভিন্ন সংগঠন আবার ধাপে ধাপে বিশ্বআত্মা বা পরম ভাবনা বা হেগেলীয় ব্রহ্মকে প্রকাশ করে।

ম্যাকেঞ্জির বক্তব্যে আর একটি প্রত্যয় অনুপস্থিত। আমরা তাকে বলেছি সংস্কৃতি। কারণ মানুষ তার কর্ম, চিন্তা ও আবেগে আত্ম প্রকাশ করে। চিন্তার সূত্রে তার সভ্যতা ও জ্ঞানের বিকাশ হয়। কর্ম তাকে সংগঠিত করে। আবেগে মানুষ নিজেকে এক মুহূর্তে খুলে ধরে অন্তর্নিহিত সত্যের আলোকে। তাই সংস্কৃতিতেই প্রগতির পরিচয়। সমাজে ধর্ম-পরিমণ্ডলে প্রতিটি মানুষ নিজস্ব বৃত্তি অনুযায়ী কর্ম করবে এবং তার সূত্রে যদি সে সাংস্কৃতিতে আত্ম-প্রকাশ করতে পারে তবেই প্রগতি স্ফূর্ত হয়।

ন্যায় (Justice)

ন্যায় শব্দটির সঙ্গে নীতি জড়িত। কারণ ন্যায় কর্মের, কর্মের যাথার্থ্য বিচার হবে নির্দিষ্ট চিন্তা ও কল্পনার কষ্টি পাথরে। পৃথিবীর যাবতীয় ভাববাদী দার্শনিকরা ন্যায়কে ব্যক্তি-চরিত্রের প্রকাশ হিসেবে দেখেছেন। ব্যক্তিকে তাঁরা মনে করেছেন বিশ্বচৈতন্যের অংশ। ব্যক্তি তার জীবনে এই বিশ্বচৈতন্যকে উপলব্ধি করতে চায়! এই উপলব্ধিতেই তার পরিপূর্ণতা। ব্যক্তির চরিত্রে নিহিত এই পূর্ণতার সম্পর্ককে ভারতীয় দার্শনিকরা স্বভাব নাম দিয়েছেন। তাঁরা বলতে চেয়েছেন যে স্বভাবের প্রকাশেই জীবনের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কাণ্ট এই স্বভাব আবিষ্কারকে বলেছেন যুক্তির পরিচালনা। ওঁর মতে মানুষ প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে মুক্ত হয় যুক্তিতে এবং যুক্তির পরিচালনাতেই মনুষ্যত্বকে প্রকাশ করে। ওঁর ভাষায় 'Nature has willed that Man shall produce wholly out of himself all that goes beyond the mechanical structure and arrangement

of his animal existences, and that he shall participate in no other happiness or perfection but what he has produced for himself, apart from instinct, by his own reason.......'
ইংরেজ দার্শনিক গডয়ুইন 'স্থায়' সম্পর্কে লিখেছেন 'Justice require that I should put myself in the place of an impartial spectator of human concerns, without regard to my own predilection. Justice is a rule of the utmost universality, and prescribes a specific mode of proceeding in all affairs by which the happinesss of a human being may be affected'—অর্থাৎ ওঁর মতে আমি আমার নিজের ঝোঁক বাদ দিয়ে নিরপেক্ষ দর্শকের মতো বিচার করবো। স্থায় হলো বৃহত্তম সামাজের শাসন কারণ এই সামাজে প্রত্যেকটি ব্যক্তিই স্বীকৃত, তার মধ্যে কোনো বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ কোনো মূল্য থাকে না। গডয়ুইনের শ্রেষ্ঠ সমাজের ভিত্তি তাই স্থায়। কারণ প্রকৃতির নিয়মে প্রতিটি মানুষই সমান অধিকার এবং অধিকার প্রতিষ্ঠাতেই ব্যক্তির পারণতি ঘটে। ওঁরই ভাষায় তাই আবার জানি 'Every man is entitled, so far is the general stock will suffice, not only to the means of being but of wellbeing' অর্থাৎ শুধু বাঁচার অধিকারই স্থায় নয়, ভালোভাবে বাঁচাটাই স্থায়। গডয়ুইনের এই বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে গ্রীক ও ভারতীয় দার্শনিকদের স্বভাবের পূর্ণতা প্রসঙ্গ তিনি স্পষ্টত না-বললেও ওঁর বক্তব্য থেকে সে-কথাই প্রমাণিত হয়।

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এরিস্টটল দুটি বক্তব্য উপস্থিত করেন। একটিকে তিনি বলেন বণ্টন-মূলক স্থায় ও অন্যটিকে বলেন সংশোধন-মূলক স্থায়। প্লেটোর নির্দেশে আমরা জেনেছি তাঁর 'প্রজাতন্ত্রে' প্রতিটি ব্যক্তিই নিজস্ব স্বভাব অনুযায়ী শিক্ষা পাবে এবং কর্মবিভাগে নিজের ক্ষমতাকে প্রকাশ করবে। 'প্রজাতন্ত্রে' তাই শাসকের প্রাথমিক ভাবে লক্ষ্য হবে এই যে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের সমস্ত বাধা যেনো দূর করা যায়। কারণ পরিণতিতে পৌছোতে না পারাটাই অন্যায়। ব্যক্তির স্বভাবের প্রকাশ ছাড়া স্থায়ের আর কোন সত্তা নেই।

ব্যক্তির স্বভাবের স্বীকৃতি সত্বেও দুটি সমস্যা উঠতে পারে। রাষ্ট্র বাধা দূর করতে পারলোনা বা ব্যক্তি অন্যের প্রভাবে নিজের স্বভাবের লক্ষ্যে চললো না। এক্ষেত্রে এরিস্টটল সমাজকে সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে

বলবেন। রুশো ও অন্যান্য ভাববাদীরা বলেছেন ব্যক্তি বহুক্ষেত্রেই 'প্রকৃত সঙ্কল্প' না জেনে বিপথ চালিত হতে পারে তখন সমাজের কর্তব্য হবে তার মঙ্গলের জন্য তাকে দিয়ে প্রকৃত সঙ্কল্প মানিয়ে নেওয়া।

অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি অন্য একটি আদর্শের কথা বলেন। সমাজের দুটি আদর্শ আছে: (ক) আভিজাতিক ও গণতান্ত্রিক। আভিজাতিক আদর্শে বিদ্যা, ধর্ম বা যোগ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব মূল লক্ষ্য। সমাজে শ্রেষ্ঠ পুরুষদের নজীরেই জীবনকে গড়বার কথা থাকে। এই আদর্শে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও দক্ষতার ওপর জোর দেওয়া হয়। কারণ ব্যক্তির সম্ভাবনার পরিণতিতেই তার স্বাতন্ত্র্য ও অভিজাত্য। দক্ষতায় কেবল মাত্র প্রয়োগতাত্ত্বিক নৈপুণ্যের সমালোচনা নয়, দক্ষতা সমাজ ও ব্যক্তির প্রকৃত সম্পর্কের পরিচায়ক।

গণতান্ত্রিক আদর্শে কোনো একটি ব্যক্তির কথা থাকে না, সমস্ত ব্যক্তির কথা বলা হয়। রাজনৈতিক কাঠামো বাদ দিলে গণতন্ত্র ও অভিজাত তন্ত্রের আদর্শে, ব্যক্তির স্বভাবের কথায় বিরোধ থাকেনা। কিন্তু বিরোধ সর্বত্রই সত্য যেহেতু অভিজাততন্ত্র মুষ্টিমেয়র শাসন এবং একমাত্র গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা বলে। সাম্যবাদ এই দুটি আদর্শের বিরোধী। সাম্যবাদ জানায় গণতন্ত্রও মুষ্টিমেয় ব্যক্তির শাসন। একমাত্র সেই সমাজব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ যেখানে জনসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। সাম্যবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠেছে এই যে সাম্যবাদে একটি দলের শাসনই কায়েম হবে।

অনুশীলনী

1. What do you understand by Social ideals ? Why ideals are necessary to Society ?

2. What is justice ? Do you think that justice is related to common interest ?

3. What is 'Progress' ? Is change and progress synonymous ?

4. Write a short essay on the nature of progress and show why such a concept is necessary in Social Philosophy.

5. What do you uuderstand by Social Development ? (B. U. 1962). Enumerate the conditions of Social Development. (B. U. 1962)

চতুর্দশ অধ্যায়

সমাজসত্তা ও লোকায়ত নীতি

১। সামাজিক সত্তা (Social Self) :

সমাজদর্শনে এ-পর্যন্ত আমরা বারবার ব্যক্তির স্বরূপ ও সমাজের চরিত্র খুঁজেছি। আমাদের আলোচনায় আমরা জানতে পেয়েছি ব্যক্তি-জীবনে প্রতিটি মানুষকেই পরিপূর্ণ হতে হয়, পরিণতি আবিষ্কার করতে হয় জ্ঞানে ও কর্মে। নিছক রক্তমাংসের দেহধারণ করলে যদিও তাকে মানুষ বলা হয় তবু সত্যিই তাকে আমরা মানুষ বলতে রাজী নই। কারণ, সেই মানুষ যে তার মনুষ্যত্ব খুঁজে পেয়েছে, যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি মতো 'মানহুঁশ' হয়েছে। কিন্তু সে মানহুঁশ হয় কেমন করে? আমরা বলেছি তাকে মনুষ্যত্বের জন্য প্রথমে পরিপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠ্‌তে হবে। ব্যক্তির অর্থ 'ব্যক্ত হওয়া'। সাধারণতই মানুষ ব্যক্ত হয় তার কর্মে কারণ কর্মেই তার অন্তর্নিহিত চরিত্রের প্রকাশ। কিন্তু তাকে ব্যক্ত হবার জন্যে জানা দরকার কী সে ব্যক্ত করতে চায়, কী তার সুপ্ত আশা যা পূর্ণ-না-হলে তার চলবে না। এক কথায় তাই তার ব্যক্ত করবার বিষয় যা সে নিজে। এমনভাবে কথাটা বললে অদ্ভুত শোনায় যেহেতু প্রতিটি লোকই তো কমবেশি যা তারা নিজে। কিন্তু দার্শনিকরা বলেন, মানুষকে বাইরে থেকে জানা যায় না, এমনকি মানুষেরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে জানে না তারা নিজেরা কী। প্রকৃতির নিয়মে মানুষ জন্মায় আবার মরে। জন্মমৃত্যুর চক্রে একটানা প্রাণপ্রবাহ বয়ে চলেছে। প্রকৃতির নিয়মেই মানুস তার কৃত্য করে, বস্তুসংগঠন ও জীবন সংগঠন গড়ে। তার মধ্যে নতুনত্ব কিন্তু নেই। মৌমাছি বা পিঁপড়েও প্রাকৃতির নিয়মে বাঁচে মরে, নানা সংগঠন বানায়। অথচ মানুষ মানুষ আর মৌমাছি মৌমাছি।

অর্থাৎ দার্শনিকরা বলেছেন প্রকৃতির নিয়ম মানুষকে চালায় বটে, তার দ্বারা তার পরিচয় স্পষ্ট হয় না। তার দ্বারা তাকে অন্যান্য প্রাণী থেকে তফাৎ করা যায় না। মানুষকে পৃথক হবার জন্যে অন্যকিছু দরকার। এই 'অন্য কিছু'ই তার চরিত্র, এই অন্য কিছুর সূত্রেই তার মনুষ্যত্ব। 'অন্য কিছু'র আলোচনায় আমরা জানিয়েছি যে তা হলো মানুষের স্বাধীনতা ও স্বাধীন কর্ম। স্বাধীন কর্মের নিষ্ঠা ও প্রেরণায় মানুষ সজ্ঞানে বাছাই করে এবং বাছাই করতে করতে তার কর্মকে স্থির করে। কর্মের

ক্রম-উদ্‌বর্তিত পরিণতিই তাকে ব্যক্ত করে। কর্মের ক্রম-উদ্‌বর্তিত পরিণতি সে আগে থেকেই কল্পনায় তৈরি করে, কল্পনায় নিজের একটি মাপ প্রতি মানুষই ভেবে রাখে অর্থাৎ কী সে হবে এবং কী সে হতে চায়। সুতরাং তার সমস্ত স্বাধীন কর্মই এই কল্পনা অনুযায়ী হবার সাধনা। যেই মানুষের মধ্যে এই হবার সাধনা এলো অমনি তারা অন্য প্রাণী জগৎ থেকে তফাৎ হতে সুরু করলো।

তফাৎটা শুধু প্রাণী জগত থেকেই নয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও। তার কারণ প্রতিটি লোকই কিছু তার কল্পনা মতো পূর্ণ হয়ে ওঠে না। প্রতিটি লোকই কল্পনা অনুযায়ী স্বাধীন কর্মে তার সঙ্কল্পের ছাপ ফেলে না। এরিস্টটল যেমন বলেছিলেন যে, বিশ্বে একটি লক্ষ্যের টান কাজ করে। কিন্তু তাতে নানা বাধা আছে। প্রাকৃতিক বাধা একটি, অন্যটি সামাজিক। প্রাকৃতিক বাধা, যেমন মৃত্যু। বটবীজের পরিণতি হচ্ছে বটবৃক্ষে। কিন্তু বীজটি অনুকূল পরিবেশ না-পাওয়ায় অঙ্কুরিত হলো না। তখন বলবে যে তার সম্ভাবনার পরিণতি হয়নি অর্থাৎ যে অপূর্ণ। তেমনি মানুষের ক্ষেত্রে মৃত্যু। সামাজিক বাধার ক্ষেত্রে বুঝতে পারা যায় পরিবেশের নানা অভাব অভিযোগ ও অন্যায়। সুতরাং প্রবহমান জীবনযাত্রার দিকে তাকালেই যেমন আমরা দেখতে পাই প্রতিটি মানুষই নিজেকে ব্যক্ত করবার জন্যে তেমন তৎপর নয়। গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে চলে বহু মানুষ। কারণ তারা পরিপূর্ণ ব্যক্তি হতে চাচ্ছে না। তাই সাধারণ লোক ও মহাপুরুষে এতো তফাৎ। ভারতীয় শাস্ত্রে যেমন বলা হয়েছে মানুষ অমৃতের সন্তান। কিন্তু প্রতিটি লোকই কি তার অর্থ-অনুধাবন করে? সেই মতো চলে? চলেনা, চললে জগত সংসারে সবাই পরিণত ব্যক্তি হয়ে উঠ্‌তো। তবু দর্শনের আলোচনায় আমরা বলবো মানুষের পরিপূর্ণতাই লক্ষ্য এবং তাকে পরিপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠ্‌তে হয়।

পরিপূর্ণতার প্রসঙ্গে অন্য ব্যক্তির কথা ওঠে। কোনো একজন মাত্র ব্যক্তিই যেহেতু পৃথিবীতে নেই, তাকে কোনো না কোনো ভাবে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হয়। কার্যত তাই পরিপূর্ণতার সমস্যা যেমন তার নিজের, তাকে অন্যদের কথাও ভাবতে হয়। না-ভেবে কোনো উপায় থাকেনা কারণ তার সমস্ত কর্মের অর্থই হচ্ছে অন্যের সঙ্গে কর্ম, তার ভাবা, তার সাজ-পোষাক, আচার-ব্যবহার সমস্ত কিছুই অন্য সবার ছাপ

বহন করে। এমনকি মৌলিক ভাবে তার অস্তিত্বের স্বীকৃতিই মেলে অন্যের সমর্থনে। একটি মানুষ যে বেঁচে আছে তার প্রমাণ যেহেতু তাকে অন্য লোক স্বীকার করছে! সুতরাং নিজের আত্ম ছাড়াও তাকে অন্যদের আত্ম মানতে হয়।

অন্যের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ ও স্বীকৃতিকেই আমরা সমাজ দর্শনে বলি তার সামাজিক সত্তা।

২। লোকায়ত নীতি (Ethos of the People)

আমরা বলেছি পরিপূর্ণতার আদর্শ মানুষ গড়ে কল্পনায় এবং এই কল্পনাকে রূপ দিয়েই সে পরিপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে: কল্পনাটি সে পাচ্ছে কোথায়? কল্পনাটি সে সম্পূর্ণ একক ভাবে গড়ে? আমরা জবাবে বলবো, না। সম্পূর্ণ একক ভাবে সে কল্পনা গড়তে পারে না। কারণ একটু আগেই আমরা দেখেছি যে তার অস্তিত্বই নির্ভর করে অন্যের স্বীকৃতির ওপর। কাজেই তাকে অন্যের সাহচর্য গ্রহণ করতে হয়।

সাহচর্য মানুষ দু'ভাবে গ্রহণ করে। একটি প্রধানতই অচেতন ও অন্যটি মূলতই সচেতন। মানুষ সে একক ভাবে কল্পনা গড়তে পারে না তার কারণ সে জন্মায় নির্দিষ্ট কোনো সমাজে, নির্দিষ্ট কোনো পরিবারে। না চাইলেও তার পবিবার তার চরিত্রকে একটা ছাঁচে ফেলতে থাকে। পরিবারের মাধ্যমে নানাভাবে সে নানা সংস্কার জড়ো করে। গোড়ায় এই প্রভাব সম্পূর্ণই অচেতন, সে নিজে থেকে কিছুই বাছাই করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে অবশ্য মনে রাখা দরকার যে একই পরিবারে সবাই একই রকম তৈরি হয় না। তার কারণ জীববিজ্ঞানীরা বলেন, প্রথমত বংশানুক্রম ও দ্বিতীয়ত জিনের (Gene) লীলা। বংশানুক্রম ও জিন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। পুরুষানুক্রমে এক একটি পরিবারে এক একটি ধারা চলে। এই ধারা প্রবাহিত হয় রক্তে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়। কিন্তু জিন প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এক ধরণের হয় না। সুতরাং একই পরিবারে পার্থক্য দেখা যায়। জিনের নিজস্বতার চাপ ও পরিবারের প্রভাবে ব্যক্তি অচেতনভাবে গড়তে থাকে। তারপর যখন তার সচেতনতা তৈরি হয় এবং বাছাইয়ের ক্ষমতা হয় তখন সে সচেতন ভাবেই নিজের আত্ম-প্রকাশের পথ বাছে।

কিন্তু পরিবার শূন্যে থাকে না। একটা পরিবারের চারপাশে থাকে অসংখ্য পরিবার। সুতরাং তাদের পারস্পরিক আদান-প্রদানের

মধ্য দিয়ে নতুন নতুন প্রভাবের লেনদেন চলে। ব্যক্তি তার পরিবার থেকে আসে বিভিন্ন পরিবারের আওতায়। অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজে। সেখানে কোনো একজন নির্দিষ্ট লোক বা গোষ্ঠী তাকে কিছু বলেনা বটে, কিন্তু সবাই নানাভাবে চারপাশ থেকে প্রভাব ফেলতে থাকে। প্রভাব পড়ে শিক্ষাব্যবস্থা, সংবাদপত্র, সভাসমিতি ও গ্রন্থাদির মারফৎ। এইসব পথে ব্যক্তির ওপর যে প্রভাব পড়ে তার তলায় থাকে সমগ্র দেশ ও জাতির মন অর্থাৎ সংস্কৃতি। পরিবারগুলো নানাভাবে সংস্কৃতি থেকে গ্রহণ করে। ব্যক্তির সমস্ত কল্পনাই সেই প্রবাহিত সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে তৈরি হয়।

সংস্কৃতির বক্তব্য প্রকাশিত হয় জীবন ভঙ্গিতে, আদর্শে ও কল্পনার লক্ষ্যে। কোন একজন ব্যক্তি অবশ্যই কোনো সংস্কৃতিকে বর্জন করতে পারেন কিন্তু তিনি একটিকে বর্জন করেন অন্য কোনো সংস্কৃতির আদর্শ নিয়ে। যেহেতু পৃথিবীতে কোনো দেশ বা জাতিই সংস্কৃতিহীনভাবে বেঁচে নেই বা থাকতে পারে না। এই যে সংস্কৃতির পরিবেশ, ভালোমন্দ, ন্যায় অন্যায়ের পরিবেশ তাকেই বলা হয় 'ইথস' বা নীতির পরিমণ্ডল। নীতির পরিমণ্ডলকে বোঝাবার জন্যই এরিস্টটল লেখেন 'He who is unable to live in society, or who has no need because he is sufficient for himself must be either a beast or a god.'

নীতির পরিমণ্ডলকে বোঝা যায় সমাজের বিধি ও নিষেধ থেকে। আর বাকি অংশটুকু অস্পষ্ট এবং আংশিক ভাবে সত্য। কারণ তা প্রতিদিনের কর্মে ব্যক্তিরা গড়ে সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে। ব্র্যাডলী যেমন চমৎকার বলেন যে, একটি শিশু কী হবে তা স্থির থাকে না। সে কিছু হবার জন্যে গ্রহণ ও বর্জন করে। গ্রহণ ও বর্জনের সমস্তটাই ঘটে এই নীতির পরিমণ্ডলে। ব্র্যাডলী লিখেছেন The child, in his character of the form of the possibility of a moral individual, is something subjective, his growing to manhood is the ceasing to be of this form, and his education is the discipline or the compulsion thereof. The positive side and the essence is that he is *suckled at the breast of the universal Ethos'*

নীতির পরিমণ্ডলকে সাধারণভাবেই আমরা বুঝি মহাপুরুষদের জীবন ও বক্তব্য থেকে। কারণ ওঁরাই পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন। আমরা

আমাদের চর্চায় ওঁদের পথ অনুসরণ করতে পারি বা নিজেদের পথ আবিষ্কার করবার জন্যে ওঁদের পথের বিষয়ে বিচার বিবেচনা করতে পারি। এমনি করে আমরা যেমন পরিণত হবার চেষ্টা করি তেমনি ভবিষ্যত বংশধরের জন্য একটি নীতি ও কর্মের পরিমণ্ডল রেখে যাই।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সামাজিক ব্যাধি ও নিদান

১। সামাজিক অন্যায় (Social evil)

মানুষ ভালোমন্দের সংমিশ্রণ। সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে জীবনে ভারসাম্য স্থাপিত হয়। মানুষ চলে তার লক্ষ্য-নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে, আর সমাজ তার পরিণতির সহযোগী অবস্থা তৈরি করে। মানুষের কর্মের পারস্পরিকতায় সমাজের কর্ম স্থির হয়। অথচ মানুষ একটানা তার নির্দিষ্ট কর্ম করতে পারে না যেহেতু সে যন্ত্র নয়। সচেতন স্বাধীন কর্মেই মনুষ্যত্বের প্রকাশ; তার সচেতনতা যদিও আমরা বিচার করি পরিণতির আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে তবু আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে সচেতনতা ও সঙ্কল্প এক নয় বা সঙ্কল্প ও কর্মে অনেক তফাৎ থাকে। নানাভাবে তাই কর্মের বিচ্যুতি ঘটতে পারে।

প্রথমত, সমাজে প্রতিটি ব্যক্তিই তার লক্ষ্য বিষয়ে স্থির নিশ্চিত নয়। সুতরাং তাদের লক্ষ্যের অনিশ্চয়তার কারণে কর্মে নানা গোলোযোগ আসতে পারে। দ্বিতীয়ত, সচেতনভাবেই ব্যক্তি যাকে পরিণতি মনে করছে কার্যত তা নিজেকে বোঝার ভুল হতে পারে। অথচ কর্মটি সম্পাদিত হবার পরেই ফলাফল দেখে সে একমাত্র জানতে পারে। তৃতীয়ত, সচেতনভাবে কর্মের পরেও নানা বাধা আসতে পারে। বাধা যেমন আসতে পারে পরিবার ও পরিবেশ থেকে, তেমনি নিজের ভেতর থেকেও কখনো কখনো বাধা তৈরি হয়। সঙ্কল্প ও বাসনায় বিরোধ বাধলেই সমস্যা জটিল হয়ে ওঠে।

সামাজিক অন্যায়ের উৎস তাই আমাদের কর্ম। শুধু অন্যায় কাকে বলা হবে তা নির্ভর করে সমাজের প্রধান বক্তব্যের ওপর। অবশ্য একথা

ঠিক যে অন্যায়ের প্রসঙ্গে কর্তা ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিদের কথাই ভাবা হচ্ছে কিন্তু আমরা জানি যে সামাজিক ন্যায় অন্যায়ের বোধ বহু ক্ষেত্রেই বিশেষ অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে করা হয়। অর্থাৎ আজ যা অন্যায় তা পরে আর অন্যায় নাও থাকতে পারে। বা অতীতে যাকে শুভ বলেছি বর্তমানে তাই অশুভ। সুতরাং ন্যায় অন্যায়ের অনেকটাই পরিবেশের সঙ্গে জড়িত। এমন কি একথাও আমরা জানি যে এমন বহু প্রথা আদিম জনগোষ্ঠীতে প্রচলিত যা আমাদের বিচারে অন্যায় কিন্তু তাদের তা জীবন ধারণের অঙ্গ। দার্শনিক স্যামুএল আলেকজাণ্ডার লিখেছেন 'Murder and lying and theft are a damnosa hereditas left us from a time when they were legitimate institutions : when it was honourable to kill all but members of the clan, or to lie without scruple to gain an end, and when there was promiscuity of property.' আলেকজাণ্ডার বলেছেন খুন, জখম, রাহাজানি ইত্যাদি সব প্রাচীন দিনের স্মারক যখন ওগুলো সমাজে স্বীকৃত ও ন্যায্য ছিলো। এরিস্টটলও দস্যুদের ভদ্র ব্যবসায়ীর সমগোত্রীয় বলেছেন। কিন্তু আমাদের সমস্ত কর্মের অন্যায় যদি অতীতের উত্তরাধিকার হয় তবে বর্তমান কর্মের বিচারে গোলযোগ ঘটে। এবং অন্যায় বিচারের মাপকাঠি পাওয়া যায় না। অন্যায় বিচারে স্বীকৃত সামাজিক অবস্থাটি যেমন সত্য তেমনি সত্য ব্যক্তির ভাবনা চিন্তা। এমন কি আদিম গোষ্ঠীতেও আলেকজাণ্ডারের বক্তব্যমতো এতো সহজে খুন, রাহাজানি ঘটতো না। এই সমাজেও ব্যক্তিরা নিজের মতো কর্তব্য ও ন্যায় ও অন্যায়কে ভাবতো। শুধু সামাজিক নির্দেশ মিলিয়েই নয়, নিজের ভাবনাতেও। সামাজিক আচরণে মূল্যবোধের এই ওঠা পড়া বাদ দিলে অন্যায়ের প্রসঙ্গ দু'রকমে বোঝা যায়। এক হলো কর্তার নিজের দিক থেকে, আর দ্বিতীয়ত, অন্য সামাজিক মানুষের দিক থেকে।

কর্তার ক্ষেত্রে তার নিজস্ব পরিণতির দায় থাকে। অর্থাৎ যদি সে নিজের প্রতি কর্তব্য পালন না করে তবে তা থেকে সমাজের অনিষ্ট হতে পারে। যেমন ধরা যাক একজন ব্যক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞের প্রতিভা আছে অথচ সে তার প্রতিভা বিকাশের জন্য খাটতে রাজী নয়। সে-ক্ষেত্রে তার নিজের ক্ষতির সঙ্গে সমাজের ক্ষতি জড়িত। এই উদাহরণের প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে নিজের প্রতি কর্তব্যের ক্ষেত্রে সামাজিক

অন্যায় প্রত্যয়টিকে ঠিক ব্যবহার করা হয় না। বৃহত্তর সমাজ অর্থাৎ অন্যান্যদের সম্পর্কে যে-কর্ম জড়িত তাকেই ন্যায় অন্যায়ের ক্ষেত্রে বিচার করা হয়।

২। অপরাধ (Crime)

অন্যায় থেকেই সামাজিক অপরাধের সূত্রপাত। কিন্তু সমস্ত অন্যায়কেই আমরা সামাজিক ভাবে অপরাধ বলি না। সেই অন্যায়ই অপরাধ যা কার্যত কর্মে প্রকাশিত এবং কর্ম সমাজের প্রতিষ্ঠিত নিয়মকে ভঙ্গ করেছে। যেমন ধরা যাক আমি মনে মনে কাউকে হত্যা করবো ভেবেছি, কিন্তু তা কর্মে রূপান্তরিত করিনি। সুতরাং নীতিশাস্ত্রের মতে যদিও আমি অন্যায় করেছি, সামাজিক অর্থে আমার কোনো অপরাধ হয়নি। অথবা প্রকাশ্যে আমি কাউকে কটু কাটব্য করেছি যা ভদ্রতার নিয়ম বিরুদ্ধ কিন্তু মানহানি নামক বক্তব্যের আইনসিদ্ধ সীমার মধ্যে না-পড়লে, তাকে কেউ অপরাধ বলে না।

অপরাধের সঙ্গে তাই অন্যায় ও পাপের তফাৎ থাকে। অপরাধ সম্পাদিত হলে সামাজিক ভাবে নানা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। প্রাথমিক ভাবে যে কোনো ক্রিয়ার যেহেতু প্রতিক্রিয়া থাকে, একটি হত্যার প্রতিশোধার্থে অন্য একটি হত্যা সংঘঠিত হতে পারে। তাই সমাজকে এ-বিষয়ে চিন্তিত হতে হয়। এই চিন্তা থেকে শাস্তির প্রসঙ্গ আসে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরস্বাপহরণ করা হলো, সমাজ নজর করলো না। সুতরাং আরো অপহরণের ঝোঁক তখন সমাজে দেখা দেবে। কাজেই সমাজকে শাস্তির কথা ভাবতেই।

৩। সামাজিক অপরাধের কারণ ও নিদান (Cause of crimes and social pathology)

সামাজিক অপরাধের কারণ বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তত্ত্ববিদদের নানা প্রতিবাদী বক্তব্য আছে। মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে এ বিষয়ে সিগমুণ্ড ফ্রয়ড সবচেয়ে বেশি মাথা ঘামিয়েছেন। তাঁর মতে, মানুষের মনের তিনটি স্তর। অচেতন, অবচেতন ও সচেতন। তুলনায় সচেতন স্তরটির আধিপত্য সবচেয়ে কম। মানুষের কর্মের কার্যকারণ অধিকাংশই থাকে অবচেতন বা অচেতনে। সচেতনতা কেবলমাত্র কর্মের বাহ্য অংশটুকু।

মনের কর্মের প্রসঙ্গে ফ্রয়েডের মূল কথা এই যে মানুষের মনে নানা যৌন ইচ্ছা কাজ করে। সমাজবদ্ধতার পূর্বে মানুষ সেই সব বৃত্তিকে অবাধ রাজত্বের সুযোগ দিয়েছিলো কিন্তু সমাজবদ্ধতায় তার সেই স্বাধীনতা নষ্ট হয়। সমাজে বসবাসের জন্য বাধ্য হয়েই তাকে 'ভদ্র' হতে হয়, বৃত্তিদের ওপর মুখোস চাপাতে হয়। এই ভদ্রতার মুখোস দুভাবে পরানো যায়। প্রথমত, মানসিক আদিম পর্যায়কে শুদ্ধতায় রূপান্তরিত করে অথবা অবচেতন বা অচেতনে তাদের চেপে রাখে। মানুষ অবশ্য প্রধানতই চাপতে চেষ্টা করে। তার এই চাপার প্রয়াসের জন্যই সমাজ বিষয়ে ভীষণ ভীতি মনে লুকিয়ে থাকে। তারপর চাপতে চাপতে মন যখন আর পারে না তখন একদিন বাঁধ ভেঙে সমস্ত আদিম বৃত্তিনিচয় বীভৎস-ভাবে অথবা অসুস্থতায় প্রকাশ পায়।

মনস্তাত্ত্বিক ফ্রয়েড যুগান্তকারী সত্য আবিষ্কার করেন মনের বিষয়ে। কিন্তু তিনি যে যৌনতাতত্ত্বে সমস্ত সামাজিক ব্যাধির কার্য-কারণ দেখেছেন তাকে অন্যান্য পণ্ডিতরা পুরো সমর্থন করেন না। অন্যান্যদের মতে যৌনতা ছাড়াও অপরাধের অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক উৎস আছে। ফ্রয়েডের বক্তব্যে একটা কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সঠিক বুঝেছিলেন যে মানুষের মনে নানা জৈববৃত্তি কাজ করে। মানুষের মনুষ্যত্ব যদিও সচেতনায় তবুও মানুষের সবটাই সচেতনতা নয়, তার কর্মের পেছনে কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, দ্বেষ ইত্যাদি বৃত্তিনিচয় কাজ করে। বহুক্ষেত্রে পরিণামের ভয়েই আমরা সব কাজ করি না কিন্তু সুযোগ পেলে বৃত্তিটুকু মেটাতে দ্বিধা করি না বা করবো না। সুতরাং সামাজিক অপরাধের প্রধান একটা কারণ আমাদের মনেই নিহিত।

সমাজতাত্ত্বিকরা কারণটি খোঁজেন প্রধানতই সংগঠনে। অর্থাৎ তাঁদের লক্ষ্য অন্তরে নয় বাইরে। সমাজতাত্ত্বিকরা বলতে চাচ্ছেন যে ব্যক্তির কর্ম যেহেতু সমাজবদ্ধতায় তৈরি হয়, তার কর্মের উৎস ও চরিত্রকে একসঙ্গে দেখা দরকার। খোঁজ করলেই দেখা যাবে ব্যক্তির অধিকাংশ কর্মই কেমন সামাজিক, প্রত্যক্ষ কারণের ওপর নির্ভরশীল। এমন কথা বিখ্যাত ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক কোঁৎ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন ব্যক্তি ও সমাজের জৈব সম্পর্কের সূত্রে। তিনি লিখেছেন 'Society is the collective organism, as contrasted to the individual organism or plant, and possesses the primary organismic attribute of

the *Consensus Universal*. There is to be seen in the organism and in society a harmony of structure and function working toward a common end through action and reaction among its parts and on the environment. This harmonious development reaches its highest stage in human society, which is the final step in organismic evolution. Social progress is characterized by an increasing specialization of functions and corresponding tendency toward an adaptation and perfection of organs. Finally social disturbances are maladies of the social organism and the proper subject-matter of social pathology.' কোঁতের বক্তব্যের প্রধান কথাই হলো এই যে ব্যক্তি ও সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হলেই সামাজিক ব্যাধির সূচনা হয়।

কার্ল মার্কস কোঁতের মতোই বলেন যে সমাজের অসুস্থতার কারণেই ব্যক্তির অপরাধপ্রবণতা তৈরি হয়। সমাজের অসুস্থতা বলতে তিনি বুঝতেন অর্থনীতিতে শক্তিশালী শ্রেণীর শাসন ও শোষণ। তাঁর মতে মুষ্টিমেয় লোক যখন অধিকাংশ লোককে শোষণ করে এবং তাদের জীবনকে পশুদের পর্যায়ে নিয়ে আসে তখন সেই ঘৃণ্য সামাজিক অন্যায়ের সূত্রেই সমাজে অন্যান্য অপরাধের সূত্রপাত হয়। শোষণকে থামানো যায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনে, সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করে। মার্কসের মতে সাম্যবাদে জনসাধারণ নিজের হাতে নিজের ভাগ্য যেহেতু গড়বার প্রথম সুযোগ পাবে সেহেতু অপরাধের সামাজিক উৎসটি নষ্ট হয়ে যাবে। একমাত্র তখনই মানুষ তার খাঁটি মনুষ্যত্বে পৌছাবে।

মার্কসের বক্তব্যে অপরাধের কারণ শোষণ আর ফ্রয়ডের বক্তব্যে মন। এই দুটোই প্রান্তিক বক্তব্য। কিন্তু দুজনেই সত্য বলেছেন। সুস্থ সামাজিক পরিবেশ ছাড়া, ন্যায়ের পরিবেশ ছাড়া অপরাধ দূর হতে পারে না,—মনও সুস্থ সবল ও নৈতিক হয় না। আবার তেমনি সুস্থ সমাজেও মন বিকল হতে পারে কারণ মনের নিজস্ব কার্যকারণ আছে। তার সবটাই সমাজের নিয়মে চলে না। প্লেটো ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য তাই একটি সুস্থ, 'স্বাভাবিক' সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন। ভারতীয় ঋষিরাও একই ভাবে ব্যক্তির জন্য একটি পরিপূর্ণভাবে নৈতিক পরিবেশের কথা বারবার বলেছেন।

শাস্তি সম্পর্কিত মতবাদ (Theories of Punishment)

অপরাধীকে শাস্তিদান বিষয়ে তিনটি প্রধান মত প্রচলিত। (১) প্রতিরোধাত্মক (Deterrent Theory), (২) সংশোধনাত্মক (Reformative) ও প্রতিশোধাত্মক (Retributive)।

(১) প্রতিরোধাত্মক শাস্তি—শাস্তিদানের উদ্দেশ্য শাস্তির ভয় দেখিয়ে পরকে নিবৃত্ত করা। এই শাস্তির তত্ত্বে নির্দিষ্ট অপরাধের বিচার যতোটা মূল্যবান তার চেয়ে অনেক বেশি লক্ষ্য ভবিষ্যত অন্যায় বিষয়ে। ভবিষ্যতের সম্ভাব্য অপরাধীর কাছে অপরাধের শাস্তি বিষয়ে একটি ভয় ও বিভীষিকা তৈরি করা হচ্ছে যাতে সে বা তারা অপরাধপ্রবণ হলেও কার্যত কোন অপরাধ করবে না। এই তত্ত্বে তাই অপরাধের নিজস্ব গুরুত্বের চাইতে তার ফলাফলের ওপর নজর বেশি। যেহেতু মানুষ নজীরেই শেখে, অভিজ্ঞতায় সত্যকে অনেক দ্রুত অনুধাবন করতে পারে, তাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ শাস্তিকে ঘোষণা করা হচ্ছে। এই শাস্তির তত্ত্ব অনেকটা বাঙলা প্রবাদের মতো 'বউকে মেরে শাশুড়ীকে শেখানো'। কাজেই অপরাধের চাইতে অপরাধীর ওপর নজর এই তত্ত্বে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ শাস্তির গুরুত্বের ওপর নির্ভর করছে ভবিষ্যত অপরাধীর মনোভাব। শাস্তি অত্যন্ত কঠিন হলে শুধুমাত্র ভয়েই অনেকে অপরাধ করবে না।

সমালোচনা :—এই শাস্তিতত্ত্বের বিরুদ্ধে মৌলিক আপত্তিটি এই যে অপরাধীকে ভয় দেখিয়ে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টায় অপরাধের উৎস ও চরিত্রকে ভুল করা হচ্ছে। কারণ শুধুমাত্র ভয়ে অপরাধের কার্যকারণ দূর হয় না। সাময়িকভাবে মাত্র তাকে থামিয়ে রাখবার চেষ্টা করা হচ্ছে। সুতরাং কোন শাস্তিই অপরাধকে কখনো থামাতে সক্ষম হবে না।

অপরাধীর চাইতে অপরাধকে গুরুত্ব দেবার দুটো মারাত্মক ফল ফলে। প্রথমত অপরাধীকে একটি জ্যান্ত গিনিপিগ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সামাজিক অপরাধপ্রবণতাকে প্রশমিত করা নামক গবেষণায় অপরাধী একটি হাতিয়ার মাত্র। তার ওপর পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে যে সত্যিই তাতে অপরাধ কমে কিনা। অপরাধই আলোচ্য বিষয় হওয়ার পরিবর্তে ভবিষ্যত অপরাধী সমস্ত শাস্তির লক্ষ্য। অর্থাৎ তার প্রতি ন্যায়বিচার স্বভাবতই ক্ষুন্ন হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, অন্যকে শিক্ষা দেবার কামনায় অপরাধের লঘুগুরু বিবেচনা একেবারে তিরোহিত হয়।

২। **সংশোধনাত্মক শাস্তি**:—এই মত অনুসারে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য তাকে শিক্ষা দেওয়া এবং শুধরে দেওয়া। অপরাধী অন্যায় কাজ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয় যাতে সে ভবিষ্যতে তেমন অন্যায় আচরণ না করে। প্রতিরোধাত্মক মতবাদের মতো এই মতবাদ মানুষকে উপায় হিসেবে গণ্য করে না। এই মতবাদ অপরাধীকে উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করে এবং তার মঙ্গলের জন্যে শাস্তি দেওয়া হয়। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি বলেন "এই মতবাদকে বিশেষভাবে বর্তমান যুগে গ্রহণ করা হয়। কারণ এযুগের মানবোচিত মনোভাবের সঙ্গে এই মতবাদ সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ।"

সংশোধনাত্মক মতবাদ হালে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অপরাধ সম্পর্কীয় সমাজবিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্ববিদেরা অনেকে এই মতবাদ সমর্থন করেন। অপরাধ সম্পর্কীয় সমাজবিজ্ঞান বলে যে প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ অপরাধের জন্য দায়ী। সামাজিক দুর্নীতি, অসাম্য এবং অসংগতি অপরাধ সৃষ্টি করে। সাম্য, ন্যায় এবং মৈত্রীর ভিত্তিতে যদি সমাজ গঠিত হয় তবে অপরাধ দূর হতে পারে। সমাজের অর্থনৈতিক অসাম্য এবং দুরবস্থা না থাকলে অপরাধও অনেকটা পরিমাণে কমে যাবে। অপরাধ-বিজ্ঞান মনে করে সাময়িক ব্যাধি থেকে উন্মাদনা বা শারীরিক কোন ত্রুটির ফলে অপরাধের সৃষ্টি। শারীরিক কারণ থেকেই অপরাধের সৃষ্টি। সুতরাং অপরাধীকে চিকিৎসার জন্যে সংশোধনাগারে পাঠাবার প্রয়োজন। ফ্রয়ড এবং তাঁর সমর্থনকারীদের মতে যৌনতাই অপরাধের আসল কারণ। তাঁদের মতে অপরাধীর এই ইচ্ছার স্বরূপ আবিষ্কার করে তার ইচ্ছাকে স্বাভাবিক পথে চালিত করাই যুক্তিযুক্ত।

সমালোচনা:—মৃত্যুদণ্ড দিলে অপরাধীর শুধরে নেবার অবকাশ থাকে না সুতরাং এই মতবাদ মৃত্যুদণ্ডকে সমর্থন করে না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে, ভবিষ্যতে অনেক লোক যার হাতে মৃত্যু বরণ করবে এমন অপরাধীকে বাঁচিয়ে রাখা কি ন্যায় সংগত?

(খ) এই মতবাদ বলে শাস্তি দিয়ে অপরাধীকে শিক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সদয় ব্যবহার ও সমবেদনা অপরাধীর চরিত্র সংশোধনে শাস্তির চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী। ক্ষমা অপরাধীর মনে অনুশোচনা এবং মনস্তাপ সৃষ্টি করে ফলে সে নিজের চরিত্র শোধরাতে চেষ্টা করে। অনেক ক্ষেত্রে শাস্তি দানের ফলে অপরাধী

অনেক বেশি কঠিন ও চতুর হয়ে ওঠে, সুতরাং শোধরানোই যদি শাস্তির একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তবে সবক্ষেত্রে শাস্তির প্রয়োজন নেই। কিন্তু সংশোধনাত্মক মতবাদে অপরাধীকে সংশোধনের জন্যে শাস্তি দিতেই হবে। লিলি বলেছেন যে, 'দুঃখভোগ অপরাধীকে অনেক সময় ভাল ফল দান করে'।

(গ) সমাজবিজ্ঞানের অপরাধ সম্পর্কিত মতামত যে সবসময় গ্রহণযোগ্য একথা মনে করার কারণ নেই। সামাজিক দুর্নীতি, অর্থনৈতিক দুরবস্থা অনেক অপরাধের মূলে থাকলেও অনেকক্ষেত্রে স্বভাবই অপরাধের মূল। জাল জিনিস অতিরিক্ত লাভের আশায় বাজারে ছাড়াবার পেছনে অতিরিক্ত লাভের কামনা থাকে এবং অপরাধের মূলে সেইটিই বর্তমান। অপরাধ বিজ্ঞানের মতামত পুরো গ্রহণযোগ্য নয়। সব অপরাধ যদি মানসিক ব্যাধি থেকে উদ্ভূত হয় তবে নৈতিক বিচারের প্রশ্ন অবান্তর, সমাজে সাম্য এবং ঐক্য বজায় রাখাও কঠিন হয়ে পরে। ফ্রয়েডের মতকেও পুরো গ্রহণ করা যায় না, কারণ সব অপরাধের পেছনে অবদমিত যৌনতা আছে এ ধারণা সত্য নয় এবং সব মনস্তাত্ত্বিকরা তা মানেন না।

৩। **প্রতিশোধাত্মক মতবাদ**ঃ—

এই মতবাদ অনুসারে অপরাধীকে তার কৃতকর্মের পরিণাম ভোগ করতে হবে। তাকে তার কাজের ফলাফল কেবল অপরের পক্ষে নয় নিজের পক্ষেও ক্ষতিকর একথা বুঝতে হবে। লিলির মতে এই শাস্তি সম্পর্কীয় মত অনুসারে শাস্তির উদ্দেশ্য হল যার ওপর অপরাধ করা হয়েছে তার দুর্ভোগের মত দুর্ভোগ অপরাধীকে ভুগতে হবে। সেইজন্যই এই মতবাদ 'চোখের বদলে চোখ' এই নিয়মকে পূর্ণ সমর্থন জানায়।

অপরাধীকে শাস্তি দেবার কারণ তার অপরাধের মধ্যে তাকে দুঃখ দিয়ে নৈতিক নিয়মের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করলে মানুষের ন্যায়বোধ অপরাধীর শাস্তি এবং ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার দাবি করে। অপরাধীর শাস্তি না হলে নৈতিক নিয়মের মর্যাদা ও কর্তৃত্ব কিছুই বজায় থাকে না। লিলির মতে সমাজে নিয়ম থাকলে লঙ্ঘনকারীকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। তাঁর মতে "প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে নিয়মের সমর্থন নয়, শাসন ছাড়া নিয়ম বলে কিছু থাকবে না বলে নিয়মকে সমর্থন করতে হবে।"

এই মতবাদ অনুযায়ী অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ শাস্তির উদ্দেশ্য। প্রাচীনযুগে কারও ওপর অন্যায় করা হলে সে বা তার আত্মীয় বন্ধুরা প্রতিশোধ গ্রহণ করতো। বর্তমানে অপরাধীকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের। এই মত দণ্ডকে সমর্থন করে। অপরাধী অন্য ব্যক্তিকে বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে সেই কারণেই তাকেও এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হবে। অপরাধী তার কৃত কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করবে।

এরিস্টটলের মতে অপরাধী তার কৃত কর্মানুযায়ী ফল পাবে। হেগেলও এরিস্টটলকে সমর্থন করে শাস্তিকে নেতিবাচক পুরস্কার বলেছেন। ব্র্যাডলীর মতে শাস্তি কামনা করেছে বলেই অপরাধী শাস্তি পায়। সুতরাং অপরাধীকে শাস্তির জন্যেই শাস্তি দেওয়া দরকার। কান্ট বলেন নিজের অথবা সমাজের মঙ্গলের জন্যে অপরাধীকে শাস্তি পেতে হবে।

এই মতবাদ অনেকের মতে খৃষ্টধর্ম বিরোধী, কারণ খৃষ্টধর্ম প্রতিশোধের মধ্যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ভাব আছে বলে এই ইচ্ছাকে সমর্থন করে না। বিচারক ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রসূত না হয়ে নিরপেক্ষভাবে অপরাধ বিচার করে অপরাধীকে শাস্তি দেন, সুতরাং বর্তমান রাষ্ট্র প্রবর্তিত শাস্তির সঙ্গে প্রাচীনযুগের ব্যক্তিগত বিদ্বেষের প্রতিশোধকে তুলনা করা ঠিক নয়। এই মতবাদের দুটি রূপ—(ক) কঠোর (খ) লঘু।

(ক) কঠোর প্রতিশোধাত্মক মতবাদ—অপরাধের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী শাস্তিবিধানের কথা এই মতবাদ বলে অর্থাৎ গুরু অপরাধে কঠোর এবং লঘু অপরাধে লঘু শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন। এই মতে অপরাধী কেমন মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় কেন, কার প্ররোচনায় অপরাধ করেছে সে বিবেচনার স্থান নেই। ব্যক্তি এবং ঘটনা নিরপেক্ষ ভাবে শুধু অপরাধের কথা ভেবে শাস্তি দিতে হবে।

(খ) লঘু প্রতিশোধাত্মক মতবাদ :—এই মতবাদে অপরাধের সময় যে পরিবেশ ও অবস্থা বর্তমান ছিল তাকে বিচার করে দেখা দরকার। অপরাধ এবং অপরাধীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী বিচার হওয়া উচিত। অর্থাৎ প্ররোচনা অথবা মানসিক প্রবণতা, বয়েস এবং অভিপ্রায় ইত্যাদি বিচার করে অপরাধের প্রকৃতি অনুসারে শাস্তির ব্যবস্থা করা দরকার।

যেহেতু মানুষের ন্যায়বোধের ওপরেই লঘু প্রতিশোধাত্মক মতবাদের ভিত্তি সুতরাং এই মতটি বিবেচনার যোগ্য। শাস্তির পেছনে নৈতিক সমর্থন আছে বলে মানুষ শাস্তিকে সমর্থন করে। অপরাধীকে শাস্তি দেবার সমর্থনে বলা যায় যে, যেহেতু সে অপরাধ করে নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করেছে সুতরাং সে তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবেই শাস্তি ভোগ করবে।

এই মতবাদে সংশোধক এবং প্রতিরোধক দুইটি ভাবই রয়ে গেছে। কাজের অবশ্যম্ভাবী ফল বলে শাস্তিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করলে সত্যিকারের সংশোধন হয়। অপরাধী যখন নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে অনুতপ্ত হয় তখন তার চরিত্রে শুধরে যাবার সম্ভাবনা দেখা যায়। অপরাধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি শাস্তি এই স্বীকৃতি তার মনে অপরাধের প্রতি ঘৃণা জাগায় এবং পরোক্ষ ভাবে অপরাধকে দূরে ঠেলে। প্রতিরোধের কথা থাকলেও এই মতবাদে ন্যায়বোধ, করুণা এবং উপযোগিতা নীতি তিনটির কিছুটা সংমিশ্রণ ঘটেছে।

শাস্তিতত্ত্ব আলোচনার পর সবশেষ কথা এই থাকে যে শাস্তি অপরাধকে সাময়িকভাবে থামাবার একটা ব্যবস্থা মাত্র। শাস্তি মানুষকে অপরাধ থেকে বিরত করতে পারে না। ভয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে, বুঝিয়ে বা সংশোধনের চেষ্টা করে অপরাধীকে থামানো যেতে পারে কিন্তু বৃহত্তর সামাজিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের ভার শাস্তি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। তাছাড়াও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অপরাধ ঘটবার পর শাস্তির প্রসঙ্গ ওঠে, অপরাধের পূর্বে নয়। কাজেই শাস্তি ব্যবস্থা বড়ো জোর অপরাধের সামান্য একটি ক্ষুদ্র অংশকেই প্রভাবান্বিত করতে পারে।

সামাজিক অপরাধ দূর করবার একমাত্র উপায় সামাজিক ভার সাম্যকে রক্ষা করা। ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিযোগী হলেই বিপদের সম্ভাবনা থাকবে। অবাধ স্বাধীন ব্যক্তি যেমন বিপদজনক, তেমনি অবাধ স্বাধীন সমাজও অত্যন্ত ভয়ের। ব্যক্তিকে তাই যেমন স্বাধীনতা দিতে হবে তাকে তেমনি দায়িত্বসম্পন্নও হতে হবে। সমাজ যেমন নিয়ন্ত্রণের কথা ভাববে তেমনি নিজের সীমা বুঝবার যোগ্যতাও তার থাকা উচিত।

অপরাধ দূর করবার একমাত্র ব্যবস্থা তাই সুস্থ, মঙ্গলময় ও নৈতিক অবস্থার ভিত্তি স্থাপন করা, ব্যক্তিকে শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা দেওয়া। ব্যক্তি জীবনে শান্তি পেলেই মঙ্গলের লক্ষ্যে জীবনকে পরিচালনা করবে এবং সমাজও তার সহযোগী হয়ে উঠবে।

অনুশীলনী

1. What is the nature of social evils? How do they originate? What are the methods of checking social evils?

(B. U. 1962)

2. Explain the meaning and purpose of Punishment.

3. Explain the different theories of punishments.

4. What is the meaning of social existence? Show its connection with Ethos of the People.

5. What is Ethos of the People? How does it originate? How does it influence the individual?